গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম–দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ইসমাত রুমিনা
সোনিয়া বেগম
গাজী হোসনে আরা
শামসুন নাহার বীথি
সৈয়দা সালিহা সালিহীন সুলতানা
রেহানা ইয়াছমিন

সম্পাদনা

প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু
প্রফেসর সৈয়দা নাসরীন বানু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান একটি জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের চারটি ক্ষেত্র অর্থাৎ গৃহ ও গৃহ ব্যবস্থাপনা, শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক, খাদ্য ও পুষ্টি এবং বস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। তাছাড়া এই বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে, গৃহ ও গৃহের বাইরে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবেলা করতে এবং গৃহ পরিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য দক্ষ ও কৌশলী করে তোলে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিভাগ ও অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
ক বিভাগ : গৃহ ও পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা		
প্রথম	গৃহ ব্যবস্থাপনা	২-১০
দ্বিতীয়	গৃহ ব্যবস্থাপক	১১-১৭
তৃতীয়	গৃহসম্পদ	১৮-২৩
চতুর্থ	গৃহসম্পদের ব্যবস্থাপনা	২৪-৩৩
পঞ্চম	গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা	৩৪-৪৬
খ বিভাগ : শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক		
ষষ্ঠ	শিশুর বর্ধন ও বিকাশ	৪৮-৫৯
সপ্তম	শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ	৬০-৭০
অষ্টম	কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা–প্রতিকার ও প্রতিরোধ	৭১-৭৮
নবম	প্রতিবন্ধী শিশু	৭৯-৮৫
গ বিভাগ : খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা		
দশম	খাদ্যের কাজ ও উপাদান	৮৭-১১০
একাদশ	খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা	১১১-১১৮
দ্বাদশ	নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১১৯-১২৭
ত্রয়োদশ	খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন	১২৮-১৩৯
ঘ বিভাগ : বস্ত্র ও বয়ন তন্তু		
চতুর্দশ	বয়ন তন্তু	১৪১-১৪৯
পঞ্চদশ	পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি	১৫০-১৬০
ষষ্ঠদশ	বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ	১৬১–১৬৪
সপ্তদশ	ড্রাফটিং	১৬৫-১৬৯
অষ্টদশ	পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্যতা	১৭০-১৮৪

ক – বিভাগ
গৃহ ও পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা–

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বা পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হব ;
- গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- গৃহ সম্পদের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সুষ্ঠুভাবে গৃহসম্পদ ব্যবহারে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব ;
- বাজেটের ধারণা, গুরুত্ব এবং বাজেট তৈরির নিয়ম বর্ণনা করতে পারব এবং পরিবারের জন্য মাসিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারব ;
- সময় ও শক্তি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- কাজ সহজকরনের কৌশল বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জার উপকরণ ও বিন্যাসের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- গৃহ সজ্জার নান্দনিক দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করতে পারব ;
- অব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারব।

প্রথম অধ্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনা

পাঠ–১ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা

নাতাশা,সাইরা, আরিবা ও কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা একসাথে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোর ৬.৩০ মিনিটে শহীদ মিনারে যাবে। সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাই মিলে পুষ্প অর্পন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবে। কিন্তু২১ফেব্রুয়ারি ভোর ৬.৩০ মিনিট পার হয়ে গেল। নাতাশার ঘুম ভাঙ্গালো না। ঘুম থেকে জেগে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার আর শহীদ মিনারে যাওয়া হলো না। এক্ষেত্রে তার উচিত ছিল ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা অথবা বাবা–মাকে বলে রাখা যাতে তারা তাকে জাগিয়ে দেন। বুদ্ধি, পরিকল্পনা ও সময়টাকে সে ভালোমতো কাজে লাগায় নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এখানে ওর মধ্যে কিছুর অভাব ছিল। বলতে পারো সেটা কি? সেটা হলো ব্যবস্থাপনা।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। গৃহে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানাবিধ কার্যকলাপে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পরিবারে বসবাস করে প্রতিটি মানুষ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সে কাজের পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পরামর্শ করে কাজগুলো সংঘটিত করে, কাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অবশেষে কাজের ভালোমন্দ মূল্যায়ন বা যাচাই করে। তার এসব ধারাবাহিক কার্যকলাপের মধ্যেই গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটে।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেমন ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য তেমনি গৃহকে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। একটি পরিবারকে তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার কতগুলো কাজ সম্পাদন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে চেষ্টা করে। যেখানে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কোনো একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়, সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহ তথা পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে।

নিকেল ও ডরসি গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনযাপনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন যে, পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদসমূহের ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাই হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা।

গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন করা হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

- কাঙ্খিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- সম্পদের সঠিক ব্যবহার
- সম্পদ ব্যবহারে ধারাবাহিক কর্মপন্থা–পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন।

লক্ষ্য স্থির হওয়ার পর সব রকম সম্পদের ধারণা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। যেমন– কোনো কাজ করতে গেলে প্রথমে কাজের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এরপর পরিকল্পিত

কাজগুলোকে সংগঠিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শেষ ধাপে কাজের ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে যে, কাজটি কতোটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এভাবে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম শেষ হলে, আরও নতুন উদ্দেশ্য স্থির হয় এবং তা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নতুন করে শুরু হয়।

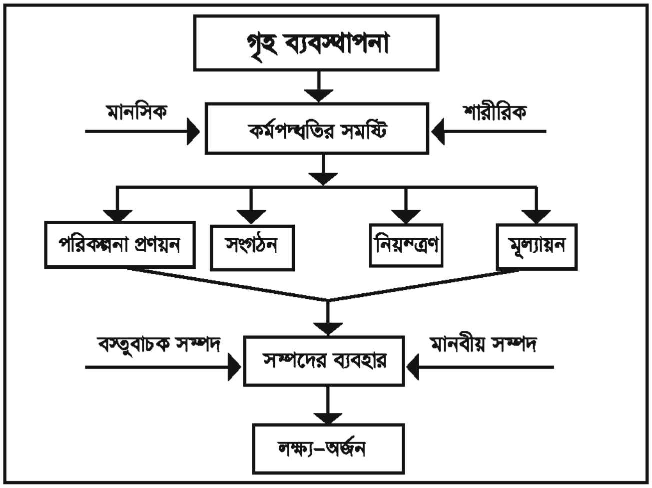

গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামোটির একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর।

পাঠ ২ – লক্ষ্য ও লক্ষ্যের প্রকারভেদ

লক্ষ্য কী?

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যেখানে লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্ন রয়েছে সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাধারণভাবে বলা যায় ব্যক্তি বা পরিবার কী চায় বা কী করতে চায় তাই হচ্ছে লক্ষ্য। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সব সময় মানুষের চেতন মনে অবস্থান করে, খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। সকল মানুষের মনে সর্বদাই কোনো না কোনো লক্ষ্য বিরাজ করে। একটি লক্ষ্য অর্জন হলেই আমরা নতুন কোনো লক্ষ্য স্থির করে ফেলি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমাদের কাজের ধারা নির্ধারণ করে দেয়, ফলে আমরা সে অনুযায়ী এগিয়ে যাই।

প্রতিটি পরিবার ছোট–বড় নানারকম লক্ষ্য পোষণ করে। সাধারণত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আমাদের লক্ষ্য স্থির হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো পরিবার অর্থ উপার্জনকে বেশি প্রাধান্য দেয়, আবার কেউ সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে চায়, কেউ বা তার সদস্যদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়।

লক্ষ্য হচ্ছে একটি কাম্য উদ্দেশ্য, যার সুনির্দিষ্ট পরিধি আছে এবং যা ব্যক্তির কার্যাবলিকে নির্দেশ দান করে। লক্ষ্যের নির্দিষ্ট পরিধি থাকতে হবে এ জন্য যে, কাম্য লক্ষ্যটি ব্যবস্থাপকের কাছে সুস্পষ্ট না হলে, তা অর্জন করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলেই তা অর্জনের কার্যাবলিও সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ লক্ষ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করে এবং তাকে সাফল্যের সাথে কার্যকর করতে সাহায্য করে। পরিবারের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু লক্ষ্য থাকে। তবে যখন সম্মিলিতভাবে কোনো কাজ স্থির করা হয়, তখন দ্বন্দ্ব কম হবে এবং লক্ষ্য অর্জনও সহজতর হবে।

লক্ষ্যের প্রকারভেদ

নিকেল ও ডরসি লক্ষ্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

- দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য
- মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য
- তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে স্থায়ী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্য সময় সাপেক্ষ এবং এটা সর্বদা মনের মধ্যে বিরাজমান। এ লক্ষ্য মধ্যবর্তী লক্ষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য

পরিবার তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায়ই মধ্যবর্তীকালীন বা স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ লক্ষ্যগুলো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের তুলনায় অধিক স্পষ্ট। সেজন্য এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

এ লক্ষ্য হলো ছোট ছোট লক্ষ্য, যার মধ্যে খুব বেশি একটা কাজের প্রয়োজন হয় না। অল্প কাজ করলেই অনেক সময় লক্ষ্যটি অর্জন করা যায়। অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে সাথেই তা অর্জন করা যায়।

উদাহরণের সাহায্যে এ তিন প্রকার লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। সোমা নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চায়। এটা তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। সে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই সে এখনই যোগ্য টিউটরের সন্ধান করছে– এগুলো হলো সোমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সোমার নিয়মিত স্কুল–কলেজে যাওয়া, মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করা, শ্রেণির কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করা এবং ভালো রেজাল্ট করা এ সবই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

> **কাজ –** তোমার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির কর। সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে তোমার করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা করে দেখাও।

পাঠ ৩ – গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

গৃহ ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষেত্র শুধু গৃহাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ নয়। গৃহের বাইরের সমাজে ও পরিবেশে এবং কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব গৃহ ও পরিবারের উপর পড়ে। সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন আনা অথবা পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর শিক্ষা গৃহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিহিত রয়েছে।

আমাদের চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। এ অবস্থায় চাহিদাগুলো পূরণ করতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য। দক্ষতা বাড়াতে হলে সম্পদের প্রকৃতি ও তার বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিবেচিত। বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন– পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদির মূল উৎস হচ্ছে পরিবার। পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ পরিস্থিতিতে ভোক্তা এবং ক্রেতা হিসেবে ব্যক্তি তথা পরিবারের কী অধিকার এবং অধিকার রক্ষায় কী করণীয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান এ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো কর্মমুখী আচরণ দ্বারা পরিবার তথা দেশের কল্যাণ সাধন করা। মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করতে পারে। এই সফলতাই পারিবারিক জীবনে কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো–

- পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সকল সম্পদ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন।
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করা ও তা বিশ্লেষণ করা।
- গৃহ ও গৃহের বাইরে একটি সুষ্ঠু বাসোপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা।
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ভোক্তার অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া।
- দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
- ভবিষ্যতে নিজের ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভের উপায় নির্ধারণ করা।
- পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করা।
- আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে গৃহস্থালির আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শিতা অর্জন করা।
- দূষণমুক্ত, বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা।
- বর্তমান ও ভবিষ্যতে জ্বালানি সংকটের ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে তা দূরীকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

গৃহ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানের যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করে। গৃহ ও কর্মক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি ও সমস্যা অনুধাবন করে, কীভাবে এর সাথে অভিযোজন করা বা খাপ খাওয়ানো যায় গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান সে বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

২০১৬

পাঠ ৪ – গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা পর্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, গৃহ ব্যবস্থাপনা পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতোগুলো ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতির সমষ্টি মাত্র। এ পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয় বলে এগুলোকে গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা পর্যায় বলা হয়। পদ্ধতিগুলো হলো– পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন। প্রতিদিনের কাজে সচেতনভাবে এই ধাপগুলো আমাদের অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনের কাজের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে মূল্যায়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে। গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সংগঠক, নিয়ন্ত্রণকারী ও মূল্যায়নকারীরূপে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পরিকল্পনা

গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ পরিকল্পনা করা। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তার পূর্বে কাজটি কীভাবে করা হবে, কেন করা হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার নাম পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো পূর্ব থেকে স্থিরকৃত কার্যক্রম।

সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সম্পর্ক ভালো থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন–

- পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মতামত যাচাই করে এবং প্রত্যেকের সুবিধা–অসুবিধার কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা করতে হবে।
- বিভিন্ন কার্যকলাপে সফলতা লাভ করতে হলে সদস্যদের দক্ষতা, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, কাজ করার ইচ্ছা–অনিচ্ছা ইত্যাদি পরিকল্পনায় বিবেচনার বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। সুতরাং সঠিক পরিকল্পনা করতে হলে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সম্পর্ক ভালো থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।
- পরিকল্পনা এমন হতে হবে যেন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ নমনীয় হতে হবে। হঠাৎ করে কোনো জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সমাধান করার উপযোগী পরিবেশ যেন সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। তা ছাড়া পরিকল্পনা যত দূর সম্ভব সহজ সরল হওয়া উচিত।
- পরিবারের সকলের গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

সংগঠন

গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন কাজগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন করার নাম সংগঠন। সংগঠনের পর্যায়ে কোন কাজ কোথায় ও কীভাবে করা হবে তা স্থির করা হয়। সংগঠনের পর্যায়ে পরিবারের বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে খুঁটিনাটি চিন্তা করে কোথায় কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে তা স্থির করা হয়ে থাকে। কাজ করতে গেলে–কোন কাজ কাকে দিয়ে করানো হবে, সে কাজ সম্পর্কে কার অভিজ্ঞতা আছে, কীভাবে কাজটি করতে হবে, কী কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয়সমূহ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় কাজ, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। সংগঠনের তিনটি পর্যায় আছে–

২০১৫

- **প্রথম পর্যায়ে** ব্যক্তি তার করণীয় কাজের বিভিন্ন অংশের একটি ধারাবাহিক বিন্যাস রচনা করে।
- **দ্বিতীয় পর্যায়ে** ব্যক্তি তার কোন কাজ আগে এবং কোন কাজ পরে হবে তার ধারাবাহিকতা রচনা করে।
- **তৃতীয় পর্যায়ে** ব্যক্তি তার একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কাজসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করার জন্য একটি কর্ম কাঠামো রচনা করে।

সুতরাং বলা যায়, যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সংগঠন।

নিয়ন্ত্রণ

গৃহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা। নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় পরিবারের সকল ব্যক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের কাজে নিয়োজিত কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। পরিকল্পিত কর্মসূচি ও পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত সংশোধনীর ব্যবস্থা করা এ পর্যায়ের কাজ।

কাজ চলাকালীন অবস্থায় কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না, যাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সে কাজ সঠিকভাবে করছে কি না ইত্যাদি। প্রয়োজনবোধে কাজের ধারা পরিবর্তন করে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতোগুলো স্তরে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয় যেমন–

- **কর্মে সক্রিয় হওয়া–** প্রথম স্তরে কাজে উদ্যোগ নেওয়া বা সক্রিয় হয়ে কাজ করা বোঝায়। কাজের উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কী কাজ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে জানা থাকলে কাজ আরম্ভ করা সহজ হয়।
- **পর্যবেক্ষণ করা–** কাজ করার দ্বিতীয় স্তরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে হয়। কাজটি করতে সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে কি না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী রকম সাফল্যের সঙ্গে হচ্ছে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কাজ চলাকালীন অবস্থায় এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
- **অভিযোজন করা/খাপ খাওয়ানো–** নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয় অথবা কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা মোকাবিলা করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহীত পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল করে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই হচ্ছে অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানো।

মূল্যায়ন

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সর্বশেষ পর্যায় হলো মূল্যায়ন করা। কাজের ফলাফল বিচার বা যাচাই করাই হচ্ছে মূল্যায়ন। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে। কাজটি করার পেছনে যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জনে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর অবদান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন ছাড়া কাজের সফলতা ও বিফলতা নিরূপণ করা যায় না। কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ফলাফল যাচাই করতে হয়। উদ্দেশ্য সাধিত না হলে ফলাফল ভালো হলো না বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। মূল্যায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হলো কি না, আর যদি হয়ে থাকে, কতোটা হলো তা পরিমাপ করা যায়। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করে পরবর্তীতে সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। সঠিক

মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে–

- লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত কাজগুলো ঠিকমতো হয়েছে কি না
- কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ করা
- কাজে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে কাজে সফল হওয়া।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণ করে একটি পিকনিকের আয়োজন কর।

পাঠ ৫– সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর প্রতিটি স্তরে বা ধাপে ছোট–বড় নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। গ্রস এবং ক্রান্ডেলের মতে–সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কথা হলো সমস্যা সমাধানে একাধিক কার্যক্রম বা পন্থা থেকে একটি বিশেষ কার্যক্রম পছন্দ করা। পরিবার যে কোনো সময় পরিবর্তিত অবস্থার বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন বিকল্প পন্থা থেকে সবচেয়ে উত্তম পন্থাটি বেছে নেওয়াটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

একটি পরিবারের ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিবার কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে তা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতির উপর। পরিবারের ছোটখাটো অনেক সমস্যায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কোনো সৃজনশীল কাজে বা কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্তের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে কাজটির জন্য বিকল্প উত্থাপনে একজন ব্যক্তির তুলনায় দলগত প্রভাব বেশি কার্যকর। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে গ্রহণ করাই উত্তম। এতে কাজটি সুন্দর হয় এবং ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বা পর্যায়

যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কতোগুলো ধারাবাহিক পর্যায় রয়েছে। একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে পর্যায়ক্রমে এগুলো অনুসরণ করতে হয়। এ পর্যায়গুলো হলো–

- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি
- বিকল্প অনুসন্ধান
- বিকল্পসমূহ সম্পর্কে চিন্তা
- একটি সমাধান গ্রহণ
- গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ

- **সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি** – সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে যে সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তার প্রকৃতি নির্ণয় করা। সমস্যার স্বরূপ অবগত না হলে সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায় না। সমস্যা কখনো সাধারণ আবার কখনো কঠিন বা জটিল হতে পারে। সাধারণ ছোটখাটো সমস্যায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাধান করা যায়। কিন্তু কঠিন সমস্যায় অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।

- **সমস্যা সমাধানের বিকল্প অনুসন্ধান** – সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থাগুলো অনুসন্ধান করা হয়। যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বিকল্প পন্থা থাকতে ২০১৫

পারে। বিকল্প পন্থাগুলো পর্যালোচনা করার জন্য অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে সঠিক পন্থা নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দূরবর্তী কোনো স্থানে ভ্রমণে যেতে কী ধরনের যানবাহন নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত হবে তা যাচাই করতে হবে। অর্থ, সময়, শক্তি ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহারের আলোকে বিকল্প ব্যবস্থাগুলো যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।

- **বিকল্পসমূহ সম্পর্কে চিন্তা–** এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থাগুলো বিশদভাবে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি বিকল্পের ফলাফল, এর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখতে হয়। যেমন– সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, যার ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ সম্ভব নাও হতে পারে। অনেক সময় সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে সময় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় কোন বিকল্প সমাধানটি বেশি কার্যকর। সিদ্ধান্তের এ পর্যায়ের জন্য প্রখর চিন্তাশক্তির প্রয়োজন।

- **একটি সমাধান গ্রহণ–** সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ স্তর হচ্ছে অনেকগুলো বিকল্প পন্থার মধ্য হতে একটি পন্থা বেছে নেওয়া। এ স্তরটি খুবই প্রভাবশালী। এটা মানুষের সমস্ত জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। মানুষ যদিও একটি যুক্তিপূর্ণ বিকল্প খুঁজে নেয়, তবুও তারা সবচেয়ে ভালো পন্থাটা নির্বাচনের জন্য খুব কমই চেষ্টা করে। সময় এবং পারিবারিক অবস্থার দ্বারা মানুষ অনেক সময় প্রভাবিত হয়। যেমন– দোকানে সুন্দরভাবে সাজানো জিনিসপত্র দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অল্প সময়ে সে দ্রব্য কেনাকাটা করে ফেলতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর বয়স, চাহিদা, আয় ইত্যাদির উপর একটি সমাধান গ্রহণ অনেকাংশে নির্ভর করে। একটি সমাধান গ্রহণের সময় দেখতে হবে তা যথেষ্ট কার্যকর কি না এবং এতে মন পরিতৃপ্ত হবে কি না।

- **গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ–** যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো তার ফলাফল জেনে দায়িত্ব গ্রহণ করাই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বশেষ পর্যায়। গৃহীত সিদ্ধান্তটির দায়িত্ব গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুবা পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং বিকল্প বাছাইকরণের পর যে সমাধান গ্রহণ করা হলো তা কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন যার সাথে পরিবারের সকলের সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং যিনি যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন।

কাজ – পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত ও দলীয় সিদ্ধান্তের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তুলে ধর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে কে অভিহিত করেছেন–

ক) নিকেল ও গ্রস খ) গ্রস ও ক্রান্ডেল

গ) ক্রান্ডেল ও নিকেল ঘ) নিকেল ও ডরসি

২। গৃহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রধানত কোনটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়?

ক) লক্ষ্য খ) পরিকল্পনা

গ) নিয়ন্ত্রণ ঘ) মূল্যায়ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনোয়ারা জামান একজন গৃহিণী। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে তিনি মুরগির ফার্ম খোলার পরিকল্পনা করেন। প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করে তিনি কর্মী নিয়োগ করেন। মাসখানেক পর তিনি ফার্মে এসে অনেক অব্যবস্থাপনা দেখতে পান।

৩। মনোয়ারা জামানের কর্মপদ্ধতিতে কোনটির অভাব লক্ষ্য করা যায়?

ক) উদ্যোগ খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গ) সংগঠন ঘ) নিয়ন্ত্রণ

৪। মনোয়ারা জামানের করণীয় ছিল –

i. পরিকল্পনা করা।

ii. উদ্যোগ নেওয়া।

iii. কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সায়হাম নবম শ্রেণির ছাত্র। ভবিষ্যতে সে একজন চিকিৎসক হতে চায়। বাবা মা লক্ষ করছেন সায়হাম প্রায়ই স্কুলে যেতে চায় না। পড়াশোনায়ও তেমন একটা আগ্রহ নেই। বিষয়টি নিয়ে পারিবারিক আলোচনা শেষে সায়হামের মাকে এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয়।

ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি কোনটি?

খ. কীভাবে লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয় তা বুঝিয়ে লেখ।

গ. সায়হামের কার্যকলাপে কোন ধরনের লক্ষ্যের ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সায়হামের পরিবারের সদস্যদের পদক্ষেপ মূল্যায়ন কর।

২। আজ খাদিজা খাতুনের ছোট মেয়ের জন্মদিন। হঠাৎ করে এ উপলক্ষে অতিথিদের আপ্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী অসুস্থ থাকায় তিনি স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে বাজারের দায়িত্ব দেন। ঘরকুনো স্বভাবের বড় মেয়েকে তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করার দায়িত্ব দেন। অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি নিজে সার্বক্ষণিক তদারকি করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আরও কৌশলী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি?

খ. গৃহ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

গ. খাদিজা খাতুনের ত্রুটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আয়োজক হিসেবে খাদিজা খাতুনের কাজের ধাপগুলোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপক

পাঠ ১ – গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

প্রতিটি মানুষ কতোগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানুষের জীবনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবারের সব সদস্যের আন্তরিক ইচ্ছা, একে অন্যের প্রতি সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে গৃহেই পরিবারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক ও দক্ষ গৃহ ব্যবস্থাপনার। সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি সাধারণ গৃহকেও অনন্য সাধারণ করে তুলতে পারে। আর যিনি গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বে থাকেন, তিনি হলেন গৃহ ব্যবস্থাপক। পরিবারের মা–বাবা উভয়েই এই ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। গৃহ ব্যবস্থাপক হচ্ছেন গৃহের যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে পারিবারিক সুখ–শান্তি, স্বচ্ছলতা, সুশৃঙ্খল গৃহপরিবেশ। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ নিকেল ও ডরসি (Nickel and Dorsey, 1950) গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। গৃহ ব্যবস্থাপক তার শক্তি, সামর্থ্য ও বিভিন্নমুখী দক্ষতার জোরে এ প্রশাসনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেন। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য গৃহ ব্যবস্থাপকের অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে অবশ্যই কতোগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। এই গুণগুলো হলো–

বুদ্ধিমত্তা	উদ্দীপনা
বিচারবুদ্ধি	ব্যক্তিত্ব
অধ্যবসায়	সৃজনীশক্তি
আত্মসংযম	অভিযোজ্যতা
	মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান

বুদ্ধিমত্তা– একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বুদ্ধিমান হতে হয়। ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা, জ্ঞানস্পৃহা ইত্যাদি তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। কোনো সমস্যাকে অনুধাবন করে পরিস্থিতির বিচার–বিশ্লেষণ করা, বিগত দিনের কোনো অভিজ্ঞতাকে সময়মতো কাজে লাগানো এ সবই বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। পারিবারিক বিভিন্ন কর্মকান্ডকে সফল করার জন্য ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বুদ্ধিমান হতে হবে। গৃহের সৌন্দর্যবর্ধনে, শৃঙ্খলা আনয়নে, যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক তার বুদ্ধির জোরে পরিবারের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেও সব চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

উদ্দীপনা– গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ হলো উদ্দীপনা। উৎসাহ–উদ্দীপনা ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা আসে না। যখন যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টাকেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা বলা যেতে পারে। গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণটি অন্য সদস্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। উদ্দীপনা থাকলে আগ্রহ ও আনন্দের সাথে সব কাজ সম্পন্ন করা যায়। আবার দেখা যায় উৎসাহ–উদ্দীপনার অভাবে অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। ফলে লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হয় না।

বিচারবুদ্ধি– সংসারে ন্যায়–অন্যায়, ভালোমন্দ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ রায় দেওয়ার সামর্থ্য যার ভালো, তাকেই বিচার–বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বিচার–বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকম জটিলতা দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক। সেসব জটিলতা

সমাধান করাও সহজ হয় যদি গৃহ ব্যবস্থাপকের তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা থাকে। পরিবারের প্রয়োজনে কোন জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোন জিনিসটি না হলেও চলে এসব ভেবে দেখা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিবারের ছোট শিশুটিকে কোন স্কুলে ভর্তি করানো যায়, সে স্কুলের মান, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে।

ব্যক্তিত্ব– মানুষের চাল–চলন, কথা–বার্তা, আচার–আচরণে ও রুচি বোধে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের আচার–ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে তিনি পরিবারের সকলের নিকট পচ্ছন্দনীয় হতে পারেন তার মার্জিত ব্যবহার, পোষাক–পরিচ্ছদ, কথা–বার্তায় শালীনতা ও পরিমিতি বোধ, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণাবলি থাকতে হবে।

সৃজনীশক্তি – গৃহ পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হলে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হয়। সেটিই সৃজনশীলতার প্রতীকরূপে সবার নজরে পড়ে। গৃহ ব্যবস্থাপককে এ রকম সৃজনশক্তির অধিকারী হতে হয়, যিনি তার কল্পনাশক্তি দিয়ে নতুনত্ব তৈরি করতে পারেন। সৃজনীশক্তির সাহায্যে গৃহ ব্যবস্থাপকের যে কোনো কাজের পরিকল্পনা করা সহজ হয় এবং কাজের ফলাফল কী হতে পারে সে সম্বন্ধে আন্দাজ করতেও কোনো অসুবিধা হয় না। পূর্ব নির্ধারিত কোনো কাজে যদি পরিবর্তন করতে হয়, তাতেও সৃজনীশক্তি প্রয়োগ করে, তা সহজে করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গৃহ পরিবর্তনের কারণে নতুন ঘরের আসবাবপত্র নির্বাচন, ক্রয় ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক তার সৃজনীশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

অধ্যবসায় – অধ্যাবসায় ছাড়া কোনো কাজে সফলতা আসে না। যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শেষ পর্যন্ত কাজটি করে যাওয়াটাই হচ্ছে অধ্যবসায়। গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণের কারণেই যে কোনো কঠিন কাজও সহজেই সম্পন্ন হয়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা ইত্যাদি গুণাবলী অধ্যবসায়ী হতে সাহায্যে করে। যেমন বিশেষ কোনো নতুন কাজ যদি একবারে রপ্ত করা না যায়, তাহলে বারবার চেষ্টা করে তা রপ্ত করা যায়। গৃহের নানাবিধ কাজের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির জন্য গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণটি থাকা আবশ্যক। ঘরে শিশুদের পরিচালনা এবং তাদের লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে অধ্যবসায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

অভিযোজ্যতা – পরিবর্তনশীল পরিবেশে বাস করার কারণে প্রায়ই আমাদের নানা রকম পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। যেকোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজ্যতার গুণটি প্রত্যেক গৃহ ব্যবস্থাপকের থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে সময়মতো চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বাড়িতে থাকলে তার বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অথবা চিকিৎসকের নির্দেশে হাসপাতালে নিতে হতে পারে। এ রকম পরিবর্তিত অবস্থার সাথে অভিযোজন করে যাবতীয় কাজ সমাধা করতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপককে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। যিনি যত ভালোভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, তিনি যে কোনো পরিস্থিতি সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন।

আত্মসংযম – স্বাভাবিকভাবে জীবন চলার মাঝে পরিবারে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। পারিবারিক সংকটকালে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আত্মসংযম। একজন সুব্যবস্থাপকের আত্মসংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই গুণের মাধ্যমে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়। আত্মসংযম ক্ষমতা থাকলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সহজ হয়। পরিবারে অনেক সময় সদস্যদের মধ্যে নানা রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহ ব্যবস্থাপক উত্তেজিত না হয়ে নিজেকে সংযত রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। ফলে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান – মানব চরিত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করার ক্ষমতা গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ। প্রতিটি মানুষই বিভিন্নভাবে একে অন্য থেকে আলাদা। পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বভাব, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, মেজাজ–মর্জি ইত্যাদি এক রকমের হয় না। পরিবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হলে পরিবারের সকল সদস্যের সামগ্রিক আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের দ্বারা মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। ফলে তিনি সদস্যদের দ্বারা উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সহজেই মোকাবিলা করতে পারেন। পরিবারে শিশুরা যেমন স্নেহ–ভালোবাসা চায়, তেমনি বড়রা চান শ্রদ্ধা–ভক্তি। আবার শিশুদের নির্দেশ দিয়ে কাজ করাতে হয়, পক্ষান্তরে বড়দের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হয়। এতে পরিবারে শৃঙ্খলা, শান্তি বজায় থাকে।

উপরোক্ত গুণগুলোর সমন্বয়ে একজন গৃহব্যবস্থাপক উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন। এরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে সবাই মান্য করে এবং তাঁর প্রতি সহযোগী মনোভাব পোষণ করে। ফলে তিনি যে কোনো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সফল হন।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ২ – গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহ ব্যবস্থাপকের নানাবিধ গুণ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি। পরিবারে বিভিন্ন রকম কাজ থাকে। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক তার করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার গুণাবলির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে পারেন। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তাকে সব সময় সচেষ্ট থাকতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সামান্য অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটতে পারে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবারের ছোট–খাটো কাজ থেকে বড় রকমের বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালনের ভারও গৃহব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকে। তাকে পরিবারের সার্বিক কাজের দায়িত্বে থাকতে হয়। সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করানো গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার সঠিক নির্দেশনা পেলে অন্য সদস্যরাও কাজে আগ্রহী হয়ে উঠে।

পরিবারের সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে কীভাবে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা মেটানো যায়, গৃহ ব্যবস্থাপককে তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত কাজগুলো কে করবে, কীভাবে করা হবে, কখন এবং কেন করা হবে এসব বিষয়ের প্রতি সচেতন হয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সদস্যদের মধ্যে কাজগুলো বণ্টন করে, তার সার্বিক তদারকি করাটাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতাভুক্ত।

পরিবারে গৃহব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- গৃহে সুষ্ঠু কর্মব্যবস্থা সৃষ্টি করা
- পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- পরিবারের সুষ্ঠু নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু ভোগ আচরণ গড়ে তোলা
- কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা।

গৃহে সুষ্ঠু কর্ম ব্যবস্থা সৃষ্টি করা– পারিবারিক কাজগুলো সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া গৃহ ব্যবস্থাপকের অন্যতম দায়িত্বের অন্তর্গত। পরিবারে এমন অনেক কাজ আছে যা গৃহের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। যেমন–রান্না ও পরিবেশন করা, ঘর–বাড়ি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা, কাপড় ধোওয়া, ছেলে–মেয়েদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আবার কিছু কাজ বাড়ির বাইরে করতে হয়। যেমন–বাজার করা, লন্ড্রিতে যাওয়া, বাগান করা, আত্মীয়স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া ইত্যাদি। গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের শক্তি, সামর্থ্য, বয়স, কর্মস্পৃহা ইত্যাদির ভিত্তিতে কাজগুলোকে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বণ্টন করে থাকেন। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজগুলোর তদারকি করা ও সদস্যদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা– পরিবারে সকলের সব রকম চাহিদা পূরণের জন্য আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। আয়ের মাধ্যমে পরিবার যে অর্থ উপার্জন করে তার দ্বারাই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করা হয়। আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে পরিবারে অভাব–অভিযোগ থাকে না। ফলে সেখানে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করে। গৃহ ব্যবস্থাপকের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

আয়কে যথাযথভাবে ব্যবহারের প্রতিও গৃহব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। আয় অনুযায়ী ব্যয় করার জন্য তাকে অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা করতে হয়, যা বাজেট হিসেবে পরিচিত। পরিবারের সীমিত আয়ের মধ্যে সুষ্ঠু ক্রয় নীতি অনুসরণ করে পরিবারের সব রকম চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা করাও গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। তার সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনার ফলে, পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে ব্যয় করার সদভ্যাস গড়ে উঠে, তারা মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী মনোভাব সম্পন্ন হতে পারে।

পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা – পরিবারে বিভিন্ন বয়স ও সম্পর্কের সদস্যরা অবস্থান করে। গৃহ ব্যবস্থাপনার সাথে একাধিক কাজ সম্পৃক্ত থাকে। পরিবারের সকল সদস্যের মিলিত প্রচেষ্টায় কাজগুলো সম্পন্ন হয়। সদস্যদের মধ্যে আন্তসম্পর্ক যদি ভালো হয়, তাহলে সেখানে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। গৃহ ব্যবস্থাপক নিজে অন্যান্য সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। এ ছাড়াও অন্য সদস্যরাও যেন একে অন্যকে শ্রদ্ধা করেন, মর্যাদা দেন সে বিষয়েও তাকে সচেতন থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে, সেগুলো সম্ভাব্য সহজ উপায়ে মিটানোর পদক্ষেপ নিতে হয়। অনেক সময় পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির সাথে নবীনদের মতের অমিল থেকে মনোমালিন্যর সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রবীণ ও নবীনদের প্রকৃতি অনুধাবন করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের। সকল সদস্যের যুক্তিসংগত চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারলে গৃহ ব্যবস্থাপকের সাথে তাদের সম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে।

পরিবারের সুষ্ঠু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা – গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। গৃহ, গৃহের সদস্যগণ এবং পণ্যসামগ্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। গৃহ যাতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাসস্থানের নিরাপত্তার জন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও ময়লা আবর্জনা যথাযথ স্থানে অপসারণ করা, গৃহকে দূষণমুক্ত রাখা ইত্যাদি গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গৃহব্যবস্থাপকের। গৃহের সকল সদস্যের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। বাড়িতে সদস্যরা কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে, তাকে সাময়িক আরাম দেওয়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিপজ্জনক দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদ স্থানে

২০১৫

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে তার সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যসামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য গৃহে সুষ্ঠু সংরক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু ভোগ আচরণ গড়ে তোলা – বর্তমান যান্ত্রিক জীবন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বেড়েছে। পরিবর্তনশীল জগতের সাথে মিল রেখে সন্তানদের মানসিক বিকাশ হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে হয়। সেজন্য বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুযোগ–সুবিধা সমূহ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে ভোগ করতে পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা করাও গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। এ ছাড়া সদস্যদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির চাহিদা পূরণে সঠিক পণ্য নির্বাচন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য নির্বাচন সুষম হতে হবে, বস্ত্র নির্বাচন প্রয়োজন ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে হতে হবে, বাসস্থান স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া, যাতে সাধ্যের মধ্যে সদস্যদের চাহিদাগুলো পূরণ হয়। গৃহের সীমিত সম্পদের উপযোগ বা অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়িয়ে কীভাবে প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো যায়, সে প্রচেষ্টা গৃহ ব্যবস্থাপককে নিতে হবে।

কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা – পরিবারের সকল সদস্য যেন তাদের করণীয় কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সেজন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। কাজের পরিবেশ উন্নত ও আরামদায়ক হলে উৎসাহ–উদ্দীপনার সাথে কাজ করা সম্ভব হয়। যেমন– লেখাপড়া করার জন্য যথেষ্ট আলো–বাতাস পূর্ণ এবং কোলাহলমুক্ত একটি স্থানের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বই–খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে গোছানো থাকলে সহজেই সেগুলো ব্যবহার করা যায়। এ রকম পরিবেশে নির্বিঘ্নে ও আরামদায়ক অবস্থায় লেখাপড়া করা যায়। একইভাবে প্রতিটি কাজ অনুযায়ী কাজের ভালো পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে গৃহ ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব নিতে হয়।

উপরোক্ত কাজের দায়িত্ব পালন ছাড়াও গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারে আরও অনেক অনুষ্ঠান, উপলক্ষ ও বিভিন্ন ঋতুর সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ কর্মকান্ডের আয়োজন করতে হয়। আর সেসব কর্মকান্ডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে ব্যবস্থাপককে বিভিন্নমুখী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

একথা মনে রাখতে হবে যে, গৃহ ব্যবস্থাপক গৃহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব বহন করেন। তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য। তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে, তার আদেশ, নির্দেশ পালন করে সবাই মিলে পারিবারিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। পরিবারের কর্মকান্ডগুলো গৃহ ব্যবস্থাপকের সুচারু ব্যবস্থাপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়। তিনি যাতে এ রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সফল হতে পারেন সেজন্য প্রত্যেক সদস্যকে যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তাহলেই আশা করা যাবে যে, সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিবার তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

কাজ – তোমার পরিবারের গৃহ ব্যবস্থাপককে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করতে পার? তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখ।

পাঠ ৩ – গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা সামাজিক রীতিনীতি, মতাদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায় এবং সামাজিকভাবে গড়ে উঠে। গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের এবং নিজেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত করে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখতে পারেন। যেমন–

লিও ক্লাব, গার্ল গাইড, রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন দুর্যোগাকালীন আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন।

গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারে সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে ব্যবস্থা নিতে পারেন। শিষ্টাচার, আদর্শ মূল্যবোধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। পরমতসহিষ্ণুতা, বিপদে ধৈর্যধারণ, অন্যকে সাহায্য করা, সমাজপ্রীতি শিক্ষা দানের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের নৈতিক চরিত্রে অধিকারী করতে পারেন। এতে সামাজিক অবক্ষয়তা রোধের পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ রোধ করা সম্ভব হবে।

গৃহ ব্যবস্থাপক মা–বাবা যিনি হোন না কেন তাকে পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ–ভালবাসা শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রতিবেশিদের প্রতি দায়িত্ববোধ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনে আগ্রহী করে তুলতে হয়। যেমন– বিয়ে, জন্মদিন, মিলাদ, ঈদ, পুজা, বড়দিন, মৃত্যুবার্ষিকী, অসহায় ও দুস্থদের সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গৃহ ব্যবস্থাপক জাতি, জাতীয় অনুষ্ঠান, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে দয়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। আর যখন গৃহ ব্যবস্থাপক সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে গড়ে তুলতে পারবেন তখন গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব পালন যথাযথ হয়েছে বলে মনে করা হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কাজে সফলতা অর্জনের জন্য কোন গুণটি থাকা প্রয়োজন?

ক) বিচারবুদ্ধি খ) সৃজনশক্তি

গ) অধ্যবসায় ঘ) উদ্দীপনা

২। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক আত্মসংযম গুণের অধিকারী হলে–

i. পারিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকে।

ii. পারিবারিক সমস্যা সমাধান সহজ হয়।

iii. সদস্যদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সায়মার বড় ছেলেটি অবসরে ঘরে বসে টিভি দেখে ও গল্পের বই পড়ে। আর ছোট ছেলেটি সময় পেলেই বাসার পাশের মাঠে খেলতে চলে যায়। একদিন সায়মা বড় ছেলেকে দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনে আনতে বললে সে বিরক্ত হয়ে যায়।

৩। সায়মার মধ্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে?

ক) মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান খ) অভিযোজ্যতা

গ) বিচার ক্ষমতা ঘ) বুদ্ধিমত্তা

৪। উক্ত গুণ অর্জনে সায়মার করণীয় কোনটি?

ক) সন্তানদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা খ) সন্তানদের আদর করা

গ) ধৈর্য ধারণ করা ঘ) নিজেই কাজটি করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। স্বামী–সন্তান নিয়ে সানজিদা খাতুনের সুখের সংসার। সন্তানদের লেখা–পড়ায় ভালো ফলাফল লাভের জন্য বিভিন্নভাবে তিনি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তবে বাসায় মেহমান এলে তাদের যত্ন ও আপ্যায়ন করতে তিনি প্রায়শ বিরক্ত হন।

ক. গৃহে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কে?

খ. গৃহে সুষ্ঠু কর্ম–ব্যবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সানজিদা খাতুনের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সানজিদা খাতুনের মেহমান আপ্যায়নের বিষয়টি দক্ষ গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলির সাথে সামঞ্জস্য কি না – বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
গৃহসম্পদ

পাঠ ১ – ২ সম্পদ ও সম্পদের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি পরিবারেরই কিছু না কিছু সম্পদ থাকে। এই সম্পদ দ্বারাই পরিবার সুষ্ঠু, সুন্দর এবং স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। একটি পরিবারের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষ এবং এই মানব সম্পদ অপরাপর বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অনেকের অর্থ, জমিজমা, বাড়ি–ঘর নাও থাকতে পারে কিন্তু একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, সময় ও শক্তি ইত্যাদি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পথ সুপ্রশস্ত হয় এবং অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে পরিবারের বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়।

প্রতিটি পরিবারে দেখা যায় গৃহকর্তা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সময়, শক্তি, ধৈর্য, কর্মক্ষমতা ইত্যাদির দ্বারা পরিবারের অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আর গৃহকর্ত্রী যদি অর্থ উপার্জন নাও করেন তবুও তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সময়, শক্তি, ধৈর্য, কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্থকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন এবং অন্যান্য সম্পদও বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন।

'সম্পদ' গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপকরণ। সম্পদ ছাড়া লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে যেসব বস্তু বা সেবা সামগ্রী মানুষের অভাব মোচনে সহায়ক এবং যার বিনিময়মূল্য আছে তাই সম্পদ। কিন্তু গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে যা দ্বারা পরিবার সকল চাহিদা পূরণ করে এবং অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে তাই সম্পদ। যেমন: অর্থ, জমি, বাড়ি, গাড়ি, গৃহের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং শক্তি, সময়, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যা ব্যবহার করে আমরা তৃপ্ত হই, আমাদের চাহিদা মেটাতে পারে, অভাব দূর করতে পারে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাই সম্পদ।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য– সম্পদ আমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণের হাতিয়ার। সম্পদ ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : ১. উপযোগ (Utility) ২. আয়ত্তাধীন (Accessibility) ৩. সীমাবদ্ধতা (Limitation) ৪. পরস্পর পরিবর্তনশীলতা (Inter-changeability) ৫. পরিচালনা যোগ্যতা (Manageability)

১। **উপযোগ (Utility)**– মানুষের অভাব মোচনে পণ্যের ক্ষমতাই হলো উপযোগ। যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে সেসব দ্রব্যসামগ্রী মানুষ পেতে চায়। কারণ উপযোগ বিশিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব মেটাতে সক্ষম হয়। তাই পণ্য বা সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উপযোগ।

শিক্ষা, বুদ্ধি, স্থান, সময়, আকার, স্বত্ব ও সৃজনশীলতার উপর উপযোগ নির্ভর করে। যেমন–শিক্ষার ক্ষেত্রে বইয়ের উপযোগ বেশি। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরিতে পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপযোগ বেশি। গ্রীষ্মের সময় পানির ও পাখার উপযোগ বেশি। আবার যখন ক্ষুধা পায় তখন খাদ্যের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। পিপাসা পেলে পানির উপযোগ বৃদ্ধি পায়। আবার একটা দ্রব্যের উপযোগিতা সবার কাছে এক রকম নয় । যেমন : যে পান খায় তার কাছে পানের উপযোগ বেশি কিন্তু যে পান খায় না তার কাছে এর কোনো উপযোগ নাই।

চারটি উপায়ে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় –

ক. আকৃতির পরিবর্তন করে – যেমন : চাউলকে সিদ্ধ করে ভাত রান্না করা হয়, যখন গুঁড়া করে পিঠা তৈরি করা হয় তখন এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় ।

খ. সময়োপযোগী ব্যবহার করে – আমরা ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করি, যদি জমি বা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারি তবেই অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় ।

গ. স্থানান্তরকরণ দ্বারা – সম্পদের উপযোগ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। যেমন – রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর আম উৎপন্ন হয়। এই আম অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তর করে আমের উপযোগ বাড়ানো হয় ।

ঘ. চাহিদা মেটানোর দ্বারা – একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো জিনিসের চাহিদা অনেক প্রকট থাকে। যেমন: পিপাসা পেলে পানির চাহিদা প্রকট। পরীক্ষার সময় কাগজ ও কলমের চাহিদা প্রকট ।

২। **আয়ত্তাধীন (Accessibility)**– সম্পদ আয়ত্তাধীন হতে হবে। সম্পদ ব্যবহার করতে হলে আয়ত্তাধীন বা মালিকানাধীন হতে হবে। অন্যের অর্থ নিজের খুব কমই কাজে লাগে। সম্পদ নিজের আয়ত্তাধীন না হলে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যের সম্পদ যদি ধার নেওয়া যায় বা কেউ দান করে তখনই অন্যের সম্পদ কাজে আসে। সম্পদের আয়ত্তাধীন মালিকানা সম্পদের গুণগত বৈশিষ্ট্য। এই গুণগত দিক নির্ভর করে সম্পদের ব্যবহারের উপর। যেমন– জমির উর্বরতা যত বাড়ানো যাবে মালিক তত লাভবান হবে। ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থ প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে না পারলে পরে সে অর্থ ততটা কাজে আসে না ।

কিছু কিছু সম্পদ আছে যা আয়ত্ত বা অর্জন করার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন । যেমন : দক্ষতা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি।

৩। **সীমাবদ্ধতা (Limitation)** সীমাবদ্ধতা সম্পদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্পদ গুণগত ও পরিমাণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। যেমন : শক্তি গুণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ এবং সময় পরিমাণগত দিক থেকে সীমাবদ্ধ।

তবে কোনো সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্থিতিস্থাপক। যেমন : শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠ দেন, তখন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একই শ্রেণিকক্ষের সকলে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধতার জন্য সমান জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সময়ের সীমাবদ্ধতা সর্বজনীন। আবার শক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য ঘটে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দ্বারা সময় ও শক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। **পরস্পর পরিবর্তনশীলতা (Inter-changeability)**

সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল। পরস্পর পরিবর্তন আমরা কয়েকটি ভাবে করতে পারি।

- **বিকল্প সম্পদ ব্যবহার** : বিকল্প বলতে একটার পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার বোঝায়। যেমন : ভাতের পরিবর্তে রুটি খাওয়া। পরিবেশ রক্ষার জন্য পলিথিনের পরিবর্তে কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা ইত্যাদি ।
- **বহুবিধ ব্যবহার** : একই সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন : খাবার টেবিল – চেয়ারকে পড়াশোনা, আলোচনা, কাপড় ইস্ত্রি করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যায়।
- **বিনিময়** : সম্পদ বিনিময়যোগ্য। যেমন : টাকার বিনিময়ে পণ্য ক্রয়।
- **রূপান্তরযোগ্য** – একটা সম্পদকে আর একটি সম্পদে রূপান্তর করা যায়। যেমন : পুরনো শাড়ি দিয়ে কাঁথা, ঘরের পর্দা, শিশুর জামা তৈরি করা। এতে সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- **সৃষ্টি** – একটা সম্পদ ব্যবহার করে অন্য সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। যেমন– জমিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করা। বাড়ির ছাদে সবজি উৎপাদন করা।

৫। পরিচালনা যোগ্যতা (Manage ability)

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকেই পরিচালনা বলা হয়। মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবেই হোক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। যেমন– বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সময়, জ্ঞান, দক্ষতা, অর্থ ইত্যাদি সম্পদের ব্যবহার করা হয়। এসব সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন– পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধায়ন ও মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়।

সম্পদের পরিচালন যোগ্যতা বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা উপকৃত হই। যেমন–

- লক্ষ্য অর্জন করা যায়
- সম্পদ বৃদ্ধি পায়
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে
- অভাব ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা মোকাবিলা করা যায়
- পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় ইত্যাদি।

কাজ – 'সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল' এই বৈশিষ্ট্যটি দুর্যোগকালে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় উদাহরণসহ লেখ।

পাঠ ৩ – সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী। তাই সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ও সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্পদের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

১। মানবীয় সম্পদ ২। বস্তুগত সম্পদ

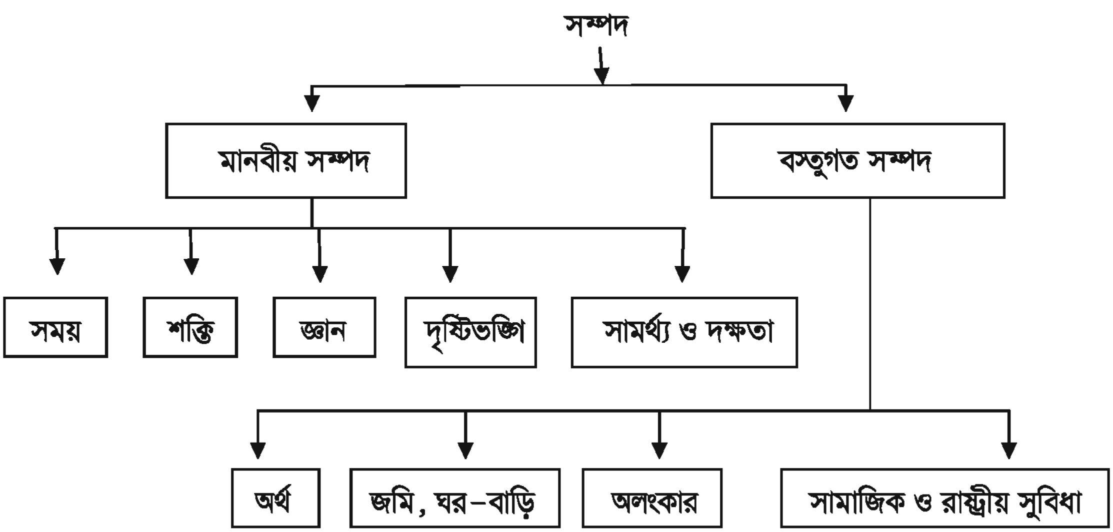

১। **মানবীয় সম্পদ** – যা মানুষের গুণ, চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাকে মানবিক সম্পদ বলে। যেমন : সময়, বিদ্যা, শক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান ইত্যাদি। প্রতি পরিবারে একাধিক সদস্য থাকে। প্রত্যেক সদস্যের

সামর্থ্য অনুযায়ী সময়, শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতার যদি সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় তবে পরিবারটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা, পারদর্শিতা, মনোভাব গৃহ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে এবং অমানবীয় বা বস্তুবাচক সম্পদের অপচয় হ্রাস করে এবং সমৃদ্ধি ঘটায়। যেমন– বাজেট করে চলা। বাজেট করে চললে অর্থকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। অর্থের অপচয় হ্রাস পায়।

আবার সময় তালিকা করে চললে সব কাজ সময়মতো শেষ করে জীবনে সফলতা অর্জন করা যায়। গৃহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ও বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধিতে মানবীয় সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মানবীয় সম্পদগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

সময় (Time) – গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ সময়কে মানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সময় ছোট–বড়, ধনী–গরিব সব মানুষের জন্যই সমান। সবার জন্যই ২৪ ঘন্টা সময় নির্ধারিত। যে এর সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে সে জীবনে সফল হয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শক্তি (Energy) – শক্তি দুই ধরনের হয়। শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি। যে কোনো কাজ করার জন্য দুই ধরনের শক্তির প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত অভ্যাস, অনুশীলন ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা দ্বারা শক্তি ব্যয় করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সফলতা অর্জন করা যায়।

জ্ঞান (Knowledge) – গৃহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান, বস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান, শিশু পালনের জ্ঞান, গৃহপরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানই একজন মানুষকে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গি (Out look) – ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়। চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি। শৈশবে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে পিতা–মাতার চিন্তাধারা থেকে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই জীবনকে পরিচালিত করে।

সামর্থ্য ও দক্ষতা (Ability and Skill) – পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের সম্পদ। যে পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা যত বেশি সে পরিবার তত উন্নত। তবে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা এক রকম নয়। সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবারের সকল কাজ ভাগ করে নিলে কাজের মান ভালো হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

কাজ – মানবিক সম্পদের গুরুত্ব লেখ।

২। **বস্তুগত সম্পদ** : যে বস্তু ও সেবা চাহিদা পুরণে সহায়ক তাই বস্তুগত সম্পদ। যেমন: টাকা, জমি, বাড়িঘর ইত্যাদি। আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি, যেমন– রাস্তা–ঘাট, বাজার, স্কুল–কলেজ, পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং গৃহজীবনকে সহজ করে।

অর্থ (Money) – অর্থ একটি বস্তুগত সম্পদ। এর বিনিময় মূল্য আছে এবং হস্তান্তরযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। মানুষের জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ দ্বারা আমরা দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে থাকি। এর সুষ্ঠু ব্যবহার জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করে।

জমি, বাড়ি ও অলংকার (Land, House and Ornament) – এর বিনিময় মূল্য আছে। পরিমাপ করা যায়। মালিকানা হস্তান্তর করা যায়। তবে এর ব্যবহারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরিকল্পিতভাবে সম্পত্তি গড়ে তুললে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা (Social and National Facilities) – সমাজ থেকে আমরা যেসব সুযোগ–সুবিধা লাভ করি তাই সামাজিক সম্পদ। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, স্কুল–কলেজ, বাজার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধা অধিকার সূত্রে মানুষ পেয়ে থাকে। পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি দূর করে। এইগুলো একটি দেশের জনগণ অধিকার সূত্রে ভোগ করার সুযোগ পায়।

পাঠ ৪– সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা –

সম্পদ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হলো এর ব্যবহার দ্বারা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করা এবং লক্ষ্য অর্জন করা । আমাদের চাহিদা অসীম, কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই অসীম চাহিদাকে সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণ করতে হলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন ।

- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পরিবারের আয় বাড়াতে, ব্যয় হ্রাস করতে ও অর্থ সঞ্চয় করতে সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যদের সময়, শক্তি, ক্ষমতা, দক্ষতা ও বুদ্ধি ইত্যাদি মানবীয় সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে পরিবারের আয় বাড়ানো যায় এবং ব্যয় হ্রাস করা যায়। যেমন – গৃহের আঙ্গিনায় সবজি উৎপাদন, হাঁস–মুরগি পালন, ঘরে পোশাক তৈরি ইত্যাদি।
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। যেমন– গৃহিণী যদি পরিবারের কাজের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন তবে গৃহিণী নিজের অনেক সময় ও শক্তি বাঁচাতে পারেন। সে সময় ও শক্তি পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজে বা অবসর বিনোদনে ব্যয় করতে পারেন। এতে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জন্মে ।
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে। যেমন– বাজেট করে চলা। সময় তালিকা করে চলা। ফলে অল্প সম্পদ দ্বারাই অধিক তৃপ্তি লাভ করা যায় এবং মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়।
- সম্পদের আয়ু বাড়াতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। গৃহের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বিশেষ করে রেফ্রিজারেটর, ইস্ত্রি, প্রেসারকুকার, ওভেন, আসবাবপত্র ইত্যাদির সঠিক যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ আর্থিক অপচয় হ্রাস ও মানসিক প্রশান্তি দান করে।

কাজ – সমাজ থেকে আমরা যে সকল সুযোগ–সুবিধা ভোগ করি সেগুলো সম্পর্কে লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উপযোগ নির্ভর করে কোনটির উপর?

ক) জ্ঞান খ) বুদ্ধি

গ) দৃষ্টিভঙ্গি ঘ) দক্ষতা

২। পরিবারকে সঠিকভাবে চালনার জন্য বেশি প্রয়োজন হয় কোনটির?

ক) শারীরিক শক্তি
খ) মানসিক শক্তি
গ) জ্ঞান
ঘ) সময়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হায়দার সাহেব বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে নিজে দেখাশোনা করতে পারলেন না। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল তার বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

৩। হায়দার সাহেব বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না–

ক) বিকল্প সম্পদের ব্যবহার করা
খ) সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করা
গ) ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুসরণ করা
ঘ) সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা।

৪। হায়দার সাহেবের বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরার কারণ কী?

i. সময় না দেওয়া।
ii. লক্ষ্য অর্জন না করা।
iii ব্যবস্থাপনার ধাপ না মানা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আয়েশা বেগম একজন গৃহিণী। তিনি সীমিত সম্পদের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেন। প্রয়োজনে তিনি তার পুরোনো শাড়ি দিয়ে ঘরের পর্দা, পাপোষ তৈরি করেন। আয়েশা বেগমের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার পরিবারের চাহিদা মেটান। পরিবারের সকলে তার উপর সন্তুষ্ট।

ক. শক্তি কোন দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ?
খ. কোন ধরনের সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য ব্যাখ্যা কর।
গ. আয়শা বেগমের কাজের মাধ্যমে সম্পদের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে আয়েশা বেগমের উপর সকলে সন্তুষ্ট–বিশ্লেষণ কর।

২। রহিমা খাতুন একজন গৃহিণী। তার কাছ থেকে পরিবারের অন্য সদস্যরা গৃহকর্মে সাহায্য–সহযোগিতা পাচ্ছে। তিনি সংসারের কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে নিজে হাঁস–মুরগি পালন করে পরিবারের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেন। তার কষ্টের উপার্জিত অর্থ তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে বিভিন্ন বাহানায় নষ্ট করে। বললেও শোনে না।

ক. উপযোগ কী?
খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?
গ. রহিমা খাতুনের ছেলে কোন ধরনের সম্পদ নষ্ট করে – ব্যাখ্যা কর।
ঘ. গৃহপরিচালনায় রহিমা খাতুন বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ব্যবহারে পারদর্শী কি না? মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়
গৃহসম্পদের ব্যবস্থাপনা

পাঠ ১ – অর্থ ব্যবস্থাপনা– বাজেট, বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ও বাজেটের খাত

গৃহ ব্যবস্থাপনায় অর্থকে বস্তুবাচক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থ বস্তুবাচক সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। মানবজীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের যে কোনো চাহিদা পূরণ করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় অর্থের। অর্থের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সংগ্রহ করি। অর্থকে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের অসীম চাহিদাগুলো সীমিত অর্থ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। অর্থ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় লক্ষ্য অর্জন বা চাহিদা পূরণ করতে অর্থকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন–চাহিদা পূরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা এবং সবশেষে মূল্যায়ন করা। পরিবার বিভিন্ন ভাবে আয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। অন্যান্য সম্পদের মতো পরিবারের অর্থসম্পদও সীমিত। যেহেতু অর্থ একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম তাই অর্থ দিয়েই আমাদের সব চাহিদা পূরণের উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে হয়। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য আমরা অর্থ সঞ্চয় করতে পারি। এ মূল্যবান সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করতে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত।

বাজেট

বাজেট হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের পূর্বপরিকল্পনা। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যয় ও সঞ্চয় করার পূর্বপরিকল্পনা হচ্ছে বাজেট। বাজেটে সম্ভাব্য আয়কে কোন কোন খাতে, কোন কোন সময়ে কী পরিমাণে ব্যয় করা হবে, তার লিখিত বিবরণ থাকে। সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করলে মূল্যবান অর্থের অপচয় ঘটে না। অধিকন্তু আমাদের সব চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা

বাজেট অর্থ ব্যয়ের একটি চমৎকার কৌশল। বাজেট সীমিত অর্থে আমাদের সকল চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করে। বাজেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- বাজেট পরিবারের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা দেয়।
- পরিবারের অপচয় রোধ করে স্বচ্ছলতা আনয়নে সাহায্য করে।
- ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে।
- গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে।
- বাজেট করে অর্থ ব্যয় করলে সময় ও শক্তির সাশ্রয় হয়।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের সকল চাহিদা পূরণ করে তাদের সন্তুষ্টি দিতে পারে।

বাজেটের খাত

প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন কোন খাতে অর্থ ব্যয় করতে হবে সেগুলো স্থির করতে হয়। পারিবারিক জীবন যাপনের যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হয়, সেগুলোই বাজেটের খাত হিসেবে পরিচিত। গুরুত্ব

অনুযায়ী খাতগুলো সাজিয়ে নিয়ে প্রতিটি খাতের মধ্যে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। খাতগুলো সাজানো হয় পরিবারের প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে। জীবনধারণের প্রয়োজনে সাধারণত খাতগুলো নিম্নোক্তভাবে সাজানো থাকে–

খাদ্য ক) শুকনা বাজার, যেমন–চাল, আটা, ডাল, চিনি, চা, সেমাই, বিভিন্ন শুকনা মসলা ইত্যাদি। খ) কাঁচাবাজার, যেমন–মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি।	চিকিৎসা ক) চিকিৎসকের ফি খ) ওষুধ ও পথ্য
বাসস্থান ক) ভাড়া খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি। গ) নিজস্ব বাড়ির ট্যাক্স, মেরামত ও যত্নবাবদ ব্যয় ইত্যাদি।	সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি ক) ভাতা বা হাত খরচ খ) আমোদ–প্রমোদ ব্যয়।
বস্ত্র ক) বস্ত্র ও পোশাক ক্রয় খ) পোশাক তৈরি ও মেরামত গ) বস্ত্র ধৌত ও ইস্ত্রি।	অন্যান্য খরচ ক) মেহমানদারি খ) উপহার ও চাঁদা গ) যাতায়াত ঘ) খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। ঙ) গৃহকর্মীর বেতন।
শিক্ষা ক) মাদরাসার বেতন খ) বই, খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি। গ) গৃহশিক্ষকের বেতন।	সঞ্চয় ক) ভবিষ্যৎ তহবিল খ) ব্যাংক, ইনসিউরেন্স, প্রাইজবন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি।

কাজ – ‘প্রকৃত বাজেট সময় ও শক্তির সাশ্রয় করে’– তোমার যুক্তিগুলো লিপিবদ্ধ কর।

পাঠ ২ – বাজেট তৈরির নিয়ম

বাজেট তৈরির কতকগুলো নিয়ম আছে, যা অনুসরণ করে প্রকৃত বাজেট তৈরি করা যায়। প্রতিটি কাজ যেমন নিয়ম মাফিক না করলে কাজগুলো সঠিক ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয় না, তেমনি বাজেট করার সময় নিয়ম অনুযায়ী না করলে বাজেট যথার্থ এবং কার্যকরী হবে না। বাজেট তৈরি করার নিয়মগুলো নিচে বর্ণিত হলো–

- বাজেট সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে করা হয়। তাই মাসের সম্ভাব্য মোট আয় নির্ধারণ করে নিতে হবে। আয়ের হিসাব করার সময় পরিবারের সব রকম উৎসের দিকে নজর দিতে হবে। যেহেতু অর্থ দিয়ে বাজেট করতে হয়, তাই পরিবারের মোট আর্থিক আয় নির্ণয় করতে হবে।
- যে সময়ের বাজেট করা হবে সে সময়ে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের একটি তালিকা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোকে প্রধান প্রধান খাতে শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হবে।

- তালিকাভুক্ত প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করার আগে সব জিনিসের বাজারদর সঠিকভাবে জানতে হবে। এরপর সবগুলোর মূল্য একত্রে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মতামত নেওয়া ভালো। বিভিন্ন সদস্যদের কাছ থেকে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ভালোভাবে না জেনে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করলে বাজেট বাস্তবায়নে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

- আনুমানিক আয়ের সাথে ব্যয়ের একটা সমতা রক্ষা করতে হবে। মোট আয় জানার পর সম্ভাব্য ব্যয়ের টাকার পরিমাণের সঙ্গে হিসাব করে দেখতে হবে যেন আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকে। ব্যয় যেন কখনোই আয়ের অংক থেকে বেশি না হয়। তবে পারিবারিক আয় বাড়িয়ে অথবা খরচের পরিমাণ কমিয়ে এ অবস্থার মোকাবিলা করা যায়।

- কোন খাতে কতো ব্যয় করা যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত খাদ্য খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাজেটে খাদ্য খাতে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিম্নবিত্তের বাজেটে এ খাতে আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ খরচ হতে পারে। আয় যত বাড়ে শতকরা হারে খাদ্য খাতে ব্যয়ও তত কমে যায়। সাধারণত সর্বনিম্ন বরাদ্দ দেওয়া হয়–সঞ্চয়, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে।

- পরিশেষে বাজেটটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যেন তা বাস্তবায়ন করা যায়। কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখলে বাজেটকে বাস্তবমুখী করা যায়। যেমন–প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজনগুলোর দিকে খেয়াল রাখা, জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কিছু বাড়তি অর্থ সব সময় হাতে রাখা, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

একটি মাসিক বাজেটের নমুনা দেওয়া হলো–

পরিবারের মাসিক মোট আয়–৩০,০০০/– টাকা

সদস্য সংখ্যা–৪ জন।

খাত	সম্ভাব্য খরচ (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	শতকরা হার %
১। খাদ্য ক) শুকনা বাজার খ) কাঁচাবাজার	 ৫০০০/– ৭০০০/–	১২,০০০/–	৪০%
২। বাসস্থান ক) ভাড়া খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি।	 ৭০০০/– ২০০০/–	৯,০০০/–	৩০%
৩। বস্ত্র ক) বস্ত্র ও পোশাক ক্রয় খ) পোশাক তৈরি ও মেরামত গ) বস্ত্র ধৌত ও ইস্ত্রি।	 ১০০০/– ৪০০/– ২০০/–	১,৬০০/–	৫.৩৩%
৪। শিক্ষা ক) মাদরাসার বেতন খ) বই, খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি। গ) গৃহশিক্ষকের বেতন।	 ১০০০/– ৫০০/– ২০০০/–	৩৫০০/–	১১.৬৭%

৫। চিকিৎসা ক) চিকিৎসকের ফি খ) ঔষধ ও পথ্য	 ৪০০/– ২০০/–	৬০০/–	২%
৬। সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি ক) ভাতা বা হাত খরচ খ) আমোদ–প্রমোদ ব্যয়।	 ৩০০/– ৪০০/–	৭০০/–	২.৩৩%
৭। অন্যান্য খরচ ক) মেহমানদারি খ) উপহার ও চাঁদা গ) যাতায়াত ঘ) খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। ঙ) গৃহকর্মীর বেতন।	 ৪০০/– ৪০০/– ২০০/– ২০০/– ১০০০/–	২২০০/–	৭.৩৩%
৮। সঞ্চয়	৪০০/–	৪০০/–	১.৩৩%
		৩০,০০০/–	১০০%

বিঃদ্রঃ বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের আলোকে বাজেটটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যাখ্যা করবেন।

মন্তব্য– উল্লিখিত বাজেটটিতে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান। এ রকম বাজেটকে সুষম বাজেট বলে। যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়, তাকে বলে ঘাটতি বাজেট। এ ছাড়া বাজেটে যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হয় সেটি হচ্ছে উদ্বৃত্ত বাজেট। উদ্বৃত্ত বাজেট হলো সবচেয়ে ভালো বাজেট। ঘাটতি বাজেট কখনোই কাম্য নয়। কারণ এ রকম বাজেটে ঋণের বোঝা বাড়ে।

কাজ – অভিভাবকের সহায়তায় তুমি তোমার পরিবারের মাসিক বাজেট তৈরি কর।

পাঠ ৩ – সময় ও শক্তির ব্যবস্থাপনা–সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও বিবেচ্য বিষয়

পারিবারিক মানবীয় সম্পদগুলোর মধ্যে সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সময় এমনই এক সম্পদ যা কখনোই থেমে থাকে না বা কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময় সবচেয়ে সীমিত সম্পদ যা কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। সময় কখনো সঞ্চয় করা যায় না। বরং কোনো না কোনো কাজে একে ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি যত বেশি অর্থবহ কর্মসূচি দিয়ে যথাযথভাবে নিজেকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে জীবনে সেই তত বেশি সফলতা অর্জন করতে পারে। সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সময়কে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই দৈনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কোনো দিনের শুরু থেকে আবার নতুন দিন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কী কী কাজ করা প্রয়োজন, কখন করা প্রয়োজন এবং দৈনিক নির্ধারিত কাজের জন্য কতোটুকু সময় ব্যয় হবে ইত্যাদি বিবেচনা করে সময় তালিকা বা সময় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সময় যেমন তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ সে রকম সময় তালিকাও প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস, প্রয়োজন, পছন্দ, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে সময় তালিকা তৈরি হয়।

সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা

দৈনন্দিন কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে সময় তালিকা তৈরি করতে হয়। তালিকাটি এমন স্থানে রাখতে হবে, যাতে সহজেই নজরে পড়ে। তালিকা দেখে কাজ করতে থাকলে, একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে। এর ফলে সময়মতো সব কাজ সম্পন্ন করার ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং সময়ের অপচয় করার প্রবণতা কমে যায়। সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবনে সফলতা আনয়ন করা সম্ভব হয়। সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণিত হলো।

- **করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা জন্মে–** সময় তালিকা করে কাজ করলে করণীয় কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। কারণ কোন কাজ একান্ত প্রয়োজন, কোন কাজ করলে ভালো হয় ও কোন কাজ প্রয়োজনে বাদ দেওয়া যায়– এসব কিছু বিবেচনা করে সময় তালিকা করা হয়।

- **সময়মতো কাজ করার অভ্যাস হয়–** কাজের সময় নির্ধারিত থাকে বলে নির্ধারিত সময়েই কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা থাকে যা ভবিষ্যতে অভ্যাসে পরিণত হয়।

- **সময়ের সাথে কাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা বাড়ে–** সময় তালিকা করলে কোন কাজগুলোর জন্য সময় অপরিবর্তনীয় এবং কোন কাজগুলো প্রয়োজনে রদবদল করা যায় সে বিষয়ে ধারণা জন্মে। যেমন– ডাক্তারের কাছে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, দুপুরের ধর্মীয় কাজ এই সময়গুলো ইচ্ছে করলে বদলানো যায় না। তবে ঘুমের সময়, গল্প করার সময় ও পড়ার সময় প্রয়োজনে বদলানো যায়।

- **কাজের প্রয়োজনীয় সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়–** সময় তালিকায় কোন কাজে কতোটুকু সময় বরাদ্দ দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করতে হয়। সুতরাং সে অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি কাজের প্রয়োজনীয় সময় সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি হয়।

- **অবসর বিনোদন সম্ভব হয়–** সময় তালিকায় কাজের সাথে সাথে বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ফলে অবসর বিনোদন ভোগ করার সুযোগ থাকে, যা ক্লান্তি দূর করে নতুন উদ্দীপনায় কাজ করার প্রেরণা জোগায়।

- **কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে–** সময় তালিকা করলে সময়মতো রুটিনমাফিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে অভ্যাসের কারণে কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে। সৃজনশীল কাজ করার সময় ও সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন রকম কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সময় তালিকায় বিবেচ্য বিষয়

কার্যকর সময় তালিকা প্রণয়নের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়।

- দৈনিক করণীয় কাজগুলো ঠিক করতে হবে
- গুরুত্ব অনুসারে কাজগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে হবে
- পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সময় তালিকা করা প্রয়োজন
- কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন সেভাবে সময় তালিকা প্রণয়ন করতে হয়
- পারিবারিক অবস্থা, সুযোগ–সুবিধা, সদস্যদের কাজের অভ্যাস বিবেচনা করে সময় তালিকা করতে হবে

- যে কাজগুলো একসাথে করলে সময় বাঁচে, সেভাবে কাজের সমন্বয় করতে হবে
- পারিবারিক কাজগুলোকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক হিসেবে ভাগ করতে হবে। যে সব কাজ সাপ্তাহিক বা মাসিক, সেগুলোকে দৈনিক সময় তালিকা থেকে পৃথক রাখতে হবে
- সময় তালিকায় কাজের সময়, বিশ্রাম, ঘুম ও অবসরের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- কঠিন কাজের পর হালকা কাজ দিতে হবে। এতে ক্লান্তি দূর হয় এবং পরবর্তী কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়
- সময় তালিকা নমনীয় হতে হবে। যাতে প্রয়োজনে কিছুটা রদবদল করা যায়

কাজ – সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করলে কী কী সুবিধা হয়, চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৪ – দৈনিক সময় তালিকা প্রস্তুত

দৈনিক সময় তালিকা অনুসরণ করে কাজ করলে করণীয় সব কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে কাজে সফলতার আনন্দে নতুন উদ্যমে আরও কাজ করার ইচ্ছা বেড়ে যায়। ছাত্রজীবনে সময় তালিকা অনুসরণ করলে সফলতা লাভ করা যায়। প্রত্যেকের উচিত মূল্যবান সময় অপচয় না করে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করা।

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য সময় তালিকার দুইটি নমুনা দেওয়া হলো। তবে ঋতুভেদে এতে সময়ের কিছু তারতম্য হতে পারে। কেননা শীতের দিনে রাত বড় দিন ছোট হয়। এ ছাড়া নামাজ/ধর্মীয় প্রার্থনার সময়ও ঋতুভেদে তফাৎ হয়। তাই ঋতু অনুযায়ী এ সময়গুলো নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে সময় তালিকায় কাজের কিছুটা পরিবর্তন আনা যায়। তবে তা আবার অন্য সময়ের কাজের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। ছাত্রজীবন থেকেই সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য একটি দৈনিক (স্কুল খোলার দিনে)
সময় তালিকার নমুনা

কাজের বিবরণ	সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে–পর্যন্ত	কাজের জন্য ধার্য সময়
সকালে ঘুম থেকে ওঠা	৫.৩০	–
প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন	৫.৩০–৫.৪৫	১৫ মিনিট
দাঁত মাজা ও হাতমুখ ধোয়া প্রাতঃকালীন নিজ ধর্মীয় কাজ করা	৫.৪৫–৫.৫৫	১০ মিনিট
নিজের বিছানা গোছানো	৫.৫৫–৬.০৫	১০ মিনিট
মাদরাসার রুটিন দেখে সেদিনকার পড়া ও বই গোছানো	৬.০৫–৭.০৫	১ ঘন্টা
নাশতা খাওয়া ও মাদরাসার জন্য তৈরি হওয়া	৭.০৫–৭.৩০	২৫ মিনিট
যাওয়া–আসাসহ মাদরাসায় অবস্থান সময়	৭.৩০–২.০০	৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
মাদরাসা থেকে ফেরার পর মাদরাসার কাপড় বদলানো ও স্বল্প বিশ্রাম গ্রহণ	২.০০–২.২০	২০ মিনিট
গোসল ও নামাজ/প্রার্থনা	২.২০–২.৩৫	১৫ মিনিট

কাজের বিবরণ	সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে–পর্যন্ত	কাজের জন্য ধার্য সময়
দুপুরের খাওয়া	২.৩৫–২.৫০	১৫ মিনিট
বিশ্রাম গ্রহণ	২.৫০–৪.০০	১ ঘণ্টা ১০ মিনিট
মাদরাসা থেকে দেওয়া বাড়ির কাজ করা	৪.০০–৫.০০	১ ঘণ্টা
হাতমুখ ধোয়া ও বিকেলের নামাজ/প্রার্থনা	৫.০০–৫.১৫	১৫ মিনিট
চুল আঁচড়ানো ও পরিপাটি হওয়া	৫.১৫–৫.৪০	২৫ মিনিট
মা–বাবা ও ভাইবোনদের কাজে সাহায্য করা ও গল্প করা এবং সবার সাথে কিছু নিয়ে আলোচনা	৫.৪০–৬.৪০	১ ঘণ্টা
হাতমুখ ধোয়া ও সন্ধ্যায় নামাজ/প্রার্থনা	৬.৪০–৭.০০	২০ মিনিট
হালকা নাশতা পরিবেশনে মাকে সাহায্য করা	৭.০০–৭.৩০	৩০ মিনিট
মাদরাসার পড়া তৈরি করা	৭.৩০–৮.৪৫	১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
টেলিভিশন দেখা	৮.৪৫–৯.৪০	৫৫ মিনিট
রাতের খাবার খাওয়া এবং শোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করা	৯.৪০–১০.০০	২০ মিনিট
টেলিভিশনে খবর শোনা	১০.০০–১০.১৫	১৫ মিনিট
মাদরাসার পড়ার বাকি অংশ শেষ করা	১০.১৫–১১.০০	৪৫ মিনিট
হাতমুখ ধোয়া এবং নামাজ/প্রার্থনা শেষ করে ঘুমাতে যাওয়া	১১.০০–১১.১৫	১৫ মিনিট
ঘুম	১১.১৫–৫.৩০	৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
		মোট ২৪ ঘণ্টা

সময় তালিকা

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য বন্ধের দিনের সময় তালিকার নমুনা

কাজের বিবরণ	সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে–পর্যন্ত	কাজের জন্য ধার্য সময়
সকালে ঘুম থেকে ওঠা	৫.৩০	–
প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন, দাঁতমাজা ও হাতমুখ ধোয়া	৫.৩০–৫.৪৫	১৫ মি.
ফজর নামাজ পড়া	৫.৪৫–৫.৫৫	১০ মি.
নিজের বিছানা গোছানো	৫.৫৫–৬.০৫	১০ মি.
মাকে নাশতা তৈরির কাজে সাহায্য করা ও নাশতা খাওয়া	৬.০৫–৭.২০	১ ঘণ্টা ১৫ মি.
ভাইবোনদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা	৭.২০–৮.০৫	৪৫ মি.
নিজের সাপ্তাহিক নোংরা কাপড় আলাদা করা ও ধোয়ার জন্য প্রস্তুত করা	৮.০৫–৯.০৫	১ ঘণ্টা
মাকে ঘর গোছানো ও রান্নার কাজে সাহায্য করা	৯.০৫–১০.০৫	১ ঘণ্টা
টেলিভিশন দেখা	১০.০৫–১১.৩৫	১ ঘণ্টা ৩০ মি.
নখকাটা, চুল শ্যাম্পু করা, কাপড় ধোয়া ও গোসল করা	১১.৩৫–১.০৫	১ ঘণ্টা ৩০ মি.
নিজে পরিপাটি হওয়া	১.০৫–১.৩৫	৩০ মি.
দুপুরের খাবার খাওয়া, পরিবেশন করা ও টেবিল গোছানোর কাজে মাকে সাহায্য করা ও যহরের নামাজ পড়া	১.৩৫–২.৩৫	১ ঘণ্টা
মা–বাবা, ভাইবোনদের সাথে সময় কাটানো ও বিশ্রাম গ্রহণ	২.৩৫–৩.৩৫	১ ঘণ্টা
মাদরাসার সাপ্তাহিক বাড়ির কাজ তৈরি করা	৩.৩৫–৪.৩৫	১ ঘণ্টা

২০১৬

ওযু করে আসরের নামাজ পড়া	৪.৩৫–৪.৫০	১৫ মি.
বাইরে বেড়াতে যাওয়া কেনাকাটা করা	৪.৫০–৬.১০	১ ঘণ্টা ২০ মি.
ওযু করে মাগরীবের নামাজ পড়া	৬.১০–৬.৩০	২০ মি.
ভাইবোনদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা	৬.৩০–৭.৪৫	১ ঘণ্টা ১৫ মি.
নিজের মাদরাসার পড়া তৈরি করা	৭.৪৫–৯.০০	১ ঘণ্টা ১৫ মি.
টেলিভিশন দেখা	৯.০০–৯.৫৫	৫৫ মি.
রাতে খাবার খাওয়া ও শোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করা	৯.৫৫–১০.১৫	২০ মি.
মাদরাসার পড়ার বাকি কাজ শেষ করা	১০.১৫–১১.০০	৪৫ মি.
এশার নামাজ শেষ করা ও ঘুমাতে যাওয়া	১১.০০–১১.১৫	১৫ মি.
ঘুম	১১.১৫–৫.৩০	৬ ঘণ্টা ১৫ মি.
		মোট– ২৪ ঘণ্টা

কাজ – গ্রীষ্মের ছুটির বন্ধে এক দিনের একটি সময় তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৫ – শক্তি ব্যবস্থাপনা

অর্থ ও সময়ের মতো শক্তি পরিবারের একটি অন্যতম মৌলিক সম্পদ। মানবীয় এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও মানসিক পরিতৃপ্তি নির্ভর করে। অন্যান্য সম্পদের মতো শক্তির সদ্ব্যবহারের প্রতি সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। চাহিদা পূরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। যে কোনো কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে সে কাজে কম শক্তি ব্যবহার হয়। অথবা একই পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে যেন অনেক কাজ করা যায়। তাহলেই আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারব। শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে তা ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শক্তি ব্যবহার করলে, এর অপচয় রোধ করা যায়। শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন–

- একটি কর্মতালিকা অনুসরণ করে কাজ করতে হবে।
- কোন কাজে কেমন শক্তি ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে সহজে কাজটা করা যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- বয়স, ব্যক্তিগত পছন্দ, আগ্রহ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাজগুলো বণ্টন করে দিতে হবে।
- কাজের সময় দুই হাত ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রেখে কাজ করলে শক্তির অপচয় হয় না। যেমন– দাঁড়িয়ে ঘর মুছলে, বসে ঘর মোছার চেয়ে কম শক্তি ব্যয় হয়।
- ভারী কাজের পর বিশ্রাম গ্রহণ বা হালকা কাজ করতে হয়।
- বিভিন্ন রকম শ্রমলাঘব যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে শক্তির খরচ কমানো যায়। যেমন– প্রেসারকুকার, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদি।

এ ছাড়া শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারে কিছু কৌশল অবলম্বন করে, সহজে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় এ রকম কৌশলগুলো কাজ সহজকরণ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। কাজ সহজকরণ পদ্ধতিতে

২০১৬

শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো নিম্নরূপ–

- **দেহের সঠিক অবস্থান ও সঠিক গতি রক্ষা করে কাজ করা–** শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কর্মকেন্দ্রের পরিসর এমন হওয়া উচিত, যাতে দেহের অবস্থান এবং দেহভঙ্গি ঠিক রেখে কাজ করা যায়। কাজের সরঞ্জামগুলো হাতের নাগালের মধ্যে থাকলে শক্তির সাশ্রয় হয়।

- **কাজের সঠিক স্থান ও সঠিক সরঞ্জামের ব্যবহার–** কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে কাজ করলে, কম শক্তি খরচ করে কাজ করা যায়। যেমন–খাবার ঘরে খাওয়ার কাজ সম্পন্ন করা, ধোয়ার স্থানে ধোয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো সুবিধাজনক। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো কাজের স্থানে থাকলে অযথা হাঁটাহাঁটিতে শক্তির অপচয় হয় না। কাজের উপযোগী সঠিক সরঞ্জামও শক্তির সাশ্রয় করে। যেমন– ঘর মোছার জন্য কাপড়ের পরিবর্তে মপ ব্যবহার আরামদায়ক।

- **সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা–** সব কাজের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে, তা অনুসরণ করে কাজ করলে শক্তির সাশ্রয় হয়। যেমন–অনেক কাপড় আলাদা আলাদাভাবে না ধুয়ে সবগুলো একসাথে সাবান পানিতে ভিজিয়ে রেখে, একত্রে ধুয়ে শুকাতে দিলে কাজ সহজ হয় ও শক্তি বাঁচে।

- **ব্যবহৃত সামগ্রী পরিবর্তন করা–** বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর পরিবর্তন করেও শক্তির সাশ্রয় করা যায়। যেমন–খাবার টেবিলে কাপড়ের টেবিল ক্লথ ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথ ব্যবহার করলে শক্তির অপচয় কম হয়।

- **উৎপাদিত সামগ্রীর মান পরিবর্তন করা–** উৎপাদিত সামগ্রীর মান পরিবর্তন করেও শক্তি বাঁচানো যায়। যেমন–সালাদ বানাতে শসা, টমেটো কুঁচি করে না কেটে স্লাইস করে কাটা যায়। এতে সময় ও শক্তির সাশ্রয় হয়।

কাজ – দৈনন্দিন কাজে শক্তির সাশ্রয় করার জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পার তা লিখে জানাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষের চাহিদা পূরণে কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

ক) সময় খ) অর্থ

গ) শ্রম ঘ) পরিকল্পনা

২। নির্ধারিত আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখাকে কী বলা হয়?

ক) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য খ) সঠিক পরিকল্পনা

গ) যথাযথ তালিকা ঘ) সুষম বাজেট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমেনা বেগম সংসারের সব কাজ একাই করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা ভারী কাজগুলো করে তিনি হাঁপিয়ে উঠেন।

৩। আমেনা বেগম কীভাবে কাজ করলে হাঁপিয়ে উঠবেন না ?

ক) ভারী কাজগুলো আগে করলে
খ) হালকা কাজগুলো আগে করলে
গ) ভারী কাজের পর হালকা কাজ করলে
ঘ) হালকা কাজের পর ভারী কাজ করলে

৪। আমেনা বেগমের কাজের ক্ষেত্রে কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়?

i) পরিকল্পনার
ii) সময় তালিকার
iii) নতুন উদ্যমে কাজ করার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তানজীল সাহেব একজন চাকরিজীবী। তার মাসিক আয় ১০,০০০/– টাকা। স্ত্রী, স্কুল পড়ুয়া দুই সন্তান এবং অসুস্থ মাকে নিয়ে তাঁর সংসার। মাসের শুরুতে সংসার চালানোর টাকা স্ত্রীর কাছে দেন। মাস শেষ হওয়ার আগেই টাকা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কষ্ট করে বাকি দিন চালাতে হয়।

ক. বাজেট কী?

খ. বাজেটের খাত বলতে কী বোঝায়?

গ. তানজিল সাহেবের পরিবারের জন্য একটি মাসিক বাজেট প্রণয়ন করে দেখাও।

ঘ. তানজিল সাহেবের সংসারে বাজেট করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্র। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এই ক্ষেত্রে দামি আসবাবের প্রয়োজন নেই। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কমদামি জিনিস দিয়েও গৃহ সজ্জা করে রুচি ও শিল্পী মনের পরিচয় দেওয়া যায়। গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা একান্ত প্রয়োজন। পরিবার গৃহসজ্জার মাধ্যমে জীবনযাপনের মান উন্নত করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে। আর গৃহের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক উন্নতির বিকাশ ঘটে।

পাঠ ১ – আসবাব নির্বাচন

আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট, খাট, ওয়ারড্রোব, আলমিরা, বুকশেলফ ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্রীকে বোঝায়। গৃহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন সহজতর করার জন্য আসবাবের ভূমিকা অনেক। তা ছাড়া আরাম ও সৌন্দর্য বাড়াতেও এগুলোর জুড়ি নেই।

শহর কিংবা গ্রাম সর্বত্রই গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। পরিবারের জীবনযাত্রার মান, অবস্থানের স্থান অর্থাৎ শহর কিংবা গ্রাম, পারিবারিক জীবন চক্রের স্তর ইত্যাদির ভিন্নতায় আসবাবের চাহিদার ধরন বদলায়।

গ্রামাঞ্চলের গৃহগুলো যেহেতু স্থায়ী আবাসস্থল এবং পর্যাপ্ত আয়তনবিশিষ্ট হয়ে থাকে তাই বড় আকৃতির ভারী কাঠের আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহের মধ্যে খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ, মিটসেফ, আলমিরা, আলনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আম, জাম, কাঁঠাল, কড়ই ইত্যাদি গাছের কাঠ ব্যবহার করে কাঠমিস্ত্রি দিয়ে বাড়িতেই এই আসবাবগুলো নিজেদের চাহিদামতো বানিয়ে নেওয়া হয়।

শহরাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ লোকই ভাড়াবাড়িতে বসবাস করে। যারা নিজেদের বাড়িতে থাকেন তারাও আয়তনের সীমাবদ্ধতার জন্য নিজেদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী হালকা ও যুগোপযোগী আসবাব ব্যবহার করে থাকেন। তা ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করতে যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য হালকা ও রুচিশীল আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহের মধ্যে খাট, বক্স খাট, নানা সাইজের টেবিল, লুকিং গ্লাসযুক্ত কাঠের আলমিরা, সোফাসেট, গদিওয়ালা চেয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শহরাঞ্চলে সীমিত আয়তনের নকশাদার, শৌখিন ও আধুনিক মডেলের আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে আম, কাঁঠাল, কড়ই কাঠের পাশাপাশি সেগুন কাঠ, প্লাই উড, পারটেক্স ইত্যাদি কৃত্রিম কাঠের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। শহরাঞ্চলে রেডিমেড বা তৈরি আসবাব বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

বর্তমান গ্রাম ও শহর সর্বত্রই প্লাস্টিকের তৈরি আসবাব যেমন– চেয়ার, টেবিল, খাট, র‍্যাক ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

- **প্রয়োজনীয়তা–** আসবাব ক্রয়ের প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। প্রয়োজন না থাকলে হুজুগের বশে ক্রয় করলে পরে অপচয়ের সামিল হয়। এ ছাড়া পুরনো আসবাব যদি রং বা বার্নিশ করে ব্যবহার করা যায় তাহলে নতুন আসবাব ক্রয় করে অর্থের অপচয় করা ঠিক নয়।

- **পরিবারের আয়–** পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখেও তা দৃষ্টিকটু মনে হয়।

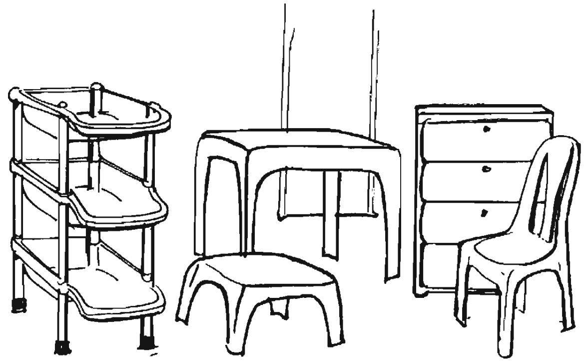

বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র

- **আসবাবের মূল্য–** আসবাবের মূল্য নির্ভর করে উপকরণের উপর। সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি কাঠের আসবাবপত্রের দাম অনেক। আবার বেত ও প্লাস্টিকের বা রডের আসবাবের দাম তুলনামূলক কম।

- **আরাম–** আসবাব নির্বাচনে আরাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসবাবের আয়তন, উচ্চতা, গভীরতা আরামদায়ক না হলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়। যেমন: টেবিলের উচ্চতা যদি বেশি হয় তবে কাজের সমস্যা হয়। আবার চেয়ারে বসে যদি আরাম না পাওয়া যায় তবে কাজ করা কষ্টকর হয়।

- **উপযোগিতা–** আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়স উপযোগী হবে। খাট, চৌকি এগুলো আমাদের শয়ন কাজের চাহিদা মেটায়। আবার টুল, মোড়া, সোফা, চেয়ার এগুলো আমাদের বসার কাজের চাহিদা মেটায়। আবার আসবাব কী উপাদানের দ্বারা তৈরি তার উপরও উপযোগিতা নির্ভর করে। যেমন: কাঠের আসবাবের চেয়ে গদিওয়ালা আসবাবের আরাম বেশি ফলে এর উপযোগিতা বেশি।

- **রুচি ও পছন্দ–** আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কক্ষের আকার আয়তন, মেঝে ও দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুচিসম্মত আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা করলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।

- **স্থায়িত্ব–** আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপকরণ ও নির্মাণ কাজের উপর। কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। আবার পাকা কাঠ, মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

- **জীবনযাত্রার মান–** পদমর্যাদা ও বিত্তের উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বিত্তের পরিবারের আসবাব বেশ দামি হয়। এইসব পরিবারের ড্রইং রুম প্রশস্থ হয় ফলে একটু জাঁকজমকভাবে সাজানো থাকে। আবার নিম্নবিত্তের পরিবারে শয়ন কক্ষের এক পাশেই বসার ব্যবস্থা থাকে।

- **নকশা–** আসবাবের নকশা রুচিসম্মত হতে হবে। এই ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, আরামদায়ক ও শিল্পসম্মত নকশাই বেশি গ্রহণযোগ্য। আবার নকশাটি এমন হবে যাতে পরিষ্কার করতে বেশি কষ্ট বা সময় না লাগে।

- **বহুবিধ ব্যবহার–** একটি আসবাব বহুবিধভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন: ডিভান বসা ও শোয়া দুই কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাইনিং টেবিল– খাওয়া, পড়াশোনা, আলাপ–আলোচনা করার কাজে ব্যবহার করা যায়। আধুনিক যুগে গৃহের আয়তন কম থাকে তাই আসবাবের বহুবিধ ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।

- **পরিবারের আকার–** পরিবারের আকার যদি বড় হয় তবে নমনীয় ও বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আসবাবের কথা চিন্তা করতে হবে।
- **চাকরির প্রকৃতি–** বদলির চাকরি হলে আসবাব হালকা এবং কেবল দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় এমন আসবাবই নির্বাচন করতে হবে। বেশি আসবাব বদলির সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আসবাবও সহজে নষ্ট হয়ে যায়।
- **আবহাওয়া–** আমাদের দেশে গরম ও ধুলাবালি বেশি। তাই হালকা ডিজাইনের আসবাব বেশি উপযোগী এবং যত্ন নেওয়া সহজ।
- **যত্ন–** আসবাব নির্বাচনের সময় যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর আসবাবের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে।
- **কক্ষের আয়তন ও আকার–** কক্ষের আয়তন ও আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

কাজ – তুমি তোমার পরিবারের জন্য আসবাব ক্রয় করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে লেখ।

পাঠ ২– আসবাব বিন্যাস

আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হলো সঠিকভাবে তা বিন্যাস করা। আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে করা হয়– তা নয়। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে।

গ্রাম কিংবা শহরে সর্বত্রই অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসের কতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। যথা :

প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস– আসবাব বিন্যাসের প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো ঘরেই অতিরিক্ত আসবাব রাখতে নেই। বাসগৃহের জন্য আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় প্রথমে দেখতে হবে কক্ষটি কী কাজে ব্যবহার হবে। কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব রাখতে হবে। যেমন :

শয়ন কক্ষ– খাট, ওয়ারড্রোব, আলনা, আলমারি ইত্যাদি।

বসার কক্ষ– সোফাসেট, বেতের চেয়ার, টেবিল, সোকেস, বুকসেলফ ইত্যাদি।

খাবার কক্ষ– ডাইনিং টেবিল, সোকেস, ফ্রিজ ইত্যাদি।

পড়ার কক্ষ– বুকসেলফ, টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার ইত্যাদি।

- **ব্যবহারিক সুবিধা–** আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাতে হবে।
- **চলাচলের সুবিধা–** গৃহের মধ্যে চলাচল, কাজ সম্পাদনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আসবাবপত্র সাজাতে হবে। ঘরের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলে যেন অসুবিধা না হয় ও কার্য সম্পাদনে যেন অতিরিক্ত চলাচল প্রয়োজন না হয় আসবাব বিন্যাসের সময় সে দিকে লক্ষ রাখতে হয়। যেমন: বুক সেলফটিকে পড়ার টেবিলের পাশেই রাখতে হয়। ঘরে ছোট শিশু থাকলে তাদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি খেয়াল রেখে আসবাবপত্র সাজানো শ্রেয়। শিশুরা যাতে ঘরময় স্বাধীন ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

- **কাজ অনুযায়ী আসবাব বিন্যাস–** আসবাব সজ্জা এমন হতে হবে যেন কাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ যে কক্ষে যে যে কাজ সম্পন্ন হয় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আসবাব স্থাপন করতে হয়।
- **আলো–বাতাস চলাচল সুবিধা–** আসবাবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে দরজা–জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। এ ছাড়া গৃহের অভ্যন্তরে আলো–বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশও ব্যাহত হয়।
- **দেয়াল ঘেষে বিন্যাস না করা–** আসবাব বিন্যাসের সময় মনে রাখতে হবে যে টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি কখনো দেয়াল ঘেষে রাখতে নেই। দেয়াল হতে একটু সামান্য দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। তা না হলে ঘষা লেগে দেয়ালের রং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং আসবাবপত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আসবাবপত্র বিন্যাসের মাধ্যমে কক্ষের গঠনগত ত্রুটি ঢেকে রাখা যায়।
- **গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আনা–** আসবাবপত্র বিন্যাস কখনো স্থায়ীভাবে একই জায়গায় করা উচিত নয়। এতে গৃহসজ্জায় একঘেঁয়েভাব চলে আসে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের বিন্যাসে রুচির রদবদল করলে গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে।
- **শিল্পনীতির প্রয়োগ–** আসবাব বিন্যাসের উপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এই শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্প সৃষ্টির মূলনীতি যথা– সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়। নিম্নে আসবাব বিন্যাসে শিল্পনীতির প্রয়োগ বর্ণনা করা হলো–

ক. সমানুপাত (Proportion)- আসবাব বিন্যাসে ঘরের আকৃতির সাথে আসবাবপত্রের আকার নির্ধারণ করা দরকার। বড় ঘরে বড় আসবাব ও ছোট ঘরের জন্য ছোট আসবাব মানানসই। আবার যেখানে বড় ও ছোট আসবাবের সংমিশ্রণ প্রয়োজন সেখানে বড় আসবাবের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ছোট দুই–তিনটি আসবাব একত্রে সাজানো যায়। আসবাবপত্রের পরস্পরের আকৃতির অনুপাত ঠিক হলে সমগ্র গৃহসজ্জার আসবাব বিন্যাসে পারস্পরিক মিত্রতা বা মিল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

খ. ভারসাম্য (Balance)– আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্য দিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি অন্য দিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। একটি কক্ষের দুই দিকের আসবাবের গুরুত্ব সমান হলে তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে অন্যদিকে একপাশের জিনিসে বেশি গুরুত্ব থাকলে অর্থাৎ বেশি সাজানো থাকলে তাকে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে। অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য গৃহসজ্জায় নতুনত্ব ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

গ. সামঞ্জস্য (Harmony)– সবার সাথে সবার মিত্রতাকেই সামঞ্জস্য বলে। ঘরে কেবল দামি আসবাব, চিত্রকর্ম, সো–পিস থাকলেই হবে না। সবকিছুর সাথে একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

ঘ. ছন্দ (Rhythm)– আসবাব বিন্যাসে ছন্দ বজায় রাখা দরকার,এতে দৃষ্টি কক্ষের একটা আসবাবে আবদ্ধ না থেকে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে অন্য আসবাবে গিয়ে পৌঁছায়। কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৃষ্টি উঠানামা করে। দৃষ্টির এই উঠানামাই ছন্দ। ছন্দের গতি আসবাব বিন্যাসে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। একঘেয়েমি দূর করে এবং নতুনত্ব আনয়ন করে।

ঙ. **প্রাধান্য (Emphasis)**– আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হলো প্রাধান্য। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।

কাজ : তুমি তোমার কক্ষে আসবাব বিন্যাসে কী কী বিষয় লক্ষ রাখবে লেখ।

পাঠ ৩ – বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস

শয়নকক্ষ (Bed Room)–

সারা দিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে।

শয়নকক্ষ

লক্ষণীয় বিষয়–

- শয়নকক্ষে খাট বা চৌকি, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, আলমারি, ওয়ারড্রোব ইত্যাদি আসবাব থাকে। খাট বা চৌকির অবস্থান এমনভাবে হবে যাতে চোখে আলো না পরে।
- কক্ষের দেয়ালের রং হালকা হলে ভালো হয়।
- খাটের পাশে বই বা খবরের কাগজ রাখার জন্য ছোট টেবিল রাখা যায়। টেবিল ল্যাম্প থাকলে পড়ার সময় পর্যাপ্ত আলো পাওয়া যায়।
- দেয়াল সজ্জার জন্য চিত্রকর্ম থাকতে পারে। ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের উপর একগুচ্ছ ফুল ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

বসার ঘর (Drawing Room)

বসারকক্ষে পরিচিত লোকজন বা আত্মীয়স্বজন এসে বসে। সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো বসার ঘর। এই কক্ষের বিন্যাস বাড়ির লোকদের রুচিবোধ বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে।

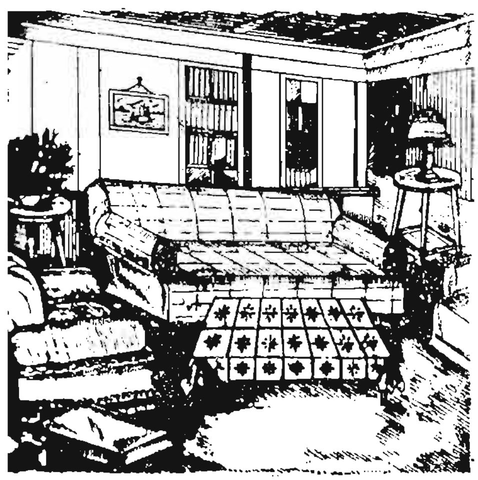
বসার ঘরের বিন্যাস

লক্ষণীয় বিষয়–

- বসার ঘরে সোফাসেট, ডিভান, মোড়া, বুকসেলফ, সোকেস থাকে।
- কক্ষকে আকর্ষণীয় কারার জন্য বড় ফুলদানিতে ফুল,

একুরিয়াম, চিত্রকর্ম, খ্যাতিমান ব্যক্তির ছবি, কার্পেট ইত্যাদি রাখা যেতে পারে।

- আলো–বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, চলাচলের সুবিধা, শিল্পনীতি অনুসরণ করে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

খাবার ঘর (Dining Room)

খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থল। বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটা আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

লক্ষণীয় বিষয়–

- খাবার ঘরে খাবার টেবিল, চেয়ার সোকেস, মিটসেফ, ফ্রিজ, ট্রলি ইত্যাদি থাকে। টেবিল গোল, ডিম্বাকৃতির বা চার কোণাকার হতে পারে। টেবিলের উপরিভাগ ফর্মিকা, কাচ বা কাঠের হয়।
- খাবার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- টেবিলের মাঝখানে সমতল ফুলদানিতে ফুল বা ঝুড়িতে বিভিন্ন ফলের সমারোহ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।
- টেবিল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চেয়ারে বসা বা চলাচলে অসুবিধা না হয়।
- পানির ফিল্টার এককোনায় একটু উঁচুতে রাখতে হবে। ঘরের বড় দেয়াল ঘেঁষে এমনভাবে ফ্রিজ রাখতে হবে যেন ফ্রিজের পেছনে বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকে।

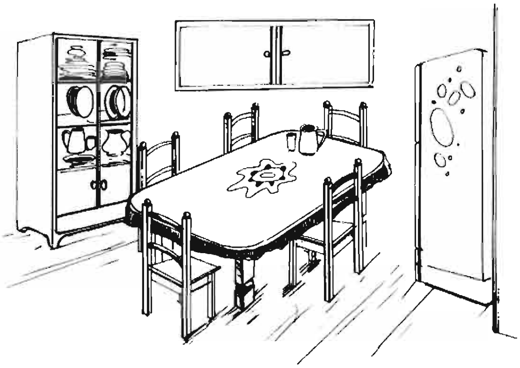

খাবার ঘর

অতিথির ঘর

অতিথির ঘর (Guest Room)

অতিথির ঘর বসার ঘরের পাশে হলে ভালো হয়। এই কক্ষে খুব বেশি আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না। খাট, ড্রেসিং টেবিল, দেয়াল আলমারি হলেই চলে।

লিভিং রুম (Living Room)

বর্তমান আধুনিক বাড়িতে খেলার ঘর ও লিভিং রুম থাকে। এই রুমে পরিবারের সদস্যরা অবসর সময় কাটায়। এই রুমে টেলিভিশন দেখা, বসা ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকে। গিটার, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বিনোদনের জিনিসপত্র থাকে।

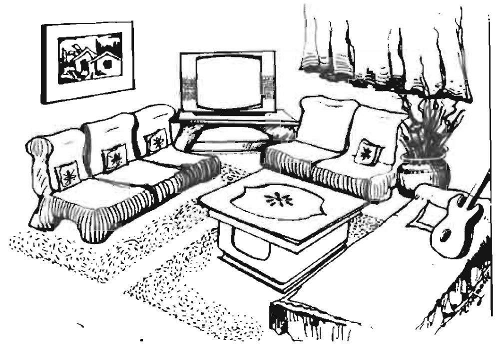

লিভিং রুম

পড়ার ঘর (Reading Room)

পড়ার ঘর

পড়ার ঘর এমন জায়গায় হবে যেখানে কোনো শব্দ বা কথাবার্তা পড়াশোনার ব্যঘাত ঘটাতে না পারে। পড়ার রুমে টেবিল, চেয়ার, বুকসেলফ, কম্পিউটার ইত্যাদি থাকে।

টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

রান্নাঘর (Kitchen)

রান্নাঘর

রান্নাঘর খাবার ঘরের পাশে হয়ে থাকে। এতে খাদ্য পরিবেশন করতে সুবিধা হয়। চুলার স্থান জানালার পাশে হলে সহজেই ধোঁয়া বের হয়ে যায়। চুলা গ্যাস, কেরোসিন বা মাটির হতে পারে। শহর এলাকায় গ্যাস, গ্রামাঞ্চলে লাকড়ি বা কেরোসিনের চুলা দেখা যায়। আবার অনেকেই হিটারেও রান্না করে। রান্নাঘরে পানির কল এক কোনায় রাখলে ভালো হয়। বিভিন্ন জিনিসের কৌটা রাখার জন্য সেলফ ব্যবহার করতে হয়। দা-বঁটি, ছুরি ইত্যাদি ধারালো জিনিস শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

রান্নাঘরের ওয়ালে সিলিং পর্যন্ত ক্যাবিনেট করে নিলে অনেক জিনিস রাখা যায়। তবে পোকামাকড় যাতে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পাঠ ৪ – গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি

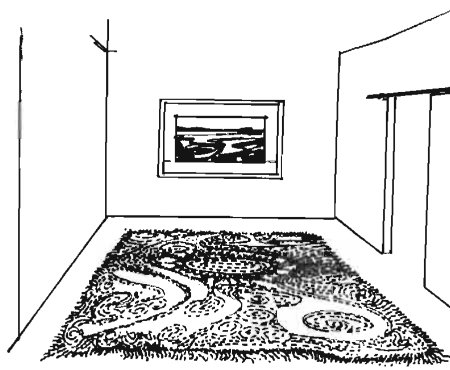

মেঝের আচ্ছাদন

আসবাবপত্র নির্বাচন, বিন্যাসের পরই মানুষ চায় গৃহের মেঝে, দেওয়াল, পর্দা ও পুষ্প বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। সব কিছুর সামঞ্জস্য বিন্যাসই একটি গৃহকে অপরূপ করে তোলে। সুরুচির প্রকাশ ঘটায়।

মেঝের আচ্ছাদন– আমাদের দেশে ঘরের মেঝে সিমেন্টের বা সিমেন্টের সাথে রং মিশিয়ে মেঝে তৈরি করা হয়। গ্রামাঞ্চলে মাটির মেঝে থাকে। তবে আধুনিক বাড়িতে টাইলস বা মোজাইকের মেঝে দেখা যায়। শহরাঞ্চলে মেঝেতে কার্পেট ব্যবহার করা হয়। কার্পেট আসবাবের সাথে মানানসই হতে হবে। আমাদের দেশে ধুলা বেশি তাই ছোট আকারের কার্পেট ব্যবহার ভালো এতে যত্ন নিতে সহজ হয়।

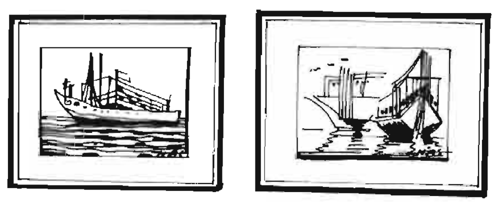

দেয়ালে ছবি বিন্যাস

দেয়াল সজ্জা– প্রতিটি গৃহেরই বিভিন্ন কক্ষে ছবি বা চিত্রকর্ম দেখা যায়। গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় চিত্রকর্মের

২০১৬

ভূমিকা অপরিসীম। খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি গৌরবের প্রতীক। মাতৃভূমির ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে প্রশান্তি আনে।

দেয়ালে ছবি টাঙানোর কিছু নিয়ম আছে। যেমন–

- ছবি টাঙানোর জন্য স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বড় দেয়ালে বড় ছবি বা ছোট ছোট কয়েকটি ছবি একত্রে টাঙানো যায়।
- ছবি দৃষ্টি বরাবর টানাতে হবে। বেশি উপরে বা নিচে ছবি টানালে সৌন্দর্য ফুটে উঠে না এবং দৃষ্টিনন্দন হয় না।
- কক্ষের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছবি টানাতে হবে। বসার কক্ষে খ্যাতনামা ব্যক্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, খ্যাতনামা ব্যক্তির আঁকা ছবি রাখা যায়। খাবার ঘরে খাবারের ছবি, লিভিং রুমে পারিবারিক ছবি টাঙানো যায়। পারিবারিক ছবি শয়ন ঘরে রাখা রুচিসম্মত।
- ছবি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শোপিস, ফুল, লতা-পাতা, ওয়ালমেট, পাটশিল্প, লোকশিল্প উপকরণ দিয়েও দেয়াল সজ্জা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে শিল্পনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

পর্দা– পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। দেয়ালের রং, মেঝের আচ্ছাদন ও অন্যান্য আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করা উচিত।

পর্দার প্রয়োজনীয়তা–

- ঘরের আব্রু রক্ষা করে।
- ঘরে শীতলতার ভাব আনে।
- ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে।
- কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায়।

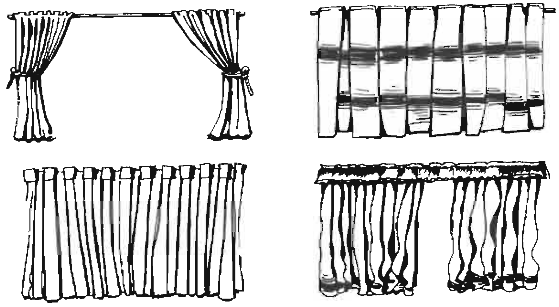

বিভিন্ন ধরনের পর্দা

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তাই হালকা রংয়ের পর্দাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। এতে করে শীতলতার সৃষ্টি হয়। তবে শীতের দিনে গাঢ় রংয়ের পর্দা ব্যবহার করা যায়। পর্দার কাপড়টি এমন হতে হবে যাতে যত্ন নেওয়া সহজ হয়।

পুষ্পবিন্যাস–

পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। এই পাত্রগুলো চীনামাটি, প্লাস্টিক, কাচ, বাঁশ, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হতে পারে। ফুলদানি বা পাত্র গোলাকার, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি বা চারকোনা হতে পারে।

পুস্প বিন্যাস

পুষ্পবিন্যাসের নিয়ম–

- রং– পুষ্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে।
- রেখা– ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার রেখা বা গড়ন। লিলি, রজনীগন্ধা ফুলের লম্বা ডাটা থাকে। আবার গাঁদা, বেলি, গোলাপ এগুলো স্তুপাকারে সাজানোর উপযোগী।
- শিল্পনীতি– পুষ্পবিন্যাসে শিল্পনীতি অনুসরণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন– ফুলদানির সাথে ফুলের সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।
- পুষ্পবিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখতে হয়। অর্থাৎ গাছে যেভাবে ফুল ফুটে থাকে সেভাবে ফুলকে সাজালে ভালো হয়।
- সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটিকে প্রাধান্য দিয়ে পুষ্পবিন্যাস করতে হয়। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ফুল, পাতা সাজাতে হবে।
- ফুলদানির চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি হবে। ফুলদানির আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুষ্পবিন্যাস করতে হয়।
- ফুলদানিতে যথেষ্ট পানি থাকতে হবে।
- পিনহোল্ডার ঢেকে পুষ্পবিন্যাস করতে হবে।
- পুষ্পবিন্যাসের জন্য অনেক ফুলের প্রয়োজন হয় না। দুই একটা ফুলের সাথে ডাল, লতা, পাতা দিয়েও পুষ্প বিন্যাস করা যায়। পিন হোল্ডার ব্যবহার করে বাটি, প্লেটেও পুষ্পবিন্যাস করা যায়।
- খুব ভোরে বা পড়ন্ত বেলায় গাছ থেকে ডালসহ ফুল কাটলে সেটা তাজা থাকে।
- পাত্রের পানির মধ্যে চিনি মেশালে ফুল অনেক বেশি সময় ধরে তাজা থাকে।

পাঠ ৫ – গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

গৃহকে আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করলেই চলবে না গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার কথাও চিন্তা করতে হবে। নিজ গৃহকে সুসজ্জিত করে রাখলে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কেবল দামি, চমৎকার আসবাব দিয়ে ঘর সাজালেই চলবে না, তা পরিষকার–পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ময়লা, ধুলা পড়া আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। যত্নের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, মাকড়সার জাল, পিঁপড়া, পোকার উপদ্রব হয় এবং রোগ–জীবাণু ছড়ায়।

তাই গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন–

- **গৃহে প্রাকৃতিক আলো–বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা :**

আলো, উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগ–জীবাণু ধ্বংস করে। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তাই ঘরের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহ কোষকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যের উপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তবে গৃহে যাতে সূর্য কিরণ এবং বায়ু প্রবেশ সহজেই করতে পারে সেজন্য গৃহের অবস্থান দক্ষিণ অথবা পূর্বমুখী হলে ভালো হয়।

- **গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা :**

  প্রতিদিন গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার করা আবশ্যক। গৃহের মধ্যে চলাফেরার ফলে মেঝে ময়লা হয় আসবাবের উপর ধুলাবালি জমে। এই ধুলা থেকে সর্দি, কাশি হয়। তাই প্রতিদিন ঘরের মেঝে, রান্নাঘর, গোসলখানার মেঝে ও আসবাবপত্র ধোয়া, মোছা করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সপ্তাহে এক দিন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। দরজা, জানালা, রান্নাঘরের দেয়াল, বেসিন, টয়লেটের প্যান/কমোড ইত্যাদি প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করা উচিত।

- **পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, বিভিন্ন আসবাবের কভার পরিষ্কার করা :**

  ঘরের পর্দা, চাদরে ও কভারে ধুলা জন্মায়। প্রতি সপ্তাহে বিছানার ছাদর পরিষ্কার করা উচিত। ৩/৪ মাস পর পর ঘরের পর্দা ও আসবাবের কভার পরিষ্কার করা উচিত। এতে ঘরের ধুলাবালি দূর হয়ে ঘরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

- **রাতে কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা :**

  কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকলে চোখের ক্ষতি হয়। তাই পড়াশোনা, রান্নাঘরের কাজ, খাবার টেবিল ইত্যাদি জায়গায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

- **গৃহের ভিতর ও চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা :**

  ঘরের ময়লা ফেলার জন্য ঘরের ভিতর বিন রাখা প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের চারপাশের পরিবেশ–পরিষ্কার রাখাও আবশ্যক। ঘরের চারপাশে ময়লা, আবর্জনা, খোলা নর্দমা, ঝোপ–ঝাড় থাকলে পোকামাকড় ও মশার উপদ্রব হয়। মারাত্মক রোগ ছড়ায়। তাই ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থান বা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। গৃহের চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে পোকামাকড় ধ্বংস করার ঔষধ স্প্রে করতে হবে। টবে বা চারপাশে পানি জমে যেন মশার উপদ্রব না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পাঠ ৬ – অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার

মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। তাই গৃহের আরাম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্রের পাশাপাশি গৃহসজ্জায় নানা উপকরণ ব্যবহার করা যায়। তবে গৃহসজ্জায় শুধু যে বাজার থেকে মূল্যবান জিনিসই ব্যবহার করতে হয় তা নয়। বরং নিজস্ব সৃজনশীলতার মাধ্যমে গৃহের অব্যবহৃত জিনিস দিয়েও নানা ধরনের শিল্প সামগ্রী বানিয়ে ব্যবহার করা যায়। শিল্প সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই শিল্প সৃষ্টি করতে যেয়ে সব সময় দামি জিনিসের প্রয়োজন হয় না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় বা ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েও শিল্প সৃষ্টি করে নিজের সৃজনশীলতা তুলে ধরা যায়।

গৃহে বিভিন্ন অব্যবহৃত জিনিসের নাম :

পানি বা কোল্ডড্রিঙ্কস এর বোতল, ক্যান, টিসুবক্স, পুরোনো ক্যালেন্ডার, পুরনো কাপড়, ডিমের খোসা, বিস্কুট, চকলেট বা চিপসের শক্ত কাগজের বক্স, কালি শেষ হয়ে যাওয়া বলপেন, ছোট হয়ে যাওয়া পেনসিল ইত্যাদি।

এখন আমরা অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব :

ডিমের খোসা–

প্রতিদিন আমাদের খাদ্য তালিকায় ডিম থাকে। ডিমের খোসা আমরা ফেলে দিই। কিন্তু এই ফেলে দেওয়া খোসা দিয়েও আমরা শিল্প সৃষ্টি করতে পারি। যেমন :

ডিমটিকে একদিকে ছোট করে ছিদ্র করে ভেতরের অংশ বের করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর রোদে ভেতরটা শুকাতে হবে। তারপর ডিমের খোসার গায়ে রং দিয়ে চমৎকার বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে গৃহসজ্জায় ব্যবহার করা যায়।

আবার ডিমের খোসা ছোট ছোট টুকরা করে টুকরাগুলোকে আর্ট পেপারের উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে শুকিয়ে গেলে তার উপর রং দিয়ে এঁকে বিভিন্ন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়।

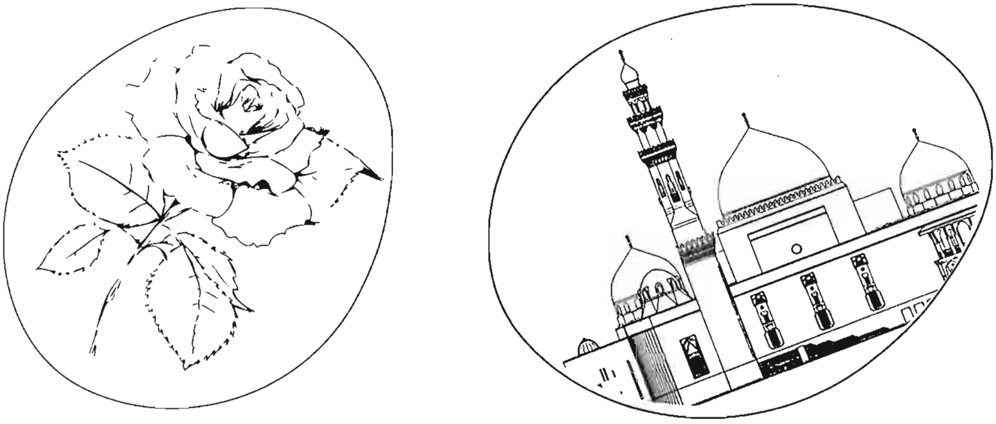

ডিমের খোসা ব্যবহার করে তৈরি করা গৃহসজ্জা সামগ্রী

ওয়াল পকেটের নমুনা

চটের তৈরি ওয়াল পকেট

ব্যবহৃত উপকরণ– চট, বর্ডারের জন্য রঙিন কাপড়, সেলাই করার জন্য সুঁই–সুতা। চট দিয়ে ওয়াল পকেট বানিয়ে হুকে ঝুলানোর ব্যবস্থা করে একদিকে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে রাখারও ব্যবস্থা করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সবার সাথে সবার মিত্রতার নাম –

ক) সমানুপাত খ) ছন্দ

গ) সামঞ্জস্য ঘ) প্রাধান্য

২। গৃহের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা দরকার কেন?

ক) আলো–বাতাসের জন্য খ) পোকামাকড়ের জন্য

গ) ঝোপ–ঝাড় পরিষ্কারের জন্য ঘ) সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শেফালী ঘর গোছাতে গিয়ে ঘরে পড়ে থাকা অনেক অব্যবহৃত জিনিস ফেলে দেয়। মা তাকে এই অব্যবহৃত জিনিসগুলো নানাভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

৩। শেফালী ঘরে পড়ে থাকা জিনিসপত্রে কীভাবে নতুনত্ব আনতে পারে?

ক) অব্যবহৃত জিনিসপত্র জমিয়ে বাজারে বিক্রি করে নতুন জিনিস কেনা

খ) নিজে ব্যবহার না করে জিনিসের বিনিময়ে বন্ধুকে দিয়ে দেওয়া

গ) ব্যবহার না করা জিনিসে চিত্রকর্ম করে তার রূপ পাল্টিয়ে ফেলা

ঘ) ব্যবহার না করা জিনিসগুলো দিয়ে আবার ঘর সাজিয়ে ফেলা।

৪। ফেলে দেওয়া জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে শেফালীর –

i. ঘরের পুরনো ও নতুন জিনিসের সামঞ্জস্য হবে।

ii. নতুন শিল্প সৃষ্টি করার সুযোগ হবে

iii সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কালাম সাহেবের নতুন আসবাব কেনার শখ। তিনি পুরনো আসবাব ব্যবহার করতে চান না। অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করে তিনি নানা রকম আসবাব ক্রয় করেন। আসবাবপত্র ঘরে সাজাতে গিয়ে তিনি নানা ধরনের অসুবিধায় পড়েন। এতে পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

ক. আসবাবপত্র বিন্যাসের উপর গৃহসজ্জার কী নির্ভর করে?

খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন?

গ. আসবাব নির্বাচনে কালাম সাহেবের কোন বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কালাম সাহেবের আসবাব ক্রয় করাটি কি যুক্তিযুক্ত ছিল? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। জরিফা বেগম সারা দিন কাজের পর গৃহে ফিরে আসেন। তিনি তার শোয়ার ঘরে ঢুকে সব সময় ক্লান্ত বোধ করেন। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ইত্যাদি সবকিছুর অবস্থান এমনভাবে রয়েছে যে, ঘরটি কোনোভাবেই তাকে আকর্ষণ করে না। তার বোন বেড়াতে এসে বসার ঘরে ঢোকে এবং কিছু সময় পর শোবার ঘরে এসে তাকে আসবাব বিন্যাসের শিল্পনীতি সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ কী?

খ. আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. মিসেস জরিফা তার শয়নকক্ষের আসবাব কীভাবে বিন্যাস করতে পারেন– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সঠিক শিল্পনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জরিফা বেগমের বাসস্থান আকর্ষণীয় হতে পারে– বিশ্লেষণ কর।

খ বিভাগ

শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক

এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা–

- শিশুর বর্ধন ও বিকাশের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- বিকাশের স্তর বা ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পারব ;
- বিভিন্ন স্তরের বিকাশমূলক কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- শিশুর বিকাশে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব ;
- বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক বিপর্যয়ের ধারণা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- শিশু পরিচালনার নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- কিশোর বয়সের বিভিন্ন মনোসামাজিক সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- প্রতিবন্ধিতার কারণ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

পাঠ ১ – বর্ধন ও বিকাশের ধারণা

রামিনের বয়স দুই বছর। সে তার খেলনা গাড়ি নিয়ে খেলে। কিন্তু কয়েক মাস আগে সে যেভাবে খেলত, এখন তার খেলা আরও বেশি বাস্তবধর্মী। সে এখন গাড়ি চালানোর সময় শব্দ করে বু বু ... ...। গাড়িটি যখন ধাক্কা খায় কিংবা পড়ে যায় তখন সে অন্য রকম শব্দ করে। অর্থাৎ গাড়ি সম্পর্কে সে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে খেলছে। পূর্বে রামিন বা–বা, দা–দা এভাবে শুধুমাত্র আওয়াজ করত, এখন সে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে, শুধু তা–ই নয়, রামিন এখন হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে, কোনো কিছু বেয়ে উঠতে পারে যা কয়েক মাস আগেও তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। রামিনের মতো বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি শিশু ধীরে ধীরে কিছু ক্ষমতা অর্জন করে, যা তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এসবই শিশুর বিকাশ। বিকাশ হলো গুণগত পরিবর্তন, যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ কখনো থেমে থাকে না।

আমরা বিকাশ (Development) কথাটির পাশাপাশি বর্ধন (Growth) কথাটি ব্যবহার করি। বর্ধন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন। যখন দেহের কোনো একটি অংশের বা সমগ্র দেহের বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে আকার আকৃতির পরিবর্তন হয় সেটাই বর্ধন। শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজনের বৃদ্ধি এর সহজ উদাহরণ। বর্ধন ও বিকাশ–এর অর্থ এক নয়। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার ওজন থাকে প্রায় ৩ কেজি। ছয় মাসে তার ওজন দ্বিগুণ হয়, এক বছরে হয় তিনগুণ। শিশুর ওজন বৃদ্ধি হলো পরিমাণগত পরিবর্তন বা বর্ধন। নবজাতকের ওজন বাড়ার সাথে সাথে অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কিছু ক্ষমতা অর্জন করে। জন্মের পর প্রথমে শিশু নিজের হাত–পা নিয়ে খেলে, পাঁচ বছরে সেই হাত দিয়ে সে ছবি আঁকে, দশ বছরে দক্ষতার সাথে হাত দিয়ে ক্রিকেট খেলার বল ছুড়তে পারে। শিশুর হাত শুধু দৈর্ঘ্যেই বাড়ে নি, তার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনই হলো বিকাশ। বর্ধনের তুলনায় বিকাশ অনেক ব্যাপক। বর্ধন হচ্ছে বিকাশের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিপক্বতা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকাশজনিত পরিবর্তন হতে থাকে। বিকাশে বৃদ্ধি ও ক্ষয় – এ দু'টোই ক্রিয়াশীল থাকে। জীবনের শুরুতে ক্ষয়ের চেয়ে বৃদ্ধি এবং জীবনের শেষ দিকে বৃদ্ধির চেয়ে ক্ষয় বেশি হতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক, মানসিক দক্ষতার ক্ষয় হলেও চুল ও নখের বৃদ্ধি হতেই থাকে।

বর্ধন ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য :

- বর্ধন বলতে দৈহিক আকার–আয়তনের পরিবর্তনকে বোঝায়। বিকাশ বলতে বোঝায়– দৈহিক আকার–আয়তনসহ পরিবর্তন এবং আচরণ, দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার পরিবর্তন।
- বর্ধন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন। অপর দিকে বিকাশ হলো গুণগত পরিবর্তন। তবে পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত। পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে যে কার্যকারিতা পাওয়া যায় তাই বিকাশ।

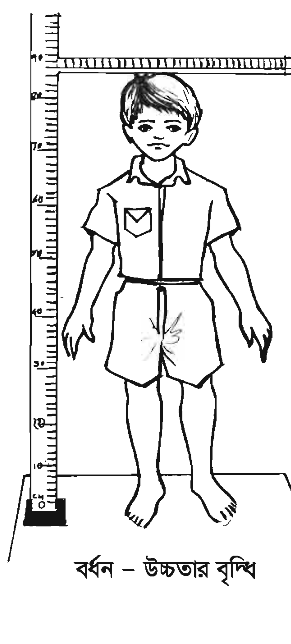

বর্ধন – উচ্চতার বৃদ্ধি

- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানবজীবন বর্ধনশীল। সাধারণত ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে। অপরদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ চলমান। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। বিকাশের গতি জীবনের শুরুতে ঊর্ধ্বমুখী, মধ্য বয়সে মন্থর এবং বৃদ্ধ বয়সে নিম্নমুখী। যেমন– কৈশোরে বোঝার ক্ষমতা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে।

কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি কমতে থাকে। শোনা, দেখা ও বোঝার ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং ক্ষয় দুটোই বিকাশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

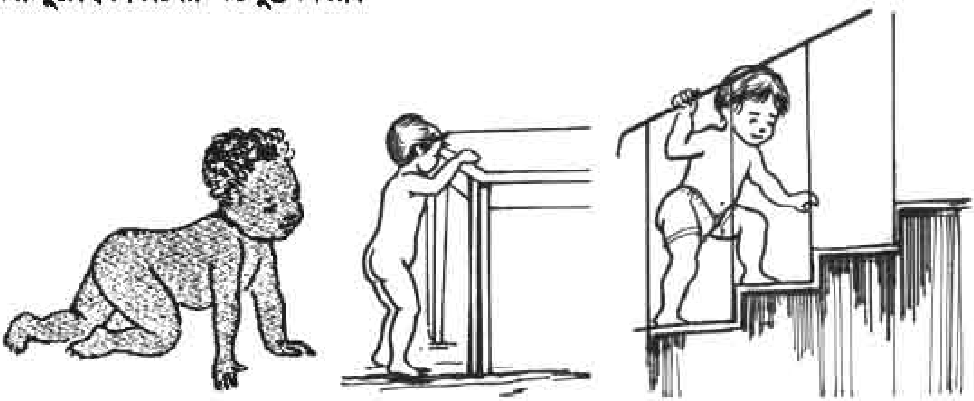

বিকাশ – বয়স বাড়ার সাথে সাথে একা হাঁটতে পারা

বিকাশের ক্ষেত্রগুলো হলো –

শারীরিক বিকাশ– বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন, ওজনের বৃদ্ধি, উচ্চতার বৃদ্ধি, বুক কাঁধ চওড়া হওয়া ইত্যাদি।

বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ– কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, বুঝতে চেষ্টা করা, মনে রাখা, যুক্তি দিয়ে চিন্তাকরা, সৃজনী শক্তি, সমস্যার সমাধান করতে পারা ইত্যাদি।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ– জন্মের পর হাত–পা নাড়াতে পারা, বসতে পারা, হাঁটতে, দৌড়াতে, ধরতে পারা, লাথি মারা, ভারসাম্য রাখতে পারা ইত্যাদি।

ভাষার বিকাশ– একটি দুইটি শব্দ বলা, ছোট ছোট বাক্য বলতে পারা। প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, গুছিয়ে কথা বলতে পারা ইত্যাদি।

আবেগীয় বিকাশ– খুশি হলে হাসা, ব্যথা পেলে কাঁদা, বিকট শব্দে ভয় পাওয়া, কিছু চেয়ে না পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি শিশুর আবেগের প্রকাশ। এভাবে ভালো লাগা, খারাপ লাগা, আবেগ সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন এ সব গুলোই আবেগীয় বিকাশ।

আবেগীয় বিকাশ– খুশি হলে হাসা

সামাজিক বিকাশ– জন্মের পর থেকে বয়স অনুযায়ী মা–বাবা, ভাইবোনসহ অন্যদের সাথে মিলতে পারার ক্ষমতা এবং ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজের রীতিনীতি নিয়ম অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলতে পারার ক্ষমতার বিকাশ। যেমন– অন্যকে সাহায্য করা, দয়া প্রদর্শন, সৌজন্যবোধ, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

নৈতিক বিকাশ– সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায় বোধ গড়ে উঠা, অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করা, ন্যায় কাজের জন্য তৃপ্তি পাওয়াই নৈতিক বিকাশ। মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, অন্যের ক্ষতি করা ইত্যাদি নৈতিকতাবিরোধী কাজ।

শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিশু যখন বসতে শেখে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শেখে, হাঁটতে শেখে, তখন সে তার চারপাশের জগতের সাথে পরিচিত হয়। এতে তার বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে। আবার শিশুটি যখন নতুন কিছু শেখে তখন বড় সদস্যরা তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে, আনন্দ দেয়। এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে শিশুর সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ঘটে। সুতরাং বলা যায় সকল প্রকার বিকাশের সমন্বয়ে মানব শিশুর পূর্ণবিকাশ ঘটে।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ– বসতে পারা, হাঁটতে পারা

সামাজিক বিকাশ– বন্ধুত্ব

কাজ – বর্ধন ও বিকাশের পার্থক্য চার্ট করে দেখাও।

পাঠ ২ – বিকাশের স্তর

আমরা সবাই জানি, জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ বা নয় মাস গর্ভে থাকার পর শিশুর জন্ম হয়। জন্মের পর শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্ত বয়স পার হয়ে একজন ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়। মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে একই রকম বৈশিষ্ট্য থাকে না। একটি দুই বছরের শিশু এবং একটি দশ বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্যের অনেক পার্থক্য থাকে। আবার কৈশোর ও প্রাপ্ত বয়সের বিকাশ কখনোই একরকম নয়। জীবন প্রসারের সম্পূর্ণ সময়কে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলোই বিকাশের স্তর নামে পরিচিত। এই স্তরগুলো হলো –

জন্মপূর্ব কাল (Prenatal Period) - জীবনের সূচনা থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়কাল। সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তনের সময়কাল হলো মাতৃগর্ভের এই সময়কাল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি এককোষী জীব একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়। জন্মগ্রহণের পর মাতৃগর্ভের বাইরের পরিবেশের সাথে খাপখাওয়ানোর জন্য ভ্রূণ শিশুর মধ্যে বিশাল পরিবর্তন ঘটে।

২০১৬

নবজাতকাল (Neonatal Period) - জন্ম মুহূর্ত থেকে দুই সপ্তাহ সময়কাল নবজাতকাল। এ সময়ে নবজাতককে নতুন পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য গ্রহণ ও শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশনে তার গ্রন্থি সক্রিয় হয়। মাতৃগর্ভের গরম পরিবেশ (১০০° ফারেনহাইট) থেকে কম তাপমাত্রার পরিবেশের সাথে তাকে সঙ্গতি বিধান করতে হয়। সুস্থ নবজাতক জন্মের সময় চিৎকার করে কাঁদে। তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২০ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটায়। তার যেকোনো অসুবিধা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো কান্না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নবজাতকের স্বাভাবিক ওজন আড়াই কেজি থেকে তিন কেজি।

অতি শৈশব ও টডলারহুড (Babyhood & Toddlerhood) - দুই সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত সময়কাল। কিছুদিন পূর্বেও যে শিশুটি বড় অসহায় ছিল সে এখন-বসতে পারে, হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে। এই বয়সের মধ্যে তার অন্যের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। ১ম বৎসর অতি শিশু, ২য় বৎসর হলো টডলার। শিশুর দুই বছর বয়সের মধ্যে আত্মনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, যা তাদের স্বাধীনভাবে চলতে সহায়তা করে।

প্রারম্ভিক শৈশব (Early childhood) - ২ থেকে ৬ বছর। এ সময়ে শিশু লম্বা ও ক্ষীণকায় হয়। হাঁটা, দৌড়ানো, আরোহণ করা, ধরা ইত্যাদিতে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করে। তারা অনেক বেশি নিজের কাজগুলো করতে পারে। যেমন- নিজে খাওয়া, নিজে নিজে পোশাক পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ইত্যাদি। তারা পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে খেলে। তারা সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে। এ বয়সে তারা কৌতূহলী হয় ও অনেক প্রশ্ন করে।

মধ্য শৈশব (Middle Childhood) - ৬ থেকে ১১ বছর। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে এবং নতুন নতুন দায়িত্ব পালনে দক্ষ হয়। খেলাধুলায় দক্ষ হয়, নিয়ম সমৃদ্ধ খেলায় (যেমন-গোল্লাছুট, বৌচি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) অংশ নেয়। তারা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, ভাষার দক্ষতা অর্জন করে এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। তারা বন্ধুত্ব তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরকাল (Adolescence) - ১১ থেকে ১৮ বছর – এই সময়টি শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়সে যাওয়ার সময়কাল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর বয়স এই সময়টা হলো কৈশোর কাল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রাপ্ত বয়স্কের মতো দেহের আকার আকৃতি ও যৌন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়। যৌন ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। বিমূর্ত বিষয় চিন্তা করতে পারে অর্থাৎ যে বিষয় চোখে দেখা যায় না যেমন- সততা, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে। কে কোন পেশায় যাবে সে অনুযায়ী পড়াশোনা করে।

২০১৯

তার মধ্যে নিজস্ব লক্ষ্য, মূল্যবোধ– তৈরি হয়। তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে আরম্ভ করে। এ বয়সে নিজ চেহারার প্রতি তাদের মনোযোগ বাড়ে।

প্রারম্ভিক বয়ঃপ্রাপ্তিকাল (Early Adulthood) – ১৮ থেকে ২৫ বছর। পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের প্রস্তুতি– এ সময়ের অন্যতম কাজ। এ বয়সে বিয়ে ও পরিবার গঠনের আগ্রহ তৈরি হয়। অনেকে পেশা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি উত্তরণের পর বাস্তবমুখী পেশা নির্বাচনের পথ স্থির হয়। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের চেয়ে এই বয়সে দর্শকের ভূমিকা পালনে তারা আগ্রহী হয়। তারা সরকার, রাজনীতি, বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে বন্ধুদের সাথে চিন্তার আদান–প্রদান করে।

বয়ঃপ্রাপ্তির শেষভাগ (Late Adulthood) – ২৫ থেকে ৪০ বছর। বয়ঃপ্রাপ্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মা–বাবা হিসেবে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ। এ সময়ে বিয়ের পর দুইটি ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা দুজনের মধ্যে খাপ খাওয়ানো শিখতে হয়। সন্তান লালন–পালন একটি নতুন কাজ, যা তাদের অবশ্যই পালন করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর সুন্দর সমঝোতায় গৃহ পরিচালনায় সফলতা আসে। চাকরি, বিয়ে, সন্তান সবকিছু নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তারা এসবের বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার অবকাশ পায় না।

মধ্যবয়স (Middle Age) – ৪০ থেকে ৬৫ বছর। কাজ থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই বয়সের ব্যাপ্তি। এটা প্রাপ্ত বয়স থেকে বার্ধক্যে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়। কর্মক্ষেত্রে সফলতা বা নেতৃত্বদান এ বয়সেই হয়ে থাকে। মধ্য বয়সে প্রধান শারীরিক লক্ষণগুলো হলো–ওজন বৃদ্ধি, চুল পাকা, কুঁচকানো ত্বক, হাত পায়ের জোড়ায় ব্যথা, দৃষ্টি শক্তির সমস্যা ইত্যাদি।

বার্ধক্য (Old Age) – ৬৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি মানব বিকাশের সর্বশেষ স্তর। বার্ধক্য ক্ষয়ের সূচনা করে। এই সময়ে শারীরিক, মানসিক অবস্থার ধারাবাহিক অবনতি দেখা যায়। তাঁদের কাজ করার শক্তি হ্রাস পায়। বৃদ্ধরা তাঁদের নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা খুব কম গঠনমূলক কাজ করতে পারে। তাদের ধর্মীয় আগ্রহ বাড়ে। যদি বার্ধক্যে হতাশা, জীবন সম্পর্কে বিরক্তি, মৃত্যু ভয় মোকাবিলা করা যায় তবে এ সময়টিতে পরিতৃপ্তির অনুভূতি আসে।

পাঠ ৩ – বিকাশমূলক কার্যক্রম

আমরা জানি, বিকাশ ধারাবাহিকভাবে চলে। এটা কখনো থেমে থাকে না। জীবনের প্রতিটি স্তরে বিকাশ সম্পর্কে সমাজের নির্দিষ্ট প্রত্যাশা থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে সমাজের প্রত্যাশা এমন থাকে যে সে উপার্জন করবে, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়সেও পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে সে সঠিকভাবে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যক্রম পালন করতে পারছে না ধরে নেওয়া হয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে যে নির্দিষ্ট কাজ সামনে আসে তা সফলভাবে করতে পারলে জীবন হয় সুখের এবং পরবর্তী স্তরের কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। অপর দিকে এ কাজের ব্যর্থতা জীবনে আনে অশান্তি এবং পরবর্তী স্তরের সফলতায় বাধা সৃষ্টি করে। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজকেই বিকাশমূলক কার্যক্রম বলা হয়। অর্থাৎ বিকাশমূলক কার্যক্রম হলো–

- জীবনের নির্দিষ্ট স্তরে করণীয় কিছু কাজ যা সমাজ প্রত্যাশা করে।
- এ কাজের সফলতা পরবর্তী স্তরে সফল উত্তরণে সহায়তা করে, জীবনকে করে সুখী।
- এ কাজের ব্যর্থতা পরবর্তী স্তরের উত্তরণে আনে বাধা, জীবনে আনে অশান্তি ।

বিকাশমূলক কাজগুলো হলো–

- বিকাশমূলক কাজের মধ্যে থাকে শারীরিক পরিপক্বতা অনুযায়ী কাজ যেমন– হাঁটতে শেখা, কথা বলতে শেখা, খেলাধুলায় দক্ষতা ইত্যাদি।

বিকাশমূলক কাজ

- সমাজ সংস্কৃতি অনুযায়ী কাজ যেমন– লেখাপড়া করা, সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।
- নিজের আগ্রহ, মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ যেমন– পেশা নির্বাচনে নিজস্ব প্রত্যাশা, নিজের আগ্রহ, মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটি অংশ।

বিকাশমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকলে যে সুবিধাগুলো হয় তা হলো–

- বিকাশমূলক কার্যক্রম জানলে বয়স অনুযায়ী সঠিক আচরণ করা সহজ হয়।
- বাবা–মা বা শিশুর পরিচালনাকারী বয়সানুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ জানতে পারেন এবং সেভাবে শিশুর সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।
- বিকাশমূলক কার্যক্রম সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করতে পূর্বপ্রস্তুতি ও প্রেরণা দেয়। এতে বিকাশের প্রতি স্তরে খাপ খাওয়ানো সহজ হয়।

অতি শৈশব ও প্রারম্ভিক শৈশবের কয়েকটি বিকাশমূলক কাজ–

- হাঁটতে শেখা–১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে শিশু হাঁটতে পারার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে।
- শক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে শেখা– দুই বছর বয়সের মধ্যে শিশু শক্ত খাদ্য চোষা ও চিবানোর ক্ষমতা অর্জন করে।
- কথা বলতে শেখা– শিশু ৬ মাসের মধ্যে অর্থহীন শব্দ করে। ৩ বছরে দুই বা তিন শব্দের বাক্য বলে। ৫ বছরের মধ্যে বহু শব্দের ব্যবহারে পূর্ণ বাক্য বলে।
- মলমূত্র ত্যাগের নিয়ন্ত্রণ শেখা– দুই বছরের মধ্যে মল–মূত্র ত্যাগের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হয়। এর নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হয়।
- শরীরবৃত্তীয় দক্ষতা অর্জন– পাঁচ বছরের মধ্যে দেহের তাপ, বিপাক ক্রিয়ায় ভারসাম্য এবং শারীরিক গঠনে দৃঢ়তা আসে যার কারণে অল্পতেই অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।
- সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে শেখা– শৈশবের প্রথম দিকে বাবা–মা যে কাজকে পুরস্কৃত করেন বা ভালো বলেন– সেটাই ভালো কাজ এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন সেটা খারাপ কাজ, এভাবে ভালো মন্দের ধারণা তৈরি হয়।

মধ্য শৈশবের কয়েকটি বিকাশমূলক কাজ–

- সমবয়সীদের সাথে সঠিক আচরণ করতে শেখা– এই বয়সকে দলীয় বয়স বলা হয়। সমবয়সী দলে মিশে তারা সামাজিক আদান–প্রদান, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি শেখে।
- সাধারণ খেলাধুলার প্রয়োজনীয় শারীরিক দক্ষতা শেখা– সঠিকভাবে কোনো কিছু ছোড়া, ধরতে পারা, বল সঠিকভাবে লাথি মারা ইত্যাদি কৌশলগুলো শেখার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে।
- ছেলে ও মেয়ে অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা শেখা– ছেলে বাবার ভূমিকা এবং মেয়ে মায়ের ভূমিকা অনুকরণ থেকেই লিঙ্গ অনুযায়ী ভূমিকা শেখে।
- পড়ালেখা ও গণনার মূল কৌশল আয়ত্ত করা– ৬ বছরের পরে স্নায়ু, আঙ্গুলের পেশি, বাহু লেখার উপযোগী হয়। দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণার বিকাশ– স্কুলে যাওয়ার পর থেকে শিশু বহু বিষয় সম্পর্কে ধারণা পায়। যেমন– সময় (ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড –এর ধারণা), দুরত্ব (বাড়ি থেকে স্কুল, ঢাকা থেকে চিটাগং এর দুরত্ব), ওজন (তুলা হালকা, লোহা ভারী) ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে। এই ধারণাগুলো থেকেই তাদের চিন্তা করার সূত্রপাত ঘটে।

বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরের বিকাশমূলক কাজ–

- উভয় লিঙ্গের সমবয়সীদের সাথে পরিণত আচরণ করতে পারা।
- বাবা–মা ও অন্যের উপর থেকে আবেগীয় নির্ভরশীলতা কমানো– শৈশবের নির্ভরশীলতা বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই কমতে থাকে। তারা আত্মনির্ভরশীল হয়। অনেক সময় বাবা–মায়ের স্নেহ –ভালোবাসাকে তারা বাড়াবাড়ি মনে করে। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদা থাকে।
- বৃত্তি নির্বাচন ও পেশার জন্য প্রস্তুতি– শৈশবে পেশা সম্পর্কিত পরিকল্পনা থাকে অস্পষ্ট অবাস্তব। কৈশোরে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার আলোকে পেশার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় বলে তা হয় বাস্তবধর্মী।

- সামাজিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ গ্রহণের আগ্রহ– নিজ আচরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আগ্রহ এ সময়ের অন্যতম প্রধান বিকাশমূলক কাজ। তারা সমাজের ভালোর জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে উৎসাহী হয়।
- নৈতিকতা অর্জন– এ সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায়ের নিজস্ব ধারণা তৈরি হয়। এর আগে তাদের মধ্যে মা–বাবার শাস্তি ও পুরস্কারের উপর ভিত্তি করে ভুল ও সঠিক বিষয়টি নির্ভর করত।

কাজ – মধ্য শৈশব ও কৈশোরের বিকাশমূলক কাজ কোন গুলো– পৃথকভাবে তালিকা কর।

পাঠ ৪ ও ৫ – শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যে মানুষগুলোকে আমরা দেখি তারা সবাই এক রকম নয় কেন? জন্ম অবস্থায় শিশুর মধ্যে কি এমন প্রবণতা থাকে যার কারণে তার দেহের আকৃতি, গঠন, চেহারাসহ আচরণ, গুণাবলি অন্যদের থেকে আলাদা হয়? নাকি সে যে পরিবেশে জীবনযাপন করে তার প্রভাবেই তার সারা জীবনের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়! এসব প্রশ্ন নিয়ে মনোবিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণার মাধ্যমে তারা শিশুর বিকাশে বংশগতি কীভাবে কাজ করে, বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা কী – এসব বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। আমরা এখন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব।

বংশগতি–

মেয়েটির গায়ের রং একেবারে তার দাদির মতো। ছেলেটি বাবার মতো সাহসী কিংবা মেয়েটি মায়ের মতোই গানের গলা পেয়েছে। এরকম উক্তি আমরা সব সময়ই শুনে থাকি। শিশু জন্মসূত্রে তার বাবা–মা কিংবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে সেটাই বংশগতি। বংশগতি দিয়ে শিশু তার জীবন শুরু করে। বংশগতির কারণে মানুষের সন্তান মানুষের মতো দেখতে হয়, অন্য কোনো প্রাণীর মতো হয় না। আবার উচ্চতা, দেহের গঠন, চুল, চোখ, চামড়ার রং ইত্যাদি দৈহিক গুণাবলি এবং বিভিন্ন মানসিক গুণাবলি বংশগতির কারণে একেক জনের একেক রকম হয়। বংশগতির প্রভাব জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে সারা জীবনব্যাপী চলতে থাকে।

বংশগতির সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। বাবার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে ভ্রুণ বা জীবকোষ (Zygote) তৈরি হয়। জীবকোষের প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে– কোষ প্রাচীর, প্রোটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস হলো জীবকোষের প্রাণকেন্দ্র। প্রতিটি মানব জীবকোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে অন্যটি পিতৃকোষ থেকে। মা ও বাবার কাছ থেকে পাওয়া ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ২২টি জোড়াই ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে একই রকম থাকে। এই ক্রোমোজোমগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শিশুর মধ্যে বহন করে। বাকি একজোড়া ক্রোমজোম ছেলে ও মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে থাকে ভিন্ন রকমের যা নির্ধারণ করে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে। এই ২৩ তম জোড়াটিই লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম।

মায়ের ডিম্বকোষ থেকে ভ্রুণে যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আসে তা সবসময়ই X টাইপ ক্রোমোজোম হয়। বাবার শুক্রাণু থেকে যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আসে তা কখনো X, কখনো Y টাইপ হয়ে থাকে। যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সাথে বাবার X ক্রোমোজোমের মিলন ঘটে তাহলে মেয়ে শিশু জন্ম নেয়। আর যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সাথে বাবার Y ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধে তবে ছেলে শিশু জন্ম নেয়। আমরা দেখি দুটি শিশু কখনোই এক রকম হয় না। আমাদের আপন ভাইবোনের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। কেন এমন হয়?

২০১৬

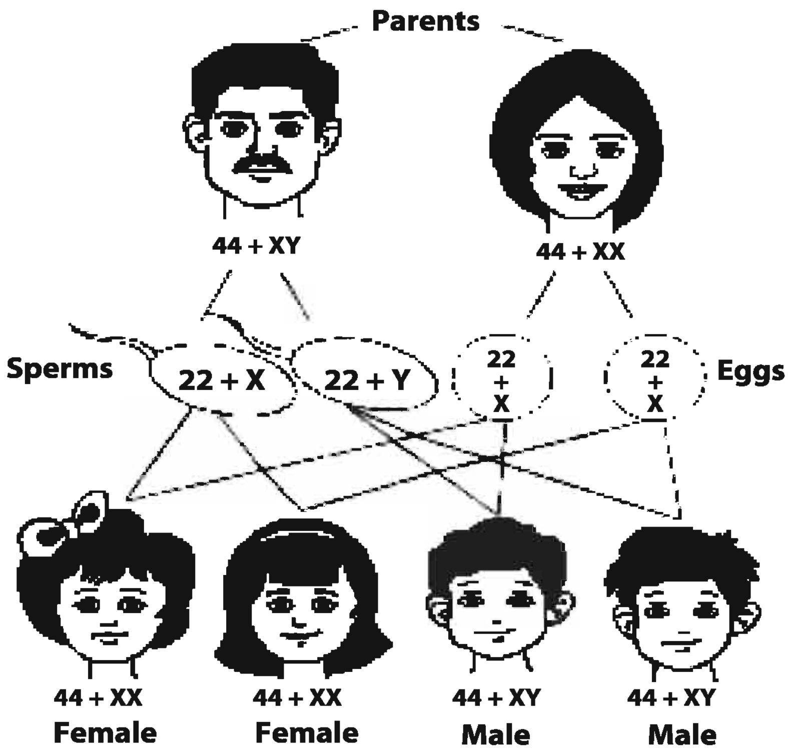

লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া

ক্রোমোজোমের এক এক জোড়া জিন মানুষের এক একটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যার ফলে কেউ বেশি বুদ্ধিমান, কেউ বা কম, কেউ বেঁটে, কেউ বা লম্বা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, মায়ের ক্রোমোজোম থেকে আসা কোন জিনটি বাবার ক্রোমোজোম থেকে আসা কোন জিনটির সাথে জোড়া বাঁধবে, তার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এ কারণে একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন হচ্ছে– তাহলে অনেক সময় যমজ সন্তানের চেহারা ও আচরণ একই রকম হয় কীভাবে? একমাত্র সমকোষী যমজ শিশুর ক্ষেত্রে এ রকম হতে পারে।

যমজ শিশু দুই ধরনের হয়। সমকোষী যমজ (Identical Twin) ও ভিন্নকোষী যমজ (Fraternal Twin)। যখন একটি জীবকোষ বা জাইগোট ভেঙ্গে দুটি ভ্রূণে পরিণত হয়; তখন তারা একই লিঙ্গের হয় এবং একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এরাই সমকোষী যমজ।

ভিন্নকোষী যমজদের ক্ষেত্রে একাধিক ডিম্বাণু একাধিক শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় মায়ের একাধিক ডিম্বাণু পরিপক্ব থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক শুক্রাণু একাধিক ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে। এ ধরনের যমজ দুজনেই ছেলে বা দুজনেই মেয়ে বা একটি ছেলে, একটি মেয়ে হতে পারে। দুই এর বেশি জাইগোট তৈরি হলে সন্তান সংখ্যাও দুই–এর অধিক হয়। ভিন্নকোষী যমজদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে না। এদের বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাইবোনদের মতো হয়ে থাকে। শুধু পার্থক্য এটুকুই থাকে যে সাধারণ ভাইবোনেরা এক বছর বা তারও বেশি সময়ের ব্যবধানে জন্ম নেয়। ভিন্নকোষী যমজ একই দিনে জন্ম গ্রহণ করে।

শিশুর বিকাশে পরিবেশ–

শিশুর বিকাশে জন্মপূর্ব পরিবেশ ও জন্ম পরবর্তী পরিবেশ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃগর্ভে শিশু যে ৪০ সপ্তাহকাল অবস্থান করে সেটিই জন্মপূর্ব পরিবেশ। ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক গঠন ও বিকাশ নির্ভর করে। যেমন–গর্ভবতী মায়ের পুষ্টিহীনতায় ভ্রূণশিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। আবার মায়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে হলে সন্তান ধারণে মা ও শিশু উভয়ের জীবনে ঝুঁকি থাকে।

জন্ম পরবর্তী পরিবেশ শিশু জন্মের পর হতে শুরু হয়। জন্ম পরবর্তী পরিবেশ দুই ধরনের হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। ভূ–প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, আলো–বাতাস, গাছ–পালা, নদ–নদী, পাহাড়–পর্বত, পশু–পাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ। সমতল ভূমির একটি ছেলের চেয়ে পাহাড়ি এলাকার একটি ছেলের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সমতলের তুলনায় পাহাড়ি অঞ্চলে জীবন ধারণ করা অনেক কষ্টসাধ্য বলে ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা হয় কর্মঠ ও পরিশ্রমী।

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আছে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলার সাথি, প্রতিবেশী, আত্মীয়–স্বজন, দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি। শিশুর জীবনে মা–বাবা, ভাই–বোন, পরিবারের সদস্যদের স্নেহ–মমতা, সঠিক পরিচালনা পদ্ধতি তার সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে। অপর দিকে মা–বাবার অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন ইত্যাদি শিশুর বিকাশে অন্তরায় হয়। ছেলে–মেয়েরা জীবনের দীর্ঘসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যয় করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম–শৃঙ্খলা, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি তথা শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ শিশু বিকাশে প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও সহপাঠী, খেলার সাথি, প্রতিবেশী, আত্মীয়–স্বজন সবার সহায়তায় শিশুর বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

শিশুর বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ কোনটির প্রভাব বেশি? এ বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। কারও মতে, শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণরূপে বংশগতির উপর নির্ভরশীল। আবার কারও মতে– শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই মূখ্য। বংশগতিকে যাঁরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁদের মতে শিশু যে পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন একমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি তার বিকাশকে প্রভাবিত করে। যেমন– বুদ্ধিমান মা–বাবার সন্তানেরা বেশির ভাগ বুদ্ধিমান হয়। জন্মের পর ভিন্ন পরিবেশে লালিত–পালিত দুই জন সমকোষী যমজের ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ বছর ভিন্ন পরিবেশে লালিত–পালিত হলেও দুই যমজ বোনের রুচি, পছন্দ, আচরণ ও স্বভাবে কোনো পার্থক্য নেই (গবেষক–গেসেল ও থমসন)।

অপরদিকে পরিবেশবাদীরা মনে করেন– ব্যক্তির বিকাশে বংশগতি যাই হোক না কেন, তাকে যদি উপযুক্ত পরিবেশে রেখে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তবে ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ সম্ভব। গ্ল্যাডিস এবং হেলেন নামে দুইজন সমকোষী যমজকে ভিন্ন পরিবেশে পাঠানো হয়; তখন তাদের বয়স মাত্র ১৮ মাস। হেলেন পড়াশোনা করার সুযোগ পেল। কিন্তু গ্ল্যাডিস পড়ার কোনো সুযোগই পায়নি। তাদের ৩৫ বছর বয়সে তুলনা করে দেখা গেছে যে, তাদের মুখের গঠন, চেহারা, আচরণ, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তায় হেলেন গ্ল্যাডিস চেয়ে অনেক উন্নত। সমকোষী যমজ বোন হিসেবে উভয়ের বৈশিষ্ট্য একইরূপ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি । এতে প্রমাণিত হয় পরিবেশের কারণে বিকাশ পার্থক্যপূর্ণ হয়।

পরিবেশ ও বংশগতি উভয়কেই যাঁরা সমর্থন করেন তাঁদের মতে– বিকাশ বংশগতি ও পরিবেশ এই দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উন্নত জাতের বীজ থেকে উন্নত মানের ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু বীজ থেকে গাছ হওয়ার জন্য চাই উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, আলো–বাতাস ইত্যাদি। পরিবেশের এই

উপাদানগুলোর অভাবে কখনই উন্নতমানের বীজ হতে উন্নতমানের ফলন সম্ভব হয় না। আবার উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, আলো–বাতাস ইত্যাদি ভালো পরিবেশ বিদ্যমান থাকলেও উন্নত বীজের অভাবে উন্নত মানের ফলন আশা করা যায় না। অর্থাৎ শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্ব অপরিসীম।

জন্ম থেকে ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন একটি শিশুকে উন্নত পরিবেশে প্রতিপালন করলেও তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। একই ভাবে অধিক বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাকে যদি তার বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক পরিবেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া না হয়, তবে তার বুদ্ধিমত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটন হয় না। উপযুক্ত পরিবেশ শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। তাই বলা যায়– বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে শিশুর বিকাশ নির্ধারিত হয়।

কাজ – শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ কোনটির গুরুত্ব বেশি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে উদাহরণসহ যুক্তি উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন সময়কে শিশুর নবজাতক কাল বলা হয়?

ক) জন্ম থেকে ১ সপ্তাহ খ) জন্ম থেকে ২ সপ্তাহ
গ) জন্ম থেকে ৩ সপ্তাহ ঘ) জন্ম থেকে ৪ সপ্তাহ

২। গ্রামের ছেলে মেয়েরা বেশি কর্মঠ হওয়ার কারণ–

i. ভৌগোলিক অবস্থা
ii. আবহাওয়া
iii পরিচর্যা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র তাহমীদের কৌতূহলের সীমা নেই। স্কুল থেকে ফিরেই তার চারপাশের বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য সে মাকে নানা প্রশ্ন করে। ইদানীং সে দাবা খেলা শিখেছে। এতে ভীষণ আনন্দিত।

৩। তাহমীদ বিকাশের কোন স্তরে আছে?

ক) নবজাতক কাল খ) মধ্য শৈশব কাল
গ) কৈশোর কাল ঘ) বয়ঃপ্রাপ্তিকাল

৪। ওই স্তরে তাহমীদ–

i. চিন্তাশক্তির বিশ্লেষণ করতে পারে।
ii. নিজ অবয়বের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
iii. ন্যায়–অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ৬ষ্ঠ শ্রেণি পড়ুয়া রাফি বড় হয়ে বৈমানিক হতে চায়। সে জেনেছে বৈমানিক হতে হলে বিজ্ঞান বিষয় ভালোভাবে জানতে হয়। তাই সে দারুণ উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ে। মা রাফিকে তার পছন্দমতো পড়ান। মায়ের বেঁধে দেওয়া সময় অনুযায়ী তাকে খেলতে যেতে হয়। রাফি তা পছন্দ করে না।

ক. কতো বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে?

খ. বার্ধক্যে একজন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় কেন?

গ. রাফি বিকাশের কোন স্তরে আছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কী মনে কর রাফি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। জাওয়াদ ও জারিফ দুই ভাই। তারা দেখতে অনেকটা তাদের দাদার মতো হয়েছে। তাদের বড় চাচারও দুইটি পুত্রসন্তান আছে। কিছুদিন আগে জাওয়াদের ছোট চাচার প্রথম পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তাদের দাদি মর্মাহত হন। জাওয়াদের দাদা এ নিয়ে তার দাদিকে মন খারাপ করতে নিষেধ করলেন এবং আরও বললেন "সন্তান জন্মের ব্যাপারে মানুষের করণীয় কিছু নেই।"

ক. মানব জীবকোষের নিউক্লিয়াসে কয়টি ক্রমোজোম থাকে ?

খ. শিশুর বিকাশ বলতে কী বোঝায়?

গ. জাওয়াদ ও জারিফ একরকম দেখতে হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দাদার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ

পাঠ ১ – মা– বাবার সাথে শিশুর বন্ধন

একটি চারাগাছের কথা ধরা যাক, বীজ থেকে যখন চারাগাছটি জন্মায় তখন তা বেশ দুর্বল থাকে। এ সময়ে উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার উপর গাছটির বেঁচে থাকা নির্ভর করে। একবার যদি গাছটির গোড়া মাটিতে শক্ত হয়ে যায় তবে পরবর্তীতে বিশেষ যত্ন ছাড়াই গাছটি বেড়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনি মানব শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের যত্ন ও পরিচর্যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।

জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এ সময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক যত্ন এবং পরিবারের বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করে।

সকল পরিবারই তাদের শিশুদের ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে শিশু প্রতিপালন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা আছে বা কীভাবে তাকে সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে – এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকে না। আমরা অনেকেই জানি না যে, শিশুর সাথে খেলা ও ভাব বিনিময় শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা–ই হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন মাতৃ পরিচর্যা হলো শিশুর শরীর, মন ও আবেগ বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, মা ও নবজাতকের মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও প্রথম কয়েক দিনের সান্নিধ্য উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে, যা বিকশিত হতে থাকে এবং স্থায়ী হয় বছরের পর বছর। শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির কয়েকটি পদক্ষেপ হলো–

- শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ দেওয়া।
- শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া।
- শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো।
- শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের বুকের দুধ দেওয়া–

- বহু সংস্কৃতিতেই সোনাকে মূল্যবান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সোনার তুলনায় ব্রোঞ্জ মূল্যহীন। মায়ের দুধের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের মতোই মূল্যহীন। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট এবং বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

- মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের ত্বকের স্পর্শে শিশু উষ্ণ থাকে। এই অবস্থা আড়াই কেজির কম ওজনের শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ (মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বা কলোস্ট্রাম বলা হয়) শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
- শিশু জন্মের প্রথম ৫ দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে। তবে এই পরিমাণই নবজাতকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এই অবস্থা জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা

- শিশুর মায়ের স্তন মুখে নেওয়া ও চোষার ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এতে মা শান্ত, অবসাদমুক্ত বোধ করেন এবং শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়।
- মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে এই প্রথম যোগাযোগে অতিশয় আনন্দবোধ করেন। এভাবে মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে শিশু জীবনের প্রথম ছয় মাস শুধু মায়ের দুধ এবং ছয় মাস পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত বাড়তি খাবারের সাথে মায়ের দুধ দেওয়া চলতে থাকে।

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়। এই পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের বাবার ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি। তিনি বিভিন্নভাবে স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করেন।

- মায়ের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করেন।
- মা ও শিশুকে বেশি সময় একত্রে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেন।
- গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাজে মাকে সহায়তা করেন।
- পরিবারে বড় শিশুটির যত্ন নিতে মাকে সাহায্য করেন।
- স্তন্যদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।

এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে বাবা পরোক্ষভাবে সন্তানের সাথে বন্ধন তৈরিতে ভূমিকা রাখেন।

মায়ের সাথে বাবার সহযোগিতা শিশুর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে

শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া–

ভাষা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কান্না দিয়েই তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে। অতি শৈশবের শিশু সাধারণত দুইটি কারণে কাঁদে। ক্ষুধার কারণে এবং যে কোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার

কারণে। ক্ষুধায় শিশুকে খাবার দেওয়া এবং শারীরিক অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা যেমন– শিশুকে ভেজা বিছানায় না রাখা, মলমূত্র ঠিকমতো পরিষ্কার করা, পেট ব্যাথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজগুলো শিশুকে আরাম দেয়। শিশু যদি আরামে ঘুমাতে পারে, কান্নায় যত তাড়াতাড়ি মা–বাবার সাড়া পায়, তাকে কোলে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে মা–বাবার প্রতি শিশুর বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিপরীতে যখন শিশুর অসুবিধাগুলো সময়মতো দূর করা হয় না অথবা শিশু কোনো কারণে আরাম পায় না তখন তার মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মাতে থাকে। বাবা–মায়ের আদর, যত্ন, স্নেহ ভালোবাসার অভাবে একটি শিশুর মা–বাবার প্রতি অনাস্থার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কেও শিশুটির মধ্যে অনাস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা এবং হতাশার জন্ম নেয়। সেক্ষেত্রে শিশু বেশি কান্নাকাটি করে।

শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো–

দিনের বেলার মতো রাতেও শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। রাতে মা–বাবা শিশুকে ঘুম পারিয়ে দেওয়া এই চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। এ ছাড়া রাতে শিশুর আশপাশে মা–বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। বিছানায় যাওয়ার আগে প্রত্যেক শিশু মা–বাবাকে কাছে পেতে চায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারা দিনের কর্মকাণ্ড ঘুমানোর আগে মা–বাবাকে বলতে পছন্দ করে।

শিশুর সাথে মা–বাবার বন্ধন তৈরির অন্যতম উপায়– শিশুকে পর্যাপ্ত সময় ও সঙ্গ দেওয়া

শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া –

শিশুরা সাধারণত খাদ্য ও নানা ধরনের শরীর বৃত্তীয় কাজে মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। এসব কাজে বাবারও সহায়ক ভূমিকা থাকলে শিশুর মায়ের উপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বাবার সাথে তার আসক্তি তৈরি হয়।

শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দিতে করণীয়–

- শিশুর সাথে খেলা করা, গান, ছড়া,গল্প বলা- যা শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটায়
- শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া–এ থেকে শিশু বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
- পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নেওয়া (যেমন– বাগানে পানি দেওয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজ ইত্যাদি)- এতে শিশুর নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসে।

এ ছাড়া জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, শিশুকে আদর, স্নেহ করা, বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা–বাবার বন্ধনকে মজবুত করে। শৈশবে মা–বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দেবে এবং স্নেহ করবে তাদের বন্ধন ততই দৃঢ় হবে এবং এ বন্ধন তাদের পরবর্তী বয়সে মা–বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

কাজ – '' শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া- শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরির শ্রেষ্ঠ সূচনা'' - বিষয়টির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ ২ ও ৩ – শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ। জন্ম গ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা–বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সের কোনো শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা তাদের মা–বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যখন মা শিশুর ঘরে প্রবেশ করে তখন শিশু খুশি হয়ে উঠে। মা তাকে কোলে তুলে নিলে সে তার মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। শিশু ভয় পেলে মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। জন্মগ্রহণের পরপরই শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। মায়ের কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা সবই শিশুর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

গবেষকরা দেখেছেন বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভুমিকা রাখে। শিশুর লালন–পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং কখনো কখনো শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মায়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন –পালনে স্নেহপূর্ণ অংশ নেন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মাদকাসক্তি বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

শুধুমাত্র সন্তানের সাথে মা–বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলেই হবে না, মা–বাবার নিজেদের মধ্যেও স্বামী–স্ত্রী হিসাবে সম্পর্ক সুখের হতে হবে। কারণ সুখী মা–বাবার সন্তানেরাও সুখী থাকে। মা–বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করে এবং আনন্দ পায়। তাই মা–বাবার মধ্যে যখন সুসম্পর্কের অভাব থাকে তখন শিশু প্রতিপালনে তাদের মনোযোগ থাকে না। ফলে শিশুটির বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি শিশুকে পর্যাপ্ত খাদ্য দেওয়া হলেও যদি তার যথাযথ পরিচর্যা না করা হয়, তবে পর্যাপ্ত ভালোবাসা, মনোযোগ, ও উদ্দীপনা পাওয়া অপর একটি শিশুর তুলনায় তার মস্তিষ্কের বিকাশ কম হয়।

ভাই–বোনের সাথে পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক একটি শিশুর আত্মধারণাকে বিঘ্নিত করে। ভাই–বোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ভাই

২০১৫

বোনকে অনুসরণ করে শিশু ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে। ভাই–বোনের সান্নিধ্যে শিশু নিরাপত্তা পায়। আবার ভবিষ্যৎ জীবনে দলগতভাবে মেলামেশার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মা–বাবার পাশাপাশি পরিবারে ভাই–বোনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন। পরিবারে ভাই–বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়েরই সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে উঠে।

শিশুর ভাই বা বোন হিসেবে যে সব আচরণ শিশুর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি এবং শিশুর বিকাশে সহায়তা করে	যে আচরণ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকর হয় এবং শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে
– ছোট ভাই বা বোনের যত্নে সহযোগিতা করা	– ছোট ভাই বা বোনকে সঙ্গ বা সময় না দেওয়া
– কোনো জিনিস ভাগাভাগি করা	– নিজের স্বার্থ বড় করে দেখা
– পরস্পরকে সাহায্য করা	– ঈর্ষা করা
– তাদের সঙ্গ দেওয়া, খেলাধুলা করা	– ভাই–বোনের সাহচর্য এড়িয়ে চলা
– সবাই মিলেমিশে থাকা	– ঝগড়া করা, মারামারি করা
– তাদের সাথে স্নেহের সম্পর্ক তৈরি করা	– অবহেলা করা, নিজেকে বড় মনে করা

আমাদের দেশে যৌথ পরিবার প্রথায় একটি পরিবারে আরও অনেক সদস্য থাকেন, যারা শিশুর লালন–পালনে বাবা–মাকে সহযোগিতা করে থাকেন। বিশেষ করে কর্মজীবী মায়ের ক্ষেত্রে শিশুর যত্নে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা থাকে অনেক বেশি। শিশুর প্রতি আত্মীয়স্বজনের মনোভাব এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়। যখন কেউ মনে করে যে শিশুটিকে শুধুমাত্র পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। শিশুর কথা শোনা, তার সাথে খেলা করার প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে শিশুর সাথে সেই সদস্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে না।

পরিবারে ভাই–বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়েরই সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে ওঠে।

পরিবারে দাদা–দাদি, নানা–নানি শিশুর সাথে গল্প করেন, শিশুদের তাদের নিজের জীবনের অনেক ঘটনা শোনান। তাঁরা শিশুর অসুবিধার কথা শোনেন, তা সমাধানের চেষ্টা করেন। শিশুকে আদর–ভালোবাসা দেন। এভাবে শিশুর সাথে পরিবারের সকলের ভাব বিনিময় শিশুর প্রথম বছরগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে। শৈশবে যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয় ভবিষ্যতেও শিশু তার মা–বাবা, ভাই–বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে বন্ধু হিসেবে ভাবতে শেখে।

কাজ ১ - পরিবারের ভাই–বোনের সম্পর্ক উন্নয়নের কয়েকটি উপায় লেখ।
কাজ ২ - পরিবারের আর্থিক সংকটে তোমার করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

২০১৬

পারিবারিক বিপর্যয়–

প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের যেখানে সে আদর, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায়, সুরক্ষিত থাকে এবং তার মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করা হয়। পরিবার এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী–স্ত্রী একসাথে অবস্থান করেন। শিশুকে লালন পালন এবং শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে পরিবারের উপর।

শিশু পরিবারে জন্ম নেয় এবং বড় হয়ে উপার্জন করতে শেখে। এই দীর্ঘ সময়ে পরিবার অনেক ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। পারিবারিক এই বিপর্যয়ের মধ্যে আছে– মা কিংবা বাবার অসুস্থতা, মৃত্যুজনিত শুন্যতা, মা–বাবার পৃথক অবস্থান কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ। এ ছাড়াও আছে বাবা–মায়ের সার্বক্ষণিক ঝগড়া, মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, পরিবারে বাবার অনুপস্থিতি বা চাকরি চলে যাওয়া, ব্যবসায় ক্ষতি, মায়ের উপর দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি। পারিবারিক বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন, তা পরিবারের সদস্যদের কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। এতে শিশু জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

বাবা/মায়ের মৃত্যু– পরিবারে বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুতে পরিবারে শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সাধারণত পরিবারে বাবা উর্পাজন করেন। এ কারণে বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়। পরিবারে বিভিন্ন বয়সের শিশু থাকলে তাদের ভরন–পোষণ, লেখাপড়ার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যুতে সন্তানেরা দিশেহারা হয়। তাদের দেখাশোনা, যত্ন পরিচর্যায় অবহেলা হয়। বাবা কিংবা মা যে কোনো একজনের মৃত্যুতেই সন্তান স্নেহবঞ্চিত হয়।

বাবা/মায়ের গুরুতর অসুস্থতা- পরিবারে মা বা বাবার হঠাৎ কোনো গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়লে পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। মা কিংবা বাবার দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা পরিবারে সংকট সৃষ্টি করে। হঠাৎ কোনো গুরুতর অসুস্থতায় বা দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এ ছাড়া মা–বাবার সুস্থ সঙ্গ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয়। মা–বাবার অসুস্থতায় তারা মা–বাবাকে হারানোর ভয়ে ভীত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মা–বাবা ছাড়াও পরিবারের যে কোনো সদস্যের গুরুতর অসুস্থতা পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

পরিবারে ভাঙ্গান– স্বামী– স্ত্রীর মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, দ্বিতীয় বিয়ে ইত্যাদি পারিবারিক ভাঙ্গানের অন্যতম কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তানেরা ছোট অবস্থায় পারিবারে ভাঙ্গানের আশঙ্কা বেশি থাকে। মা–বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথকভাবে অবস্থান ছেলে–মেয়েদের মনে হতাশা, দ্বন্দ, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব প্রভৃতি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারে ছোট শিশু থাকলে তাকে যদি বাবার কাছে থাকতে হয় তবে মায়ের স্নেহ বঞ্চিত হয়ে তার বিকাশে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবারের ভাঙ্গানে তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে। স্কুলগামী শিশুরা বন্ধুবান্ধবদের বিরূপ মন্তব্যে মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাতে পড়তে না হয় সেজন্য সন্তানেরা কোথাও বের হতে চায় না, সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে দেয়, তারা অন্তর্মুখী হয়। তাদের মনের কষ্ট অনেক সময় শারীরিক কষ্টে রূপ নিতে পারে। যেমন– মাথাব্যথা, খাবারে অনীহা, ঘুমের ব্যঘাত ইত্যাদি।

পারিবারিক বিপর্যয়ে পরিবারের সদস্যরা একত্র হয়ে সংকট মোকাবিলা করলে সমস্যা অনেক কমে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয় আর্থিক সংকট। পরিবারের আর্থিক সমস্যা

দূর করতে এবং ছোট শিশুদের বিকাশজনিত চাহিদা পূরণে পরিবারের কিশোর বয়সের সন্তানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তারা যা যা করতে পারে-

- আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা।
- অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমানো।
- পারিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে ব্যয় কমানো যেমন- গৃহকর্মীর কাজ নিজে করা।
- ছোট ভাই-বোনের বিভিন্ন যত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া।
- তাদেরকে পর্যাপ্ত আদর স্নেহ করা যেন তারা নিজেকে স্নেহবঞ্চিত মনে না করে।
- ছোট ভাইবোনের সাথে অধিক সময় কাটানো।
- অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করা ।
- ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।
- সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করা।
- মানসিক চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
- পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক খুঁজে নেওয়া।
- ভবিষ্যতে পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আরও মনোযোগী হওয়া।

কাজ- তোমার জানা কোনো পরিবারের যে কোনো বিপর্যয়ে তারা যে ধরনের সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে- তা লেখ। ওই পরিবারটির সহায়তায় তোমার করণীয় কী তা উল্লেখ কর।

পাঠ ৪ – শিশু পরিচালনার নীতি

অনেক শিশুবিজ্ঞানী জন্মের মুহূর্তে শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন। সাদা কাগজে যেভাবে একটি ছবি আঁকা হয় ছবিটি সেভাবেই রূপ লাভ করে। ঠিক তেমনি নবজাত শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধরনের অভিজ্ঞতা পায় সেভাবেই আচরণ করতে শেখে। সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে যেমন একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় ঠিক তেমনি সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে অনেক ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হতে পারে যা তার বর্তমান বিকাশকে এবং পরবর্তী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুরা কাদা মাটির মতো। সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুটিকে মনমতো ছাঁচে গড়ে তোলা যায়, শিশুর সামর্থ্য বাড়ানো যায়। সেজন্যে শিশু পরিচালনার নীতি আমাদের জানা জরুরি।

শিশু পরিচালনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতি -

- **শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন**- শিশুরা অনুকরণ করে। যারা তাদের কাছাকাছি থাকে তাদের আচরণ অনুকরণ করে। শিশুদের যা যা করতে বলা হয় বা যা যা করতে নিষেধ করা হয় তার চেয়ে পরিবারের বড় সদস্যরা যা যা করেন, সেগুলোই তারা অনুকরণ করে। এ কারণে শিশুর সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার। কোনো আচরণ শেখাতে হলে বড়দের সেই আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। যেমন- বড়দের শ্রদ্ধা করা, একে অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আবার কোনো আচরণ করতে নিষেধ করা হলে বড়দেরও সেই আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন- মিথ্যা কথা না বলা, ঝগড়া না করা ইত্যাদি।

- **শিশুকে প্রশংসা করা–** প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। শিশুর মধ্যে ভালো গুণাবলী খুঁজে তার জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসা তার কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো ভালো গুণ বা আচরণ পাওয়া যায়। এই ভালো গুণ বা আচরণকে প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে। সে বুঝতে পারে যে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে।

- **শিশুকে শাস্তি না দেওয়া–** শিশুর কাজের জন্য শাস্তি দিলে তা শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শাস্তি দুই ধরনের হয়– শারীরিক শাস্তি ও মানসিক শাস্তি। শারীরিকভাবে আঘাত করা, মারা, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি শারীরিক শাস্তি। মানসিক শাস্তি হলো– শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, বকাবকি করা, দোষারোপ করা, মনোযোগ না দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, ঘরে বন্দী করে রাখা ইত্যাদি। শিশুকে যে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশু ভীত এবং লাজুক হয়ে বেড়ে উঠে। অনেক সময় বোঝাই যায় না যে, শিশুর প্রতি যে আচরণটি করা হচ্ছে, সেটা তার জন্য মানসিক শাস্তিস্বরূপ কি না। মানসিক শাস্তিতে শিশুর পরবর্তী জীবনেও খারাপ প্রভাব পড়ে। শিশুর কোনো আচরণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে ওই নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে। আচরণটি কেন খারাপ, ওই আচরণের খারাপ ফলাফল তাকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

- **শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা–** অনেকে মনে করেন শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ সে যে সকল কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সব কিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সব কিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যে কোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সব সময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া। আমরা সব সময়ই শিশু সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করি বা নির্দেশ দিয়ে থাকি। যেমন– এটা করো না, ওটা ধরো না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না ইত্যাদি। এই নির্দেশগুলোকে হ্যাঁ বোধকভাবে প্রকাশ করতে হবে। নিচে ইতিবাচকভাবে কথা বলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

  ১. 'টেবিলে কাঠের টুকরা রেখ না' না বলে বলতে হবে 'কাঠের টুকরাগুলো মাটিতে রাখ'।

  ২. এখন খেলার সময় নয়– না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে'।

  ৩. মুখ ধুতে এত বেশি সময় নষ্ট করো না– না বলে বলতে হবে 'তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নাও'।

  ৪. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না– না বলে বলতে হবে 'চেষ্টা করলেই তুমি পারবে'।

ইতিবাচক নির্দেশ নেতিবাচক নির্দেশ অপেক্ষা কম প্রতিবাদ আনে, এতে কাজ ভালো হয়। বড়দের ইতিবাচক উক্তি, মন্তব্য শিশুকে নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। সে সফল হওয়ার চেষ্টা চালায়। তাকে কাজ করতে উৎসাহিত করে।

- **শিশুর সাথে ভাব বিনিময়–** শিশুর সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর আস্তে ও নরম এবং ভাষা সহজ হতে হয়। জোড়ে ও কর্কশ স্বরে কথা বললে শিশু ভয় পায়, তাকে এড়িয়ে চলে। শিশুর সাথে কথা বলার সময় শিশুর মনের ভাব বুঝতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হয়। তাহলে শিশুকে বোঝা সহজ হয়। শিশুর সাথে কথা বলতে একজন ভালো শ্রোতা হতে হয়। যেমন– মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা, কথার মাঝে বাধা না দেওয়া, ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রশ্ন করা ইত্যাদি।

২০১৯

- **শিশুর জন্য আর্দশ পরিবেশ তৈরি –** শিশু পরিচালনার অন্যতম একটি দিক হলো শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শিশু কম বিরক্ত করে এবং সে তার সময় আনন্দে কাটায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলাই শিশুর প্রধান কাজ। গৃহে শিশুর জন্য নিরাপদ খেলার স্থান ও খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হয়। এ জন্য দামি খেলনা বা ব্যয়বহুল উপকরণের প্রয়োজন হয় না। স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা মূল্যে শিশুর খেলার উপকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন– গাছের পাতা, প্লাস্টিক সামগ্রী, কাগজের বাক্স ইত্যাদি। এ ছাড়া শিশুদের গান, ছড়া, গল্প শোনানো, তাদের সাথে খেলা করা, তাদের নতুন কিছু দেখতে, শুনতে, ধরতে, করতে, স্বাদ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য বয়সোপযোগী সঠিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ।

- **শিশুর মনোস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা–** শিশু পরিচালনায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনোস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে ইংরেজি three A's for happiness দিয়ে এবং বাংলায় সুখের ৩টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

স– স্বীকৃতি A- Acceptance

স- স্নেহ A- Affection

স- সাফল্য A- Achievement

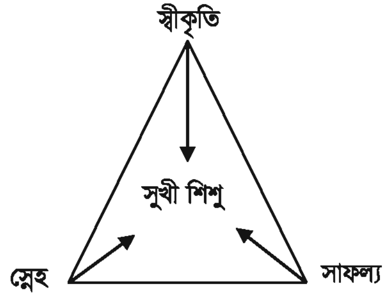

স্বীকৃতি– সকল শিশুর চেহারা বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। কেউ যদি দেখতে সুন্দর হয় তবে সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করে। এখানে স্বীকৃতি অর্থ শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

স্নেহ– প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তখন সে তার পরিবেশকে ভয় পায় না।

সাফল্য– প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এ জন্য শিশুর ভালো কাজ বা কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কি পারে। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

কাজ ১- শিশুর বিকাশে প্রশংসা ও শাস্তির ফলাফলের তালিকা কর।

কাজ ২- কয়েকটি নেতিবাচক বাক্য ইতিবাচক ভাবে রূপান্তর কর। ক্লাসে তা পড়ে শোনাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অক্সিটোসিন কী?

ক) কোষ খ) হরমোন

গ) এন্টিবডি ঘ) শিশুর প্রথম মল

২। বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ছেলেমেয়েরা–

i. স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না।

ii. ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

iii স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চায়না যৌথ পরিবারের গৃহিণী। সংসারের বেশির ভাগ কাজ তাকেই সামলাতে হয়। কাজ শেষে তিনি প্রায়ই দেখতে পান তার সাত মাস বয়সী শিশুটি ভেজা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

৩। চায়নার সন্তানের মাঝে কিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হবে?

ক) সন্তুষ্টি খ) অনাস্থা

গ) সহানুভূতি ঘ) নিরাপত্তাবোধ

৪। পরবর্তী সময়ে চায়নার শিশুটি–

i. প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হবে।

ii. হতাশাগ্রস্তভাবে বেড়ে উঠবে।

iii আচরণগত সমস্যায় ভুগবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০১৬

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আট বছর বয়সী সেজান বরাবরই নিজ আগ্রহে পড়তে বসে। পড়া শেষে সে নিজ থেকেই বইগুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। বাবা বিষয়টি খেয়াল করে তাকে ধন্যবাদ দেয়। এক দিন সেজানের মা সেজানকে স্কুলে তার বন্ধুর সাথে ঝগড়া করতে দেখেন। বাসায় ফিরে তিনি সেজানের কাছ থেকে ঝগড়ার কারণ জেনে নেন এবং তাকে বন্ধুর সাথে মিলেমিশে চলতে বলেন। তিনি কখনো সেজানের সামনে কারও সাথে উঁচু স্বরে কথা বলেন না এবং কারও প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন না।

ক. কোন বয়সী শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না?

খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. বাবার আচরণ সেজানের মাঝে কীরূপ প্রভাব ফেলবে?

ঘ. তুমি কি মনে কর সেজানের বাবা–মা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করছেন? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। আজাদ রহমান ও সায়া হোসেনের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। এমনি এক মুহূর্তে তাদের চার বছরের সন্তান ইনান মায়ের সাথে খেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ের কাছে সাড়া না পেয়ে সে বাবার কাছে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরে। বাবা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলেন। বিষয়টি খেয়াল করে দাদি তাকে গল্প শোনানোর কথা বলে কাছে ডেকে নেন। এমন ঘটনা ইনানের পরিবারে প্রায়ই ঘটে। এতে করে দাদির সাথে ইনানের বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে।

ক. শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী ?

খ. শালদুধের উপকারিতা বুঝিয়ে লেখ।

গ. ইনানের বিকাশের ক্ষেত্রে ওই পরিবারে দাদির ভূমিকা কীরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়- বিশ্লেষণ কর।

২০২৫

অষ্টম অধ্যায়

কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা–প্রতিকার ও প্রতিরোধ

পাঠ ১ ও ২ – কৈশোরকালীন মনোসামাজিক সমস্যা

১৮ বছরের মেয়ে রিদিতা। মা–বাবার একমাত্র সন্তান রিদিতা, মেধাবী ও প্রতিভাবান। মা–বাবা থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন সবাই রিদিতার বড় ধরনের সফলতা আশা করে। বাবা–মা তাদের একমাত্র সন্তানের সকল চাহিদা পূরণ করেন, শ্রেষ্ঠ হওয়ার সব রকম সুযোগ তৈরি করে দেন তারা। রিদিতা এখন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মা–বাবার স্বপ্ন সে কি পূরণ করতে পারবে? সে কি পারবে সামনের ভর্তি পরীক্ষায় সফলতা আনতে? কিছুই ভালো লাগে না তার। অল্পতেই রেগে যায়, অল্পতেই তার ক্লান্তি আসে। ইদানীং রাতের বেলায়ও ঘুম আসতে চায় না। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় সে ছটফট করে।

উপরের ঘটনাটিতে একটি কিশোরী মেয়ের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের সমস্যাগুলোর মধ্য দিয়ে কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে। তোমরা কি জানো মনোসামাজিক সমস্যা অর্থ কী? এসো আমরা বিস্তারিতভাবে এ সমস্যা সম্পর্কে জেনে নেই।

বেশির ভাগ কিশোর–কিশোরীরা বড় ধরনের সমস্যা ছাড়াই বয়ঃসন্ধিক্ষণ বয়স পার করে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা সাংঘাতিকভাবে তাদের জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং তাদের সমস্যা তাদের পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, সহপাঠী সবার জন্যই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো পরোক্ষভাবে সমাজের সবাকেই প্রভাবিত করে। এ সমস্যাগুলোই মনোসামাজিক সমস্যা। কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা, মাদকাসক্তি, বিষণ্নতা, স্কুল পলায়ন ইত্যাদি। যে ছাত্রটি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই স্কুল ত্যাগ করে, সে শুধু নিজের ভবিষ্যতই নষ্ট করে না, সমাজের জন্যও সে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা দুই ধরনের হয়। একটি অন্তর্মুখী ও অপরটি বর্হিমুখী। অন্তর্মুখী সমস্যায় সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের মানসিক ও আবেগীয় জটিলতায় ভোগে। যেমন– হতাশা, উদ্বেগ ইত্যাদি। বাইরে থেকে এ ধরনের সমস্যার প্রকাশ কম থাকে অর্থাৎ তাদের দেখে হয়তো মনে হবে, সে খুবই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে খুব যন্ত্রণায় ভুগছে। আবেগীয় এসব সমস্যা পরবর্তীতে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। যেমন– হতাশা ও বিষণ্নতা থেকে খাদ্যে অনীহা, ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

বহির্মুখী সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সমস্যা তার আচরণে প্রকাশ পায়। বহির্মুখী মনোসামাজিক সমস্যা হলো মাদকাসক্তি, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি। সাধারণত পারিবারিক বন্ধনের অভাব বা পরিবারের অতিরিক্ত প্রশ্রয় বহির্মুখী সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। অপর দিকে মা–বাবার অতিরক্ষণশীলতা অন্তর্মুখী সমস্যার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। সব কিছুতেই শাসন, সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রাখা অতিরক্ষণশীল মা–বাবার বৈশিষ্ট্য। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয় ধরনের সমস্যা একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত। যেমন– অনেকে অপরাধপ্রবণ বিষণ্নতায় ভোগে, আবার হতাশাগ্রস্থ কিশোর মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

কিশোর অপরাধ–

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো কৈশোরকাল। এ সময়ে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়। কৈশোরের একটি ছেলে বা মেয়েকে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। কৈশোরকাল প্রাপ্ত বয়সে যাওয়ার সময়কাল। সাধারণত ১১ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোরকাল।

২০১৯

কৈশোরকালে কোনো ছেলে বা মেয়ে আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে তাদেরকে কিশোর অপরাধী বলা হয়। বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ অনুসারে কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সের মধ্যে কেউ সমাজবিরোধী কাজ করলে তাকে সংশোধনের জন্য বিশেষ বিচারের সামনে হাজির হতে হয়। কিশোর অপরাধ হলো অপরিণত বয়সে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, আইনকানুনবিরোধী আচরণ। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে ধরনের কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সে ধরনের কাজ কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হলেই তা কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে না। তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য সংশোধনী কেন্দ্রে রাখা হয়।

বয়স্কদের অপরাধ যেমন পরিকল্পিত থাকে কিশোরদের অপরাধ থাকে অপরিকল্পিত এবং সংখ্যায় অনেক বেশি। কিশোর অপরাধের যে ধরনগুলো আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় তা হলো– স্কুল পলায়ন, মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণ, চুরি, ছিনতাই, খুন, ডাকাতি, মারামারি, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি।

মনোস্তাত্ত্বিকেরা কিছুটা ভিন্নভাবে কিশোর অপরাধীদের চিহ্নিত করেন। যেকোনো অগ্রহণযোগ্য কাজ তা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ না হলেও তা কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে। যেমন– কারও জিনিস অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রাখা, অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি করা, অন্যের জীবনের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এটা হতে পারে কোনো গাড়িকে ঢিল মেরে পালিয়ে যাওয়া, বিনা কারণে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, শুধু মজা করার জন্য কোনো ক্ষতি করা, যে কোনো ধরনের অন্যায় আচরণ করাই কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে।

অনেকে বয়ঃসন্ধি বয়সের আগে থেকেই অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তারা সাধারণত ৭/৮ বছর বয়স থেকে ধারাবাহিকভাবে অপরাধ করে। যেমন– মারামারি করা, অন্যের জিনিস নষ্ট করা, চুরি করা ইত্যাদি। এ ধরনের অপরাধের কারণ হিসেবে মানসিক সমস্যা বা বিপর্যয়কে দায়ী করা হয়। কিশোর অপরাধের উপর দীর্ঘদিনের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা ছোট বেলা থেকে অপরাধমূলক কাজে অভ্যস্ত থাকে তারা বড় হয়েও অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তাদের সম্পর্কে গবেষকদের আরও অভিমত –

- এই ধরনের অপরাধীদের মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি থাকে।
- এদের মধ্যে বেশির ভাগ পরিবার দরিদ্র কিংবা ভগ্ন পরিবার অর্থাৎ পরিবারে মা–বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথক বসবাস করা।
- এইসব কিশোর অপরাধীর মা–বাবার শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি সঠিক না। তাদের পরিবারের শৃংখলার অভাব, সন্তানদের প্রতি মা–বাবার অবহেলা থাকে।
- এ ধরনের অপরাধের জন্য বংশগত কারণকেও দায়ী করা হয়; অর্থাৎ পরিবারের বাবা বা অন্য সদস্যরাও অপরাধী হয়ে থাকে।
- অনেক সময় অপরাধীরা অপরাধ জগৎ থেকে বের হতে পারে না। সে জন্য তা স্থায়ী হয়ে যায়।

যারা কৈশোরের আগে থেকে অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত তাদের ছোটবেলা থেকেই কিছু লক্ষণ থাকে। তারা সমবয়সীদের তুলনায় স্কুলে অমনোযোগী থাকে, তাদের বুদ্ধাংক বা আই কিউ কম থাকে, তাদের সমবয়সীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে না। এসব লক্ষণ একটি ছোট শিশুর কিশোর অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা বাড়ায়।

আরেক ধরনের অপরাধী আছে যারা কিশোর বয়সে এসে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। তারা সমবয়সী দলের চাপে পড়ে অপরাধী হয়। এদের অপরাধ প্রবণতা ততটা গুরুতর হয় না। এরা সমবয়সীদের সাথে দলে অপরাধমূলক কাজ করে।

এদের সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল হলো–

- এ ধরনের কিশোরদের মা–বাবা তাদের সন্তানদের পরিচালনায় ততটা সচেতন না।
- দলে থেকে তারা অপরাধ ঘটায়।
- মধ্য কৈশোরে অপরাধের মাত্রা খুব বেশি থাকে।
- কৈশোরের শেষের দিকে তা চলে যায়।

প্রতিকার–প্রতিরোধ

যে কোনো সমস্যা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। কোনো সমস্যা তৈরি হওয়ার পর সমাধান করা হলো প্রতিকার করা। সমস্যাটির যেন উদ্ভব না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

প্রতিরোধ কার্যক্রম

আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ প্রতিকারে অপরাধী কিশোর কিশোরীদের জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী– সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। অপরাধীকে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। যেমন– সেলাই এর কাজ, কাঠের কাজ, অটো মোবাইলের কাজ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে কিশোর ছেলে মেয়েরা তাদের সংশোধনকালীন শেষ হওয়ার পর বাড়িতে ফিরে যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তারা জীবিকার জন্য উপার্জন করতে পারে। প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন তাদের নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক অপরাধী ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কিছু করণীয় হলো–

- প্রতিটি পরিবারে সন্তানের সাথে মা–বাবার বন্ধন দৃঢ় করতে হবে।
- পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব থাকবে না।
- পরিবারের ভাঙ্গান রোধ করতে হবে। মা–বাবার মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হলে তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ছাত্র–ছাত্রীর যেকোনো সমস্যা সমাধান সহজ হবে।

কিশোর অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কিশোরদের নিজেদেরও কিছু করণীয় থাকে। প্রথমত কৈশোরের ছেলে–মেয়েকে তার বন্ধুদলের অপরাধমূলক কাজকে উৎসাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, মেলামেশার জন্য ভালো বন্ধুদল নির্বাচন করতে হবে। আইন বা নিয়ম ভঙ্গকারীকে খারাপ বন্ধু হিসেবে চিনে নিতে হবে।

মা–বাবাকে সন্তানের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে যেন সন্তান অপরাধমূলক কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। সব সময় অপরাধ জগতের খারাপ দিকগুলো সন্তানের সামনে তুলে ধরতে হবে। তারা যেন এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। মা–বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক বন্ধুর মতো হলে কৈশোরের সমস্যা অনেক কম হয়।

কাজ ১ – আমাদের দেশে বিদ্যমান কিশোর অপরাধের কারণগুলো কী কী?

কাজ ২ – কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় বিষয়গুলোর তালিকা কর।

পাঠ ৩ – হতাশা ও বিষণ্নতা

ভোর রাতে ঘুম ভেঙেছে স্বপ্নার। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে আছে সে। মায়ের ডাকে বিরক্ত হয়, মেজাজ করে। নবম শ্রেণির ছাত্রী স্বপ্না কিছুদিন হলো স্কুলে যাচ্ছে না। সারা দিন নিজের ঘরে থাকে। বান্ধবীদের খোঁজ নেয় না। কোনো কাজেই আনন্দ পায় না। টেলিভিশনের সিরিয়াল দেখার আগ্রহও তার মধ্যে নেই। স্বপ্নার বৈশিষ্ট্য এমন ছিল না। হাসি–খুশি স্বপ্না বদলে গেছে।

কৈশোরে বিষণ্নতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘটনায় মন খারাপ হওয়া, কাজ করতে ইচ্ছা না করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন এ রকম মনের অবস্থা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে এবং তা শরীরকেও প্রভাবিত করে তখন সেটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিষণ্নতা এক ধরনের মানসিক অবস্থা যেখানে মনের অসুখী ও একঘেয়েমির অনুভূতি থাকে। এর ফলে দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজের আগ্রহ থাকে না এবং সে হতাশায় ভুগতে থাকে। খাবারে অনীহা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি ধরনের শারীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। উল্লিখিত ঘটনায় স্বপ্নার মধ্যে হতাশা ও বিষণ্নতার লক্ষণ স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বিষন্নতা গুরুতর হলে নিচের লক্ষণ দেখা দেয়–

- দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা বা বিরক্তির অনুভূতি থাকা
- আনন্দময় কোনো কাজে আগ্রহ কমতে থাকা
- ওজন কমে যাওয়া বা দৈহিক শক্তি কমে যাওয়া
- ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া। ঘুমের স্থায়িত্ব বজায় থাকে না, বারবার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম আসতে চায় না বা ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় ইত্যাদি
- ক্ষুধা কমে যাওয়া, খাবারের আগ্রহ কমে যাওয়া
- মনোযোগের অভাব, উদ্বেগ বেশি হলে কোনো কিছু মনে রাখতে না পারা
- নিজের ক্ষতির চিন্তা করা, আত্মহত্যার পরিকল্পনা করা।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে বিষন্নতা বেশি দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে কৈশোরের বিষন্নতার সাথে শিশুকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ সম্পর্ক আছে। যে ধরনের পরিবারে শৈশবে সন্তান ও মা–বাবার দৃঢ় বন্ধন থাকে না, শিশু প্রতিপালনে স্নেহ আদরের বঞ্চনা থাকে এবং পরিবারের মা বা বাবা যে কোনো একজনের মৃত্যুতে নেতিবাচক মানসিক কাঠামো তৈরি হয়। এসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা ও বিষন্নতার সম্ভাবনা থাকে।

হতাশা ও বিষণ্ণতার কারণ

- শিশু প্রতিপালনে অতিরিক্ত কঠোরতা বিষন্নতা আনতে পারে। সেখানে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠে না। তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আত্মবিশ্বাস হারায়। এ ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন কারণে হতাশাগ্রস্ত থাকে, নিজেকে অপরাধী মনে করে।
- পরিবারের বাবা–মায়ের দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ সন্তানদের মধ্যে বিষন্নতা সৃষ্টি করে। পরিবারের আর্থিক সংকট কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিষণ্ণতা আনে।
- সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য, বন্ধু কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, বন্ধুত্বের ভাঙন বিষন্নতার সৃষ্টি করে।
- পড়াশোনায় ব্যর্থতা ও অতিরিক্ত মানসিক চাপে বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার–প্রতিরোধ

বিষন্নতায় ছেলেমেয়েরা নিজেকে খুব একা, অসহায় মনে করে। সামান্য কারণেই তারা কেঁদে ফেলে, তারা কর্ম দক্ষতা হারায় এবং গুরুতর হলে আত্মহননের চিন্তা করে থাকে। এভাবে বিষন্নতায় অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি হতে পারে। বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় বিষয়গুলো হলো–

- যে কোনো পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করতে শেখা।
- যে কোনো ঘটনার ভালো দিকগুলো খুঁজে পেতে শেখা।
- জটিল অবস্থা মেনে নেওয়ার ধৈর্য তৈরি করা। নিজের চিন্তা, অনুভূতি বাবা–মা বা নির্ভরযোগ্য কারও কাছে প্রকাশ করা।
- শখ, বিনোদন, সৃজনধর্মী কাজ, খেলাধুলায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

২০১৬

- অন্য কারও বিষণ্নতায় তাকে সঙ্গ দেওয়া, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। সে যেন তার ব্যক্তিগত অনুভূতি অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

কাজ - বিষণ্নতার কারণগুলো উল্লেখ কর। এর পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ কর।

পাঠ ৪ – মানসিক চাপ

দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে আমাদের মন খারাপ হয়। কখনো অন্য কারও কটু কথা বা অপ্রীতিকর আচরণে আমরা মনে কষ্ট পাই। নিজের ইচ্ছা বা চাহিদা পূরণ না হলে আমাদের মন খারাপ হয়। আবার কোনো দুঃসংবাদ বা ঘটনা আমাদের মন কষ্টের কারণ হয়। এই মনের কষ্ট থেকেই সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ। মানসিক চাপ এক ধরনের বেদনাদায়ক ও অস্বস্থিকর আবেগীয় অবস্থা, যা আমাদের মনে দ্বন্দ্ব ও হতাশার সৃষ্টি করে। ফলে আমরা অস্থির ও উত্তেজিত হই এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় আমরা মানসিক চাপ অনুভব করি। এই চাপ কখনো তীব্র আবার কখনো মৃদু হয়। মানসিক চাপ ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে।

ইতিবাচক চাপ– দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনেক মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে হয়। একে যদি আয়ত্তাধীন রাখা যায় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে এই চাপ অনেক সময় আমাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ও সাফল্য বয়ে আনে। যেমন– পরীক্ষার সময় যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় তা পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

আবার চাকরির ইন্টারভিউ বা নতুন চাকরি, বিভিন্ন কাজ বা অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব আমাদের ইতিবাচক মানসিকচাপ সৃষ্টি করে।

নেতিবাচক চাপ– মানুষের মনের মধ্যে এমন কিছু চাপ মাঝে মধ্যে দেখা দেয় যা স্নায়ুবিক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে মনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটাই নেতিবাচক চাপ। এই চাপ আমরা সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বা ছন্দপতন ঘটায়।

নেতিবাচক চাপ আমাদের নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন–

- বুক ধড়ফড় করা, হাত–পা কাঁপা, জিহ্বা শুকিয়ে আসা, অস্থিরভাব, উত্তেজনা বোধ,আচরণে বিশৃংখলা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- দীর্ঘমেয়াদি ও তীব্র মানসিক চাপ শরীরে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন– হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, ক্ষুধামন্দা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপ আমাদের জীবনে প্রায়ই দেখা যায়। নিচের দুইটি ঘটনা থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

শিক্ষক লক্ষ করলেন ক্লাসে মিনা মন খারাপ করে বসে আছে। শিক্ষক কারণ জানতে চাইলে মিনা কেঁদে ফেলে। সে জানায় তার ছোট ভাই খুব অসুস্থ। ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিন্তু জ্বর ভালো হচ্ছে না। সে তার ভাইকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে। ফলে সে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না।

মিনা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

রফিক নবম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা নেই। সংসারে অনেক অভাব। তাই সে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বইয়ের দোকানে কাজ করে। তার পড়াশোনা করার খুব ইচ্ছা। আর্থিক অনটনের কারণে সে সব সময় চিন্তা করে কীভাবে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা সবার এক রকম নয়। আবার চাপের প্রতি প্রতিক্রিয়াও সবার এক রকম নয়। চাপের সময় অনেকে ধীরস্থির ও শান্ত থাকে। অনেকে চাপের মুখে অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মানসিক চাপের সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বয়স, মানসিক গঠন, সম্মানবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মানসিক চাপের কারণ– নানা কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

- কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা দুঃসংবাদ।
- পারিবারিক বিশৃংখলা, দরিদ্রতা, বঞ্চনা, দুঃখ–বেদনা, নিরাপত্তার অভাব।
- সামাজিক উৎপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য, নৈতিকতার অবক্ষয়।
- নিজের ইচ্ছা বা বাসনা পূরণ না হওয়া।
- ক্রমাগত কাজের চাপ।
- পরীক্ষার সময় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা।
- সব সময় আতঙ্কগ্রস্থ থাকা।

মানসিক চাপ থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় –

- যে কোনো বেদনাদায়ক অবস্থায় বা দুর্ঘটনায় মনোবল বজায় রাখতে হবে।
- ধৈর্যধারণ করতে হবে। ধৈর্যধারণ করা মানুষের একটি বড় গুণ।
- পারিবারিক কোনো বিষয় মানসিক চাপের কারণ হলে,পরিবারের সবাই আলোচনা করে তা মোকাবিলা করতে হবে।
- কারও কোনো বৈষম্যমূলক আচরণে মন খারাপ হলে, তার সাথে কথা বলে নিজের মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।
- পরীক্ষায় খারাপ করে যাতে হতাশায় পড়তে না হয় সেজন্য সময়মতো ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে।
- সময় পরিকল্পনা বা কর্মপরিকল্পনা করে চললে সময়মতো সব কাজ শেষ হবে ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে না এবং জীবনে সাফল্য আসবে।
- মনে যদি কোনো আতঙ্ক, ভয় বা দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয় তা থেকে মুক্তির জন্য বিষয়টি নিয়ে বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন, শিক্ষকের সাথে আলাপ করতে হবে।
- বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। ভালো ও সৎ মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে।
- কেউ বিরক্ত করলে বা অযৌক্তিক কোনো কথা বললে দৃঢ়তার সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে।

কাজ : কোনো বিষয় বা ঘটনা যদি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তখন তুমি কী করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কৈশোরকালের বয়সসীমা কতো বছর?

ক) ৮ –১৬ খ) ৮ –১৮

গ) ১১–১৮ ঘ) ১৬ –১৮

২। কৈশোরে মনোসামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে কোনটি?

ক) খাদ্যে অনীহা খ) বিষণ্নতা

গ) ঘুমের ব্যাঘাত ঘ) ক্লান্তি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৯ম শ্রেণির ছাত্র সুমন। সে ক্লাসে অমনোযোগী। মা–বাবার চাইতে বন্ধুদের কথার গুরুত্ব দেয় বেশি। মা কিছু বললে সে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

৩। সুমনের মধ্যে কোন সমস্যার লক্ষণ দেখা দিয়েছে?

ক) বিষণ্নতা খ) ক্রোধ

গ) কিশোর অপরাধ ঘ) উদ্বেগ

৪। কীভাবে এই পর্যায় থেকে সুমনকে বের করে আনা সম্ভব–

i. ভালো বন্ধু নির্বাচনের মাধ্যমে

ii. অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ না দেয়া

iii সন্তানের সাথে মা–বাবার দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইমনের বয়স ১৩ বছর। সে মাঝে মাঝে স্কুল পালায়, ক্লাসে সে অমনোযোগী। তার স্কুলের শিক্ষক তাদের বাড়িতে এসে জানতে পারেন ইমনের বাবা–মা আলাদা বসবাস করেন।

ক. প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী?

খ. কৈশোরে খাবারে অনাসক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ইমনের বয়সী ছেলেমেয়েদের অপরাধী হয়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমনকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনা সম্ভব কি না–উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২০১৯

নবম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী শিশু

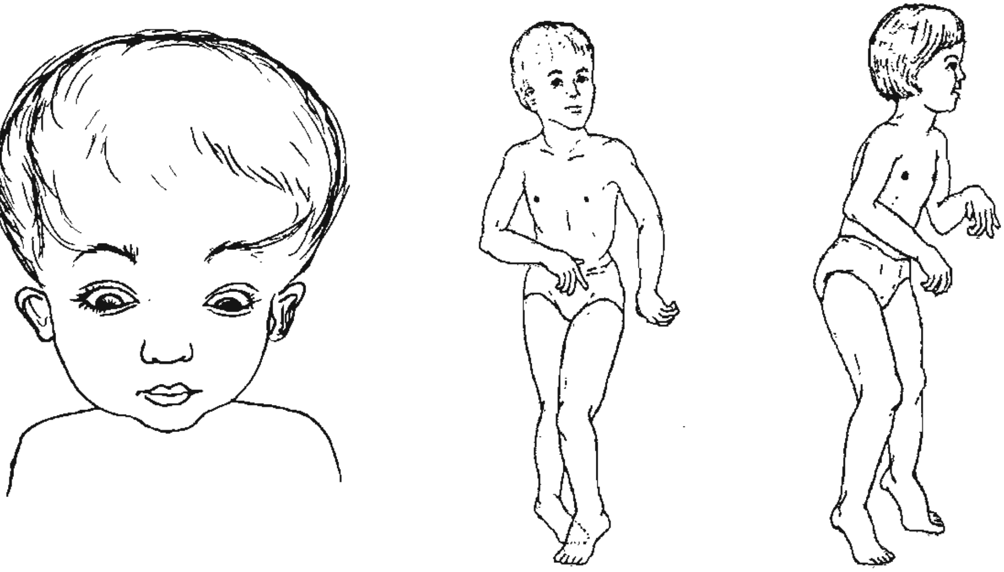

পাঠ ১– প্রতিবন্ধী শিশু

একটি সুস্থ শিশু সবারই কাম্য। পরিবারে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যাদের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়, হাত বা পা নেই, কানে শোনে না, ফলে কথা বলতে পারে না। অনেকে চোখে দেখে না বা কম দেখে। বুদ্ধিমত্তা কম, ফলে এরা সামাজিক আচরণ ও ভাব বিনিময় ঠিকমতো করতে পারে না। এরাই প্রতিবন্ধী শিশু। এই প্রতিবন্ধী শিশুরা আমাদের সমাজেরই একজন, তাই এদের সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে ধারণা থাকলে তাদের প্রতি সবার ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে, প্রতিবন্ধী শিশুটিও নিজেকে সবার থেকে আলাদা বা অসহায় মনে করবে না।

প্রতিবন্ধিতার কারণ : বিভিন্ন কারণে একটি শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে । যেমন – ১। জন্মের পূর্বকালীন কারণ ২। শিশু জন্মের সময়ের কারণ, ৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণ

১। জন্মের পূর্বকালীন কারণ –

শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও গর্ভের পরিবেশ শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে। গর্ভাবস্থায় নানা কারণে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে এবং প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হতে পারে। কারণগুলো হচ্ছে –

- **মায়ের রোগসমূহ –** গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মা যদি জার্মানহাম, চিকেনপক্স, মাম্‌পস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, রুবেলা ভাইরাস, এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর উপর তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়।

এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। এ ছাড়া মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ, কিডনির সমস্যা, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

- **মায়ের অপুষ্টি** – গর্ভবর্তী মা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্তাল্পতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান তবে ভ্রুণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়, ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হয় ।
- **ঔষধ গ্রহণ** – গর্ভাবস্থায় মা যদি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খান, তা শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। অনেক ঔষধ ভ্রুণের অঙ্গ সৃষ্টিতে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে শিশু যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।
- **মায়ের বয়স** – গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স কম বা বেশি দুটিই শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিণত বয়সে প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তাই অপরিণত বয়সে মা হলে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশি বয়সে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলি হ্রাস পায়। তাই ৩৫ বৎসরের পর যে সব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সে সব শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
- **ঘন ঘন খিঁচুনি** – গর্ভাবস্থায় মা যদি ঘন ঘন খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে ও তার মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে ।
- **নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ** – আপন মামাতো, খালাতো, ফুফাতো, চাচাতো ভাইবোন যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের মধ্যে বিবাহ হলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
- **তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ** – গর্ভাবস্থায় বিশেষত প্রথম তিন মাস এক্স–রে বা অন্য কোনো ভাবে মায়ের দেহে যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে তবে গর্ভস্থ ভ্রুণের নার্ভতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- **মা–বাবার রক্তের Rh উপাদান**– মা যদি Rh পজেটিভ আর বাবা যদি Rh নেগেটিভ হয় তা হলে গর্ভস্থ সন্তানের Rh পজেটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে যদি মিল না থাকে তবে তাকে Rh অসংগতা বা Rh incompatibility বলা হয়। এতে মৃত সন্তান হয়। আর যদি শিশু বেঁচে যায় তাহলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মস্তিষ্কের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

২। শিশু জন্মের সময়ের কারণসমূহ–

- শিশুর জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হলে, শিশুর গলায় নাড়ি পেঁচানোর কারণে বা শিশু জন্মের পর পরই শ্বাস নিতে অক্ষম হলে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
- জন্মের সময় মস্তিষ্কে কোনো আঘাত, যেমন– পড়ে যাওয়া বা মাথায় চাপ লাগা ইত্যাদি প্রতিবন্ধিতার কারণ হতে পারে ।

৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণসমূহ –

- নবজাতক যদি জন্ডিসে আক্রান্ত হয় এবং রক্তে যদি বিলিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তবে মস্তিষ্কে কোষের ক্ষতি হয় এবং শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয় ।
- শৈশবে শিশু যদি হঠাৎ করে পরে যায়, মস্তিষ্কে আঘাত পায় বা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।

২০১৫

- পরিবেশের বিষাক্ত পদার্থ, যেমন– পোকামাকড় ধ্বংস করার রাসায়নিক পদার্থ, ফ্লোরাইড, আর্সেনিক মিশ্রিত পানি ইত্যাদি শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- শিশুর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর উপাদানের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিকর উপাদানের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় এবং শিশু মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হতে পারে ।

কাজ – শিশুর জন্ম পরবর্তী প্রতিবন্ধিতা রোধে তুমি কীভাবে তোমার এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে?

পাঠ ২ – প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ

শিশু জন্ম গ্রহণের পর পরই যদি প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায় তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা হ্রাস করা সম্ভব অথবা মারাত্মক প্রতিবন্ধিতা থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। অতি শৈশবে শিশুর হাঁটা, চলা, বসা, কথাবলা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি যথাযথভাবে না হয় তবে বুঝতে হবে শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কা আছে। আবার শিশু যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা বোধ করে, অমনোযোগী হয়, অবাঞ্ছিত আচরণ করে তাহলেও প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কা থাকতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে ।

শারীরিক প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ – বেশির ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শিশু জন্মের পর চোখে দেখেই বোঝা যায়। আবার কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে প্রকাশ পায়।

ঠোঁট কাটা – উপরের ঠোঁট ঠিকমতো গঠিত হয় না। ঠোঁটে ফাঁকা থাকে। ফলে শিশুর খাদ্য গ্রহণে ও কথা বলতে সমস্যা হয়।

ঠোঁট কাটা

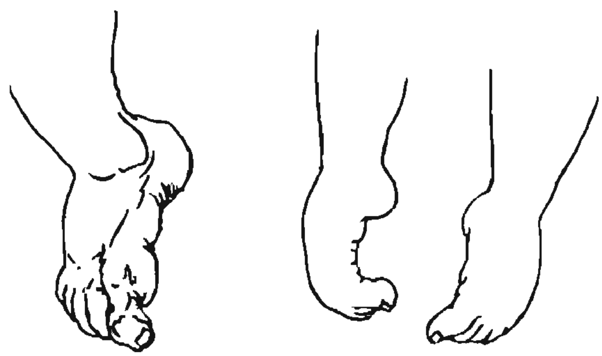

মুগুর পা

কাটা তালু – মুখের ভিতরের উপরের দিকে তালুর হাড় ও মাংসপেশি ঠিকমতো গঠিত হয় না। ফলে খাদ্য গ্রহণ, কথা বলা এবং শোনার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়।

মুগুর পা – একটি বা উভয় পা ভিতর বা পিছন দিকে বাঁকানো থাকে।

স্পাইনা বিফিটা – মেরুদণ্ডের হাড় (কশেরুকা) ঠিকমতো জোড়া লাগে না। ফলে মেরুরজ্জু পিঠের দিকে থলির মতো ফুলে উঠে। হাঁটাচলায় সমস্যা হয়।

সেরেব্রাল পলসি – জন্মের সময় শিশুকে অনেক সময় শিথিল বা নেতানো মনে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য শিশুদের মতো হাত–পা নাড়াচাড়া করতে পারে না। মাথা তোলা, বসা ইত্যাদি খুব ধীরগতিতে হয়। দুধ চুষতে ও গিলতে অসুবিধা হয়।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা গঠন বিকৃতি– শিশু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা অসম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ হাত–পা, আঙ্গুল থাকে না বা গঠন অসম্পূর্ণ থাকে। দেহের গঠনও বিকৃত হতে পারে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ – বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে এক ধরনের অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতাটি স্থায়ী প্রকৃতির। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে যত্ন ও শিক্ষণের মাধ্যমে অনেক শিশুর আচরণের উন্নয়ন ঘটানো যায়। তাই আমাদের উচিত দ্রুত শনাক্ত করে শিশুর যথাযথ যত্ন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা। তবে সব বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা একই ধরনের নয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে সাধারণভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করা যায়।

- হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশগুলো বয়সের তুলনায় কম হয়।
- কোনো বিষয়ে শিশু মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- কোনো নির্দেশনা সহজে বুঝতে পারে না। একই নির্দেশনা বার বার দিতে হয়।
- শিশু কোনো শিক্ষণ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি মল–মূত্র ত্যাগের শিখনও সহজে গ্রহণ করতে পারে না।
- সূক্ষ্ম কোনো কাজ করতে পারে না। অবাঞ্ছিত আচরণ করে।
- সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না। সামাজিক আচরণ ঠিকমতো প্রদর্শন করতে পারে না ।
- ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যায় বা খিঁচুনি হয়।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কিছু রোগ যা দেখে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সহজে শনাক্ত করা যায়।

মাইক্রোসেফালি – মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হয়। এরা গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয় ।

হাইড্রোসেফালি – মাথার ভেতরে তরল পদার্থ জমে থাকে ফলে মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক বড় হয়। এরাও গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয় ।

ডাউন সিন্ড্রোম – গোলাকার মুখোমণ্ডল, তীর্যক চোখ, চোখের পাতা পুরু হয়। জন্মের সময় শিশু দুর্বল ও শিথিল থাকে। হাত, পা ও ঘাড় খাটো হয়। উপুড় হতে, বসতে ও হাঁটতে দেরি হয় এবং এরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।

ক্রিটিনিজম – শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিলম্ব হয়। শিশুর দেহে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কম হয়। ফলে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় – শিশু খুব ধীরে বেড়ে উঠে। কপাল ছোট, মুখমণ্ডল ও হাত–পা ফোলা এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা থাকে।

কাজ : প্রতিবন্ধিতা দ্রুত শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ।

২০১৬

পাঠ ৩ – দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও শ্রবন প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ

চোখের ও কানের নিম্নলিখিত অবস্থা দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। প্রতিবন্ধিতার ধরন শনাক্ত এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ–

- চোখের পাতা লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া। চোখের পাতার কিনারে শুষ্ক আস্তরণ।
- চোখ থেকে তরল পদার্থ বের হওয়া ।
- ঘন ঘন চোখ রগরানো ও চোখ কুঁচকানো।
- বর্ণ চিনতে ভুল করা। বর্ণ উল্টা দেখা।
- লেখার সময় অসম ফাঁক দেওয়া, সারি সোজা রাখতে না পারা।
- কাছের বা দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া বা দেখতে না পারা ।

শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ –

- কানের গঠনগত ত্রুটি বা বিকৃতি থাকলে কান–পাকা রোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকা ।
- উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের অসুবিধা বা কথা কম বলা।
- কিছু শোনার সময় কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করা। রেডিও, টিভি শোনার সময় শব্দ বাড়িয়ে দেওয়া বা কাছে গিয়ে শোনা।
- কোনো প্রশ্ন বার বার করা বা এক প্রশ্নের অন্য উত্তর দেওয়া।
- কথা না বলে হাত ও মুখ ভঙ্গিমার মাধ্যমে বা ইশারায় ভাব বিনিময় করা।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ : প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবন্ধী শিশু যাতে জন্মগ্রহণ না করে এবং শিশু জন্মগ্রহণের পর যাতে প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয় সে দিকে সবার সচেতনতা প্রয়োজন। এই জন্য যা করণীয় তা হচ্ছে–

গর্ভকালীন সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ – গর্ভকালীন মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে দেওয়া। পুষ্টিকর খাবার না খেলে অনেক ক্ষেত্রে শিশু পূর্ণাঙ্গ সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করে অথবা শিশু কম ওজনের হয়। এসব শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভকালীন প্রথম মাসগুলোর পুষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ শিশুর মানসিক শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে।

ঔষধ গ্রহণে সতর্কতা – গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ গ্রহণ ও মাদক, সিগারেট থেকে বিরত থাকলে কিছু কিছু জন্মত্রুটি এবং মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ – বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে হলে গর্ভধারণের আগে রুবেলা ভাইরাস বা জার্মান হাম প্রতিরোধক টিকা নিতে হবে। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের সকল মহিলাকে ধনুষ্টংকার থেকে রক্ষার জন্য টিটি টিকা দিতে হবে।

শিশু কিশোরকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া – ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। শিশুদের গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, হলুদ ফলমূল খাওয়ালে এই প্রতিবন্ধিতা

২০১৩

প্রতিরোধ করা যায়। জন্মগ্রহণের পর পরই মায়ের প্রথম দুধ শিশুকে দিতে হবে। এই দুধে কলেস্ট্রাম নামক হলুদ বর্ণের পদার্থ থাকে, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা – ঘন বসতি ও অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গুরুতর প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করতে হবে ।

বেশি বয়সে সন্তান ধারণ রোধ – বেশি বয়সে সন্তান গ্রহণ বৃদ্ধি প্রতিবন্ধিতার অন্যতম কারণ। তাই বেশি বয়সে সন্তান ধারণ নিরুৎসাহিত করতে হবে ।

রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ রোধ – ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে পারলে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব ।

আঘাত ও রোগ সংক্রমণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ – শিশুর কানে, চোখে, মাথায় আঘাত বা রোগ সংক্রমণ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে ।

রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন – পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম কারণ। সমাজের অনেক লোকই বিভিন্ন ঝুঁকি ও পূর্বসতর্কতামূলক ধারণা না নিয়েই সরাসরি জমিতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পোকামাকড় নিধন করে। এর ফলে অনেকে দৃষ্টিহীন, পক্ষাঘাতগ্রস্ততার শিকার হয় ।

বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশ – আমাদের দেশের অনেক শিশু বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করে। যদিও দেশের শ্রম আইনে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, ফলে আগুনে পুড়ে যাওয়া, অঙ্গহানি, দৃষ্টিহানি হয়। মেরুদণ্ডে আঘাত বা মাথায় আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। আমাদের দেশে অনেক শিশু ধান মাড়াইয়ের সময় ধান ছিটে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়।

কাজ : প্রতিবন্ধিতা রোধে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিতে তোমাদের করণীয় সম্পর্কে ক্লাশে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কতো বছর বয়সের পর কোনো মহিলার প্রথম সন্তান জন্ম নিলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশংকা থাকে?

ক) ২৫ বছর খ) ৩০ বছর

গ) ৩৫ বছর ঘ) ৪০ বছর

২। মায়ের গর্ভধারণকালে কোন রোগটি শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে?

ক) ইনফ্লুয়েঞ্জা খ) সাধারণ জ্বর

গ) চিকেন পক্স ঘ) বাত জ্বর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমির সন্তান জন্মগ্রহণের পর পরই শ্বাস নিতে পারে না। নার্স ছোটাছুটি করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর শিশুটির শ্বাসকার্য চালু করা হয়। এতে শিশুটি প্রাণে রক্ষা পায়। পরবর্তী সময়ে শিশুটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।

৩। শিশুটির জন্মের পরপরই নার্সদের কী করণীয় ছিল?

ক) পানি খাওয়ানো   খ) মধু খাওয়ানো

গ) অক্সিজেন দেওয়া   ঘ) তেল মালিশ করা

৪। রিমির শিশুটি প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ কোনটি?

i) শিশুটির জন্মকালে সময় বেশি লেগেছিল।

ii) শিশুটির মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি হয়েছিল।

iii) শিশুটির মাথায় চাপ লেগেছিল।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii   খ) i ও iii

গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কণার বয়স ৩৫। গর্ভকালীন সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সে খাওয়াদাওয়াও ঠিকভাবে করে না। নিজের প্রতি খেয়াল করে না। শিশুটির জন্মের পর পরই শিশুটির রক্তের বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়। শিশুটি বড় হতে থাকলে সে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, হাঁটাচলা ইত্যাদির বিকাশ কম হয়।

ক. মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকাকে কী বলে?

খ. কোন শিশুকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়?

গ. কণার শিশুকে কোন ধরনের শিশু হিসেবে শনাক্ত করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কণার অসচেতনতা কণার শিশুর এই পরিণতি নিয়ে আসে–এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

গ – বিভাগ

খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা–

- খাদ্যের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের গঠন, উৎস, কার্যকারিতা ও শ্রেণিবিভাগ করতে পারব ;
- খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত রোগ চিহ্নিত করতে পারব ;
- খাদ্য পরিপাক– প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব ;
- কিশোর বয়সে খাদ্যের চাহিদা ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব ;
- নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
- ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও উচ্চরক্তচাপ রোগ সম্পর্কে জেনে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনযাপন প্রণালি বর্ণনা করতে পারব ;
- খাদ্য প্রস্তুতে রেসিপির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব ;
- খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

দশম অধ্যায়

খাদ্যের কাজ ও উপাদান

পাঠ–১ : খাদ্যের কাজ

জীবনধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলোই আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। আমাদের শরীরে খাদ্য গ্রহণের ফলে যে কাজগুলো সম্পন্ন হয় তা হলো–

১। দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন

২। ক্ষয় পুরণ

৩। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান

৪। দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ

৫। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি

১। **দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন** – খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রোটিন দেহ গঠনের কাজ করে থাকে। শিশুর শরীর গঠনের জন্য পুষ্টি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। একটি মাত্র কোষ থেকে মায়ের পেটে শিশুর বৃদ্ধি ঘটে। কোষ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২টি কোষে বিভক্ত হয়। এভাবে আবার নতুন কোষ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ কোষ এবং আরও পরে কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধির জন্য পুষ্টির প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ খাদ্যের কাজ হলো শরীর গঠনের মাধ্যমে বৃদ্ধি সাধন করা। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান এই কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

২। **ক্ষয় পুরণ** – প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, আর এই ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ পুর্নগঠন করার কাজও খাদ্যের। প্রতিনিয়তই পুরনো কোষের মৃত্যু ঘটে যার ফলে কিছু পুষ্টি উপাদান শরীর থেকে বের হয়ে যায় আর কিছু পুষ্টি উপাদান শরীরে থেকে যায় যা নতুন কোষ গঠনে অংশ নেয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানের সাথে ওইগুলো যুক্ত হয়ে নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। আমরা যদি একজোড়া জুতা ক্রমাগত পরতে থাকি, তাহলে তার তলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একসময় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু জুতা ছাড়া যদি হাঁটা হয় তাহলে কিন্তু পায়ের তলা জুতার মতো ক্ষয় হয়ে যায় না। কারণ প্রতিনিয়তই মৃত কোষ বা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলোর জায়গায় নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে এবং ক্ষয়পূরণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে অসুস্থ থাকার পর বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে নতুন কোষ তৈরির মাধ্যমে ক্ষতস্থানের ক্ষয়পূরণ ঘটে। তাই প্রত্যেক মানুষের শরীরেই খাদ্য হতে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো এই ক্ষয়পূরণের কাজ করে শরীরকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

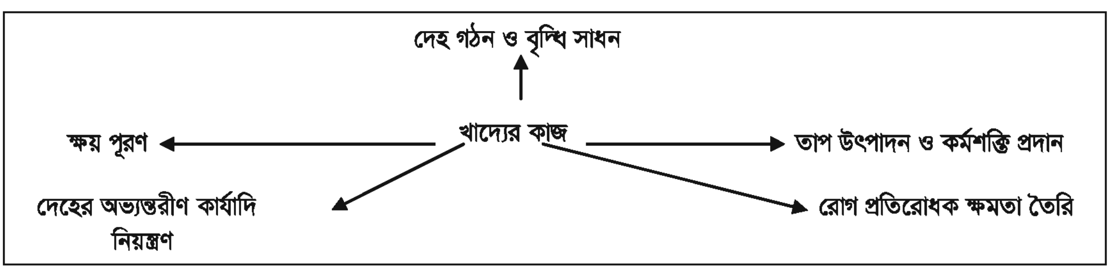

খাদ্যের কাজ

৩। **তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান** – একটি গাড়ির ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে পেট্রল বা গ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই জ্বালানি পুড়ে শক্তি তৈরি হয়, যার ফলে গাড়ি চলতে পারে। আমাদের শরীরকেও এই গাড়ির ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করতে পারি। আমাদের শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরের কোষে জ্বালানির মতো পুড়ে শক্তি তৈরি করে। ফলে আমরা সচল আছি এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারছি। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরে যে তাপশক্তি উৎপন্ন করে, তার ফলে আমরা কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করি। বেঁচে থাকার জন্য রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস–প্রশ্বাস গ্রহণ, খাদ্যের পরিপাক এবং মল–মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ, যা সম্পাদন করতে শক্তির প্রয়োজন। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখনও শক্তি খরচ হয়। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষার জন্য, টিসু গঠনের জন্য, শরীরের বিভিন্ন তরল তৈরি, মায়ের দুধ তৈরি, সব ধরনের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া চলাফেরা, খেলাধুলা, কথা বলা এবং সব রকমের বাহ্যিক কাজের জন্যও শক্তির প্রয়োজন।

৪। **দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে** – আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে, যার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্য গ্রহণের পর যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে তা হলো– শক্তি উৎপাদণের জন্য পুষ্টি উপাদান পুড়ে, পেশির সঞ্চালনের জন্য শক্তি ব্যবহৃত হয়, নতুন কোষ গঠন করে, বিভিন্ন ধরনের দেহ তরল উৎপাদন ও নিঃসরণ হয় ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্পাদন করতে কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন– খাদ্যের ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স, খনিজ লবণ, প্রোটিন ও পানি এগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত করার কাজে সহায়তা করে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে বিভিন্ন প্রোটিন ও ধাতব লবণের ভূমিকা রয়েছে। এই এনজাইম ও হরমোনগুলো শরীরের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিক্রিয়া বা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৫। **রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি** – প্রতিদিনই আমাদের শরীর বিভিন্ন ধরনের অণুজীব দিয়ে বা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য চাই শরীরের নিজস্ব স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। আর বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জিত হয়। খাদ্যের প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে শরীর সহজেই সুস্থ থাকে অর্থাৎ শরীরের সঠিক সুস্থতা রক্ষা হয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। পুষ্টির অভাবে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং সহজেই অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে কিছু কোষের মৃত্যু ঘটে এবং কখনো কখনো টিসুগুলো ধ্বংস হতে পারে। শরীরে নতুন কোষ গঠনের মাধ্যমে টিসুর ক্ষয়পূরণ করে থাকে, এক্ষেত্রে শক্তি, প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলতে পারি যে, খাদ্য শুধু ক্ষুধাই নিবৃত করে না, শরীরে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

কাজ – বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আমাদের শরীরে কী কী কাজ করে থাকে তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখ।

পাঠ ২ – খাদ্যের উপাদান– প্রোটিন

খাদ্যকে ভাঙলে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায়। খাদ্যের মধ্যে যেগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাদের পুষ্টি উপাদান বা খাদ্য উপাদান বলে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলো প্রধানত ছয় প্রকার। যথা–

(১) প্রোটিন	(২) কার্বোহাইড্রেট	(৩) ফ্যাট	(৪) ভিটামিন	(৫) ধাতব লবণ	(৬) পানি

এগুলো আমাদের শরীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ছয়টি পুষ্টি উপাদানের প্রতিটিই আমাদের দেহে একাধিক কাজ করে থাকে। আমরা এই ছয়টি পুষ্টি উপাদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রোটিন

'প্রোটিন' শব্দটা গ্রিক শব্দ প্রোটিওজ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সর্বপ্রথম অবস্থান। যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব সেখানেই থাকে প্রোটিন। তাই প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব না। প্রাণি এবং উদ্ভিজ জগতে প্রোটিন একটা প্রধান অংশ। এজন্য প্রোটিনকে মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রোটিনের গঠন – সব প্রোটিনই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালফার, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ যুক্ত থাকে। প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে প্রথমে অ্যামাইনো এসিড এবং পরে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়।

অ্যামাইনো এসিড – বড় আকারের এক একটা প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এসিড অণু পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকটা অণুতে কমপক্ষে একটা অ্যামাইনো দল ($-NH_2$) ও একটা কার্বক্সিল দল ($-CooH$) বিদ্যমান থাকে। এদের অ্যামাইনো এসিড বলে। অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড ও অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড।

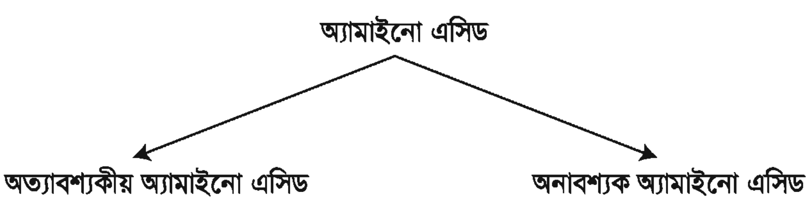

ক) **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড** – কতোগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে তৈরি হয় না ফলে এই অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজন মিটানোর জন্য খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এই সমস্ত অ্যামাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

খ) **অনাবশ্যক আমাইনো এসিড** – কতোগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে তৈরি হয় ফলে এই অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজন মেটানোর জন্য খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ না করলেও কোনো সমস্যা হয় না। ওই সমস্ত অ্যামাইনো এসিডকে অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড বলে।

প্রোটিনের শ্রেণি বিভাগ

(ক) উৎস অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ –

উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় –

(১) **প্রাণিজ প্রোটিন** – যে প্রোটিনগুলো প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন।

(২) **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন** – উদ্ভিজ জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলে। যেমন– ডাল, বাদাম, সয়াবিন, সিমের বিচি ইত্যাদি খাদ্যের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

(খ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস –

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমানের ওপর ভিত্তি করে ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) **সম্পূর্ণ বা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন** – যে সব প্রোটিনে অত্যাবশকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো দেহের প্রোটিন গঠনের উপযোগী অনুপাতে বর্তমান থাকে সেই প্রোটিনকে সম্পূর্ণ প্রোটিন বা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলে। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিডগুলো দেহের প্রোটিন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে বর্তমান থাকে। এই জন্য এই প্রাণিজ প্রোটিনগুলো সম্পূর্ণ বা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন।

(২) **আংশিক পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন** – কোনো কোনো প্রোটিনে একটা বা দুইটা অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড দেহ গঠনের জন্য উপযোগী অনুপাতে থাকে না ফলে দেহের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এই সব প্রোটিনকে কম উপযোগী বা আংশিক পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলে। যেমন–চাল, ডাল, আটা, বাদাম, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভিদজাত প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো কম পরিমাণে থাকে। যেমন– ডালে মেথিওনিন, চালে লাইসিনের পরিমাণ কম থাকে।

(৩) **অসম্পূর্ণ বা তৃতীয় শ্রেণির প্রোটিন** – যে প্রোটিনে দেহের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো এসিডগুলো পরিমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে না সেগুলোকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। যেমন– ভুট্টার প্রোটিন জেইন (Zein)।

প্রোটিনের উৎস–

প্রাণিজ প্রোটিন – মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির, ছানা ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন – বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম, চাল, গম ইত্যাদিতে প্রোটিন পাওয়া যায়।

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

প্রোটিনের কাজ –

১। **দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন** – প্রোটিনের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে দেহ কোষের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করা। আমাদের দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন দেহযন্ত্র, রক্ত কণিকা হতে শুরু করে দাঁত, চুল, নখ পর্যন্ত প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

২। **ক্ষয় পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে** – আমাদের কোষগুলি প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে নতুন কোষ গঠন করে ক্ষয়পূরণের কাজ করে প্রোটিন। কোনো ক্ষতস্থান সারাতেও প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে।

৩। **তাপশক্তি উৎপাদন** – ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন দেহে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে তখন প্রোটিন তাপ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।

৪। **দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি অর্জন** – বাইরের বিভিন্ন রোগজীবাণু নানা–ভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে নানা রকমের রোগব্যাধি জন্মাতে পারে। এইসব রোগ–জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য দেহে তাদের বিরোধী পদার্থ বা এন্টিবডি তৈরি করা প্রোটিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ।

৫। **মনন শক্তির বিকাশ** – মানসিক বিকাশেও প্রোটিন অপরিহার্য। মানসিক বিকাশ বা মস্তিস্কের বিকাশের সময় প্রোটিনের অভাব হলে বুদ্ধির বিকাশ ব্যহত হয়।

৬। **দেহাভ্যন্তরের কাজ নিয়ন্ত্রণ** – প্রোটিন দিয়ে তৈরি এনজাইম, হরমোন, ইত্যাদি দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম সুপরিচালিত করে থাকে।

৭। **প্রয়োজনীয় উপাদান পরিবহন করে** – রক্তের প্রোটিন হিমোগ্লোবিন বাতাস থেকে প্রাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

৮। **দেহে পানির সমতা রক্ষা করে** – প্লাজমা বা রক্তের প্রোটিন দেহে পানির সমতা বজায় রাখে।

অভাবজনিত লক্ষণ–

শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে–

• দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। • ওজন কমে যায়। • চামড়া খসখসে হয়। • চুলের রং ফ্যাকাশে হয়। • মেজাজ খিটখিটে হয়।	• মানসিক বিকাশ পিছিয়ে পড়ে। • প্রোটিনের ঘাটতিতে এনজাইমের সংশ্লেষণ কমে যায় • খাদ্য ঠিকমতো পরিপাক হয় না, বদহজম হয়। • রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই লক্ষণগুলো দেখা দেয়, যাকে প্রাক– কোয়াশিয়রকর অবস্থা বলে।

ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশু

কোয়াশিয়রকরে আক্রান্ত শিশু

২০১৯

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে শিশুর উপরের লক্ষণগুলের পাশাপাশি হাত–পা ফুলে যায়, মুখে পানি আসে এই অবস্থাকে কোয়াশিয়রকর বলা হয়। সাধারণত ১–৪ বছরের শিশুরাই এর শিকার হয়।

এ ছাড়া প্রোটিন ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব হলে ম্যারাসমাস দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে শিশুর শরীর খুবই শুকিয়ে যায়। বৃদ্ধদের মতো চেহারা হয় ও বর্ধন ব্যাহত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অভাব –

- শোথ (হাতে পায়ে পানি আসে) হতে পারে।
- রক্তসল্পতা দেখা দিতে পারে।
- রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়।

কাজ – আমাদের দেহে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

পাঠ–৩ : কার্বোহাইড্রেট

আমাদের দৈনিক খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এই উপাদান অন্যান্য উপাদানের চেয়ে দামেও সস্তা। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য গুরুত্ব বেশি।

কার্বোহাইড্রেটের গঠন –

সকল কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সবন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণত ২ঃ১ অনুপাত অর্থাৎ এইগুলো পানিতে যে অনুপাতে থাকে কার্বোহাইড্রেটেও সেই অনুপাতে থাকে। তাই কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রেট অব কার্বন (Hydrate of carbon) বা কার্বনের পানি বলে। অর্থাৎ বলা যায় কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনযুক্ত কোনো পদার্থে যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ঃ১ অনুপাতে থাকে তবে ওই পদার্থকে সাধারণত কার্বোহাইড্রেট বলা হয়।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ – কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) মনোস্যাকারাইড	(২) ডাইস্যাকারাইড	(৩) পলিস্যাকারাইড

১। **মনোস্যাকারাইড** – যে সব কার্বোহাইড্রেট একটি মাত্র সরল শর্করার অণু দিয়ে গঠিত এবং একে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে ক্ষুদ্রতম কোনো সরল শর্করার অণু পাওয়া যায় না তাকে মনোস্যাকারাইড বা এক–শর্করা বলে। যেমন– গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ।

(ক) **গ্লুকোজ (Glucose)** – এটি কার্বোহাইড্রেটের সবচেয়ে বেশি পরিচিত সরল হাইড্রোকার্বন। গ্লুকোজ পাওয়া যায়– দানা শস্যে, কিছু পরিমাণ মূলে, আঙুরে ও বিভিন্ন ফলে।

(খ) **ফ্রুকটোজ (Fructose)** – মধু, পাকা মিস্টি স্বাদের ফলে এবং কিছু কিছু সবজিতে ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।

(গ) **গ্যালাকটোজ (Galactose)** – দুধের চিনি (ল্যাকটোজ) ভেঙে গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়। উদ্ভিদে গ্যালাকটোজ পাওয়া যায় না।

২। **ডাইস্যাকারাইড** – যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ২টি মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা পাওয়া যায় তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন– সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ।

২০১৫

(ক) সুক্রোজ (Sucrose) – সাধারণ চিনি, আম, বিট, নানা প্রকার সবজি ও ফলের রসে সুক্রোজ পাওয়া যায়। সুক্রোজ ভাঙলে ১ অণু গ্লুকোজ ও ১ অণু ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।

সুক্রোজ ⟶ গ্লুকোজ + ফ্রুকটোজ

(খ) ল্যাকটোজ (Lactose) - দুধে এই চিনি পাওয়া যায়। ল্যাকটোজকে ভাঙলে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়।

ল্যাকটোজ (দুধের চিনি) ⟶ গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ

(গ) মলটোজ (Maltose) - স্টার্চ ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী স্তরে মলটোজের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মল্টোজ ভাঙলে দুই অনু গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

মল্টোজ ⟶ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

৩। পলিস্যাকারাইড

যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লোষিত করলে অনেক একক মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাকে পলিস্যাাকারাইড বা বহু শর্করা বলা হয়। যেমন– (ক) স্টার্চ (খ) গ্লাইকোজেন ও (গ) সেলুলোজ।

(ক) স্টার্চ (Starch) – প্রাণিজগতের শক্তির প্রাথমিক উৎস হলো স্টার্চ বা শ্বেতসার। উদ্ভিদে কার্বহাইড্রেট স্টার্চ হিসেবে সঞ্চিত হয়। এদের ভাঙলে অনেক গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। চাল, গম, আলু, কচু ক্যাসাভা ইত্যাদি খাদ্যের অধিকাংশই স্টার্চ। দেহের মধ্যে এই স্টার্চগুলি এনজাইমের সাহায্যে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। প্রানিজগতে স্টার্চ পাওয়া যায় না।

স্টার্চ ⟶ গ্লুকোজ n + গ্লুকোজ n (এখানে, n – অনেক অণু)

(খ) গ্লাইকোজেন (Glycogen) – প্রাণী দেহে সঞ্চিত কার্বোহাইডেটের নাম গ্লাইকোজেন। অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গ্লাইকোজেন হিসেবে প্রাণীর যকৃতে ও পেশিতে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিজ জগতে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায় না। আমরা যখন অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকি বা কঠিন পরিশ্রম করি তখন গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং আমাদের প্রয়োজন মেটায়।

গ্লাইকোজেন ⟶ অনেক গ্লুকোজ অণু

(গ) সেলুলোজ (Cellulose) – সেলুলোজ অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই উপাদান কেবল উদ্ভিদে পাওয়া যায়, প্রাণিজগতে পাওয়া যায় না। খাদ্য শস্য যেমন– ধান, গম, যব, ছোলা এবং শাকসবজি প্রভৃতির উপরের কঠিন অংশটা সেলুলোজ। মানবদেহে সেলুলোজ ভাঙার মতো এনজাইম না থাকায় আমাদের দেহ সেলুলোজকে ভাঙতে পারে না। তবে মল নিষ্কাশণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্লুকোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ ----------

\ ----------------সেলুলোজ---------------------------- /

কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস– নিচে খাদ্যগুলোকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থেকে কম অনুযায়ী সাজানো হলো–

কার্বোহাইড্রেট–জাতীয় খাদ্য

১। চিনি, গুড়, মিছরি, ক্যান্ডি, চকলেট, মিষ্টি ।

২। সাগু, এরারুট ।

৩। চাল, ভুট্টা, যব, গম।

৪। আলু

৫। বিভিন্ন ধরনের শুকনা ফল যেমন– খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি।

৬। বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম।

৭। টাটকা ফল, আঙুর, কলা, আপেল, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

৮। সবুজ শাকসবজি, যেমন– লালশাক বা পুঁইশাক, কলমি শাক, পালং শাক, বাঁধাকপি, পটোল, কুমড়া ইত্যাদি।

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০–৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত।

কার্বোহাইড্রেটের কাজ –

(১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

(২) কার্বোহাইড্রেটসমূহ স্নেহ পদার্থ দহনে সহায়তা করে আমাদের কিটোসিস নামক রোগ হতে রক্ষা করে।

(৩) প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণে সহায়তা করে।

(৪) অন্ন প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ থেকে বিরত রাখে, ফলে প্রোটিনের খরচ হয় না। কার্বোহাইড্রেটের এই কাজকে প্রোটিনের মিতব্যয়ী কাজ (Protein sparing action) বলা হয়।

(৫) কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতিতে এক প্রকার জীবাণু অন্ত্রে ভিটামিন 'কে' এবং ভিটামিন 'বি' উৎপন্ন করে ওই সমস্ত ভিটামিনের অভাব কিছুটা পূরণ করে থাকে ।

(৬) সেলুলোজ –জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

(৭) কার্বোহাইড্রেট যকৃৎকে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত বিষক্রিয়া হতে রক্ষা করে।

(৮) মস্তিষ্কের কাজ সচল রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ–জাতীয় কার্বোহাইড্রেট–এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের অভাবের ফল –

(১) কার্বোহাইড্রেটের অভাবে দেহে তাপশক্তির ঘাটতি হয়। ফলে কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।

(২) আহারের সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

কাজ – কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেট বেশি উপকারী এবং কেন?

পাঠ–৪ : লিপিড বা ফ্যাট ও ভিটামিন

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহপদার্থ বা ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। প্রায় সব প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুর মধ্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলোকে ভাঙলে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায়।

স্নেহপদার্থের শ্রেণিবিভাগ –

ক) স্নেহপদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ – স্নেহ পদার্থকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **কঠিনস্নেহ** – যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিকভাবে ও চাপে কঠিন আকৃতির হয় তাদেরকে কঠিনস্নেহ বলে। যেমন– প্রাণির চর্বি, মাখন ইত্যাদি।

(২) **তরলস্নেহ** – যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে তাকে তরল স্নেহ বলে। যেমন– সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

খ) উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ – উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়–উদ্ভিজ্জস্নেহ ও প্রাণিজস্নেহ

(১) **উদ্ভিজ্জস্নেহ** – যেসব স্নেহপদার্থ উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদের উদ্ভিজ্জস্নেহ বলে। যেমন– নারিকেল তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

(২) **প্রাণিজস্নেহ** – যে সকল স্নেহপদার্থ প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদের প্রাণিজস্নেহ বলে। যেমন– গরুর চর্বি, ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

খাদ্য উৎস –

(১) **প্রথম শ্রেণির স্নেহ** – এখানে স্নেহের পরিমাণ ৯০%–১০০%। সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, সরিষার তেল, কড মাছের তেল, শার্ক মাছের তেল ইত্যাদি।

(২) **দ্বিতীয় শ্রেণির স্নেহ** – এখানে স্নেহের পরিমাণ ৪০%–৫০%। বিভিন্ন ধরনের বাদাম, যেমন– চীনা বাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি।

(৩) **তৃতীয় শ্রেণির স্নেহ** – এখানে স্নেহের পরিমাণ ১৫%–২০%। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি। আমাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরির ২০%–২৫% স্নেহপদার্থ থেকে গ্রহণ করা উচিত।

স্নেহপদার্থের কাজ –

১। স্নেহপদার্থের প্রধান কাজ হলো তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। ১ গ্রাম স্নেহপদার্থ থেকে দেহে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। দেহে শক্তির উৎস হিসেবে জ্বালানিরূপে সঞ্চিত থাকে।

২। কোষ প্রাচীরের সাধারণ উপাদান হিসেবে কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড জাতীয় স্নেহ পদার্থ গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে– কে দ্রবীভূত করে দেহের গ্রহণ উপযোগী করে তোলে।

৪। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাগুলোকে সংরক্ষণের জন্য স্নেহপদার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৬

৫। দেহ থেকে তাপের অপচয় রোধ করে শরীর গরম রাখে।

৬। স্নেহপদার্থ প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড সরবরাহ করে চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

অভাবজনিত ফল –

১। স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব দেখা যায়।

২। ত্বক শুকনো ও খসখসে ভাব ধারণ করে। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের অভাবে শিশুদের দেহে একজিমা দেখা দিতে পারে।

পাঠ–৫ : ভিটামিন

দীর্ঘদিন গবেষণা করে লক্ষ করা গেছে যে আমাদের প্রকৃতিজাত খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট ছাড়াও এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান রয়েছে যার অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন– বেরিবেরি, রাতকানা, রিকেট, এনিমিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা যায় এবং নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপাদান গ্রহণে তা ভালো হয়ে যায়। এই উপাদানগুলো হচ্ছে ভিটামিন। অর্থাৎ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ যা জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু এদের উপস্থিতি ছাড়া জীবদেহের শক্তি উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয় ও সুষ্ঠু স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এই যৌগগুলোর অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা যায়। দেহে এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানটার চাহিদা কিন্তু খুব সামান্য। কিন্তু এর কাজকে সামান্য বলা যায় না। কারণ দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি কাজই ভিটামিনের উপস্থিতি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

ভিটামিনের শ্রেণিবিভাগ – দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ভিটামিন সমৃদ্ধ শাক–সবজি ও ফলমূল

১) **চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন –** যে ভিটামিনগুলো চর্বিতে বা চর্বি দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় তাদের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন ৪ টি, যথা– এ, ডি, ই, ও কে।

২) **পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন –** যে ভিটামিনগুলো পানিতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু চর্বিতে অদ্রবণীয় তাকে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন প্রধানত ২ টি। ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স ও ভিটামিন–সি।

২০১৮

ভিটামিনের কাজ –

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।
- দেহের বৃদ্ধিসাধন করে। গর্ভাবস্থায় শিশুর গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।
- প্রাণির বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা ঠিক রাখে।
- চোখ ও ত্বকসহ বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।
- রক্ত গঠনে সাহায্য করে।
- শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখে।

কাজ – আমাদের দেহের জন্য স্নেহপদার্থ কেন প্রয়োজন বর্ণনা কর।

কাজ – মানবদেহে ভিটামিন কী কী কাজ করে লেখ।

পাঠ–৬ : ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'

ভিটামিন 'এ'

ভিটামিন–এ চর্বিতে দ্রবণীয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন। ভিটামিন এ–এর রাসায়নিক নাম রেটিনল। এটি বর্ণহীন ও তাপে কম নষ্ট হয়। তবে উচ্চ তাপে ও অতিবেগুনি রশ্মিতে নষ্ট হয়।

ভিটামিন এ'র কাজ–

• চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখার জন্য এই ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। • জীবদেহের সার্বিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। • ত্বক ও ঝিল্লির কোমলতা ও সজীবতা রক্ষা করে।	• বিভিন্ন গ্রন্থিকে স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম রাখে। • বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আক্রমণ রোধ করে। • রাতের বেলায় বা অন্ধকারে অল্প আলোতে দেখতে ভিটামিন–এ সহায়তা করে।

খাদ্য উৎস – ভিটামিন এ এর উৎসকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) **প্রাণিজ উৎস** – ভিটামিন এ প্রাণিজ খাদ্যে এবং কোনো কোনো প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ডিম, কলিজা, চর্বিযুক্ত মাছ, সামুদ্রিক মাছ এর কলিজায়, হ্যালিবার্ট ও শার্ক ইত্যাদি মাছের তেল, ইলিশ মাছ, ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। দুধে বিশেষ করে কোলেস্ট্রামে যথেষ্ট ভিটামিন এ থাকে।

(২) **উদ্ভিজ্জ উৎস** – উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে হলুদ, কমলা বা হলদে–কমলা বর্ণের এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ বা রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেগুলো খাওয়ার পর মানবদেহে ভিটামিন–এ, তে রূপান্তরিত হয়। এদের ক্যারটিন বা প্রাক ভিটামিন–এ বলে। সবুজ বা রঙিন শাক সবজি, হলুদ ফলমুল, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, মিষ্টি আলু, পাকা পেঁপে, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রাক ভিটামিন–এ বিদ্যমান।

অভাবজনিত লক্ষণ –

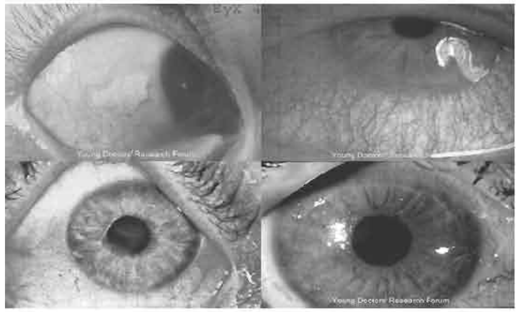
ভিটামিন–এ'র অভাবে সৃষ্ট চোখের বিভিন্ন রোগ

১) ভিটামিন– এ এর অভাবে রাতকানা রোগ দেখা দেয়। এই রোগ হলে রাতের বেলায় অল্প আলোতে বা অন্ধকারে দেখার অসুবিধা ঘটে।

২) এ ছাড়া ভিটামিন–এ এর অভাবে চোখের ঝিল্লি শুষ্ক হয়ে প্রদাহ দেখা দেয়, যাকে জেরোপথ্যালমিয়া বলে।

৩) ভিটামিন এ–এর অভাবে চোখের পর্দার অস্বচ্ছতাও হতে পারে। একে কেরাটোম্যালেসিয়া বলে।

৪) এই ভিটামিনের অভাবে চামড়ার শুষ্কতা হতে পারে।

৫) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৬) ভিটামিন–এ এর ঘাটতি হলে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

ভিটামিন–'ডি'

ভিটামিন–ডি এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিফেরোল। এটা রিকেট রোগ প্রতিরোধ করে বলে এই ভিটামিনকে রিকেট রোগ প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। এটা চর্বিতে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় নয়। তাপে নষ্ট হয় না।

ভিটামিন–ডি এর কাজ –

- ভিটামিন–ডি অন্ত্র হতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইত্যাদি লবণ শোষণে সহায়তা করে।
- দাঁত ও হাড়ের গঠন ও পুস্টিসাধনে ভিটামিন–ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- প্যারাথাইরয়েড হরমোনের কাজে সহায়তা করে।
- রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

উৎস –

- কড মাছের তেল, শার্ক মাছের তেল, হ্যালিবার্ড মাছের তেল ভিটামিন–ডি এর প্রধান উৎস। এ ছাড়া লিভার, দুধ, দুধজাত খাদ্য, ডিমের কুসুম ইত্যাদি এই ভিটামিনের উৎস।
- আমাদের ত্বকের নিচে কোলেস্টেরল থাকে। সুর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সহায়তায় কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন–ডি উৎপন্ন হয়।

অভাবজনিত রোগ –

রিকেটে আক্রান্ত শিশুর পায়ের হাড়গুলো বেঁকে ধনুকের মতো আকৃতির হয়েছে।

১) রিকেট – ভিটামিন–ডি এর অভাবে শিশুদের রিকেট হয়। এই রোগে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়–

- শিশুর হাড় নরম ও অপরিণত হওয়ার ফলে শরীরের বৃদ্ধি হয় না।
- পায়ের হাড়গুলো বেঁকে ধনুকের মতো আকৃতির হয়।
- বুকটা সরু ও অস্বাভাবিক আকৃতি লাভ করে।
- দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের গঠন ব্যহত হয়।
- ছোট শিশুদের হাঁটতে দেরি হয়।

২০১৯

২) অস্টিওম্যালেসিয়া – এই রোগ গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা ও বয়স্কদের হয়। এর লক্ষণগুলো হলো–

- হাড় হতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্ষয় হয়ে যায় ফলে ক্রমশ হাড় নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- এই রোগে ক্রমশ পা দুর্বল হয়ে পড়ে ও হাতের উপর ভর দিয়ে চলতে হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বেঁকে যেতে পারে।
- কোমরে ও পায়ে ব্যথা হতে পারে।

কাজ – ভিটামিন–এ ও ডি এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাঠ–৭ : ভিটামিন 'ই' ও'কে'

ভিটামিন 'ই'

ভিটামিন–ই এর আর এক নাম টোকোফেরল। এটি চর্বিতে দ্রবণীয় ও পানিতে অদ্রবণীয় একটা ভিটামিন।

উৎস – ভোজ্য তেল যেমন– সয়াবিন তেল, গমের জার্ম তেল ভিটামিন–ই–এর সবচেয়ে ভালো উৎস। গমের অংকুর, অংকুরিত ছোলা, মটরশুঁটি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শাকসবজি, ফল, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদিতে ভিটামিন–ই পাওয়া যায়।

ভিটামিন–ই এর কাজ–

- এই ভিটামিন কোষগুলোকে জারণজনিত বিক্রিয়ার কারণে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।
- কোষের মেমব্রেনের গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।
- দেহের কোষে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডগুলোকে জারণের হাত থেকে রক্ষা করে।
- লোহিত রক্ত কণিকাকে বিভিন্ন জারক পর্দাথের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- প্রাণির বন্ধ্যত্ব রোধ করে।
- ভিটামিন–এ এবং ক্যারটিনের জারণ রোধ করে।
- যকৃৎকে বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদানের প্রভাবে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে ভিটামিন–ই।
- চোখের ছানি পড়া রোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা –

- স্ত্রী ও পুরুষের বন্ধ্যত্ব দেখা দিতে পারে।
- অকাল বার্ধক্য দেখা দিতে পারে ফলে দেহ ও মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
- ভিটামিন–ই–এর অভাবে অসময়ের গর্ভস্রাব হয়ে গর্ভস্থ ভ্রুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কাজ – ভিটামিন–ই আমাদের দেহে কী ধরনের কাজ করে লেখ।

ভিটামিন–কে

ভিটামিন–কে –এর রাসায়নিক নাম ফাইটাল ন্যাপথোকুইনোন। একে রক্তক্ষরণ নিবারক ভিটামিন বা অ্যানটি হেমারেজিক ভিটামিনও বলা হয়। এটি হলুদ বর্ণের, চর্বিতে দ্রবণীয় এবং পানিতে অদ্রবণীয় একটা ভিটামিন। তাপে, বাতাসে ও আর্দ্রতায় ভিটামিন–কে নষ্ট হয় না, তবে আলোতে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন–কে খুব কম নষ্ট হয়।

উৎস – উদ্ভিদের সবুজ পাতা ও গাঁজানো খাবারে ভিটামিন–কে পাওয়া যায়। সবুজ রঙের শাক, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন–কে পাওয়া যায়। লেটুস পাতা, পালং শাক, টমেটো, শালগম পাতা, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে ভিটামিন কে পাওয়া যায়। প্রাণীজ উৎসের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ–জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন–কে থাকে।

ভিটামিন–কে এর কাজ–

- ভিটামিন–কে এর প্রধান কাজ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করা। এই ভিটামিনের প্রভাবে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রোথম্বিন নামক প্রোটিন তৈরি হয়।
- পিত্তের স্বাভাবিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন–কে এর ভূমিকা রয়েছে।

অভাবজনিত ফল –

• রক্তে প্রোথম্বিনের পরিমাণ কমে যায়। • পিত্ত নিঃসরণ ব্যাহত হয়।	• কেটে গেলে বা ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না।

কাজ – ভিটামিন কে এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাঠ–৮ : ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স – বি১ ও বি২

ভিটামিন ‘বি’ কোনো একক ভিটামিন না। প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভিটামিনকে একসাথে ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স বলা হয়। এর মধ্যে নিচে উল্লেখযোগ্য ৬ টি বি–ভিটামিনের নাম দেওয়া হলো।

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স	
• থায়ামিন বা ভিটামিন বি$_১$ • রিবোফ্লাভিন বা ভিটামিন বি$_২$ • নায়াসিন	• ফলিক এসিড • ভিটামিন বি$_৬$ • ভিটামিন বি$_{১২}$

ভিটামিন–বি১

ভিটামিন–বি১এর রাসায়নিক নাম থায়ামিন। এই ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় ও বেশি তাপে নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য বেশি ধুলে এবং অনেক বেশি তাপে বেশি সময় ধরে রান্না করলে বি১ নষ্ট হয়ে যায়।

ভিটামিন–বি১ এর কাজ	
• থায়মিনের প্রধান কাজ হলো কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তি মুক্ত করে। • স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখতে সাহায্য করে।	• স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখে । • হৃদপিন্ডের স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

খাদ্য উৎস –

উদ্ভিজ উৎস – ঢেঁকিছাঁটা চাল, আটা, ছোলার ডাল, বাদাম, সয়াবিন, মটর ডাল, আলু ইত্যাদি।

প্রাণিজ উৎস – যকৃৎ, হৃৎপিন্ড, বৃক্ক, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা –

ক) থায়ামিনের অল্প ঘাটতি হলে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়–

• শারীরিক ও মানসিক অবসাদ	• ক্ষুধামন্দা
• খিটখিটে মেজাজ	• ওজন হ্রাস ও দুর্বলতা
• অনিদ্রা	• বুক ধড়ফড় দেখা দেয়

খ) থায়ামিনের খুব বেশি অভাব হলে আমাদের দেহে বেরিবেরি নামক রোগের সৃষ্টি হয়। বেরিবেরি ২ ধরনের হয়। যথা – ভিজা বেরিবেরি ও শুকনা বেরিবেরি।

বেরিবেরি লক্ষণগুলো হলো –

- হাত–পা অবশ হয়ে যায়।
- হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা দেখা যায়।
- ভিজা বেরিবেরিতে হাত পায়ে পানি জমে যায়।
- স্নায়ুতন্ত্র পীড়িত হয় ও দেহে প্যারালাইসিস দেখা যায়।
- এনিমিয়া দেখা যায়।
- পরিশেষে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এই রোগ যে কোনো বয়সে এমনকি শিশুদেরও হতে পারে।

বেরিবেরি

কাজ – ভিটামিন–বি১ এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন কর।

ভিটামিন–বি২

ভিটামিন–বি২ এর রাসায়নিক নাম রিবোফ্লাভিন। হালকা হলুদ বর্ণের ও তাপে সহনশীল।

ভিটামিন–বি২ এর কাজ–

- এর প্রধান কাজ হলো অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি মুক্ত করতে এবং সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।
- ত্বকের সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষা করে এবং মিউকাস মেমব্রেনকে সুস্থ রাখে।
- স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন।
- সুষ্ঠু পরিপাক ক্রিয়ার জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন।

উৎস –

ক) **প্রাণিজ উৎস** – দুধ এই ভিটামিনের উৎকৃষ্ট উৎস। এ ছাড়া কলিজা, পনির, ডিম, মাছ, মাংস ও বৃক্ক উল্লেখযোগ্য।

খ) **উদ্ভিজ উৎস** – উদ্ভিজ উৎসের মধ্যে শাকসবজি, ডাল, শিম ও অংকুরিত শস্যে পাওয়া যায়।

অভাবজনিত অবস্থা –

- রিবোফ্লাভিনের অভাবে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- এর অভাবে ঠোঁটের কোনায় ঘা হয়। যাকে অ্যাংগুলার স্টমাটাইটিস বলে।
- বি২–এর অভাবে মুখে ও জিহবা মেজেন্টা বর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থাকে গ্লসাইটিস বলে।
- অকালে চুল উঠে যায়।
- চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চোখ জ্বালা করে, চোখে ছানি পড়ে ও দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়।

এ্যংগুলার স্টমাটাইটিস

গ্লসাইটিস

কাজ – ভিটামিন–বি২ এর অভাবজনিত সমস্যাগুলো বর্ণনা কর।

পাঠ–৯ : ভিটামিন সি

ভিটামিন–সি এর রাসায়নিক নাম এসকরবিক এসিড। ভিটামিন সি পানিতে দ্রবণীয় এবং তাপে নষ্ট হয়ে যায়, স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে বলে একে স্কার্ভি প্রতিরোধী ভিটামিন বলে।

উৎস–

উদ্ভিজ উৎস – আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, লেবু, টমেটো, কমলালেবু, তাজা শাকসবজি, ধনেপাতা, বাঁধাকপি, কামরাঙ্গা ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন–সি পাওয়া যায়।

প্রাণীজ উৎস – প্রাণিজ উৎসে ভিটামিন–সি কম পাওয়া যায়। মায়ের দুধে ভিটামিন–সি বিদ্যমান।

কার্যকারিতা –

• রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বজায় রাখে। • হাড়ের টিসু গঠনে ও পুষ্টি সাধনে কাজ করে। • ভিটামিন–এ, ই এবং বি কমপ্লেক্সে–এর জারণ প্রতিহত করে। • রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে সাহায্য করে।	• কোলেস্টেরল বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। • ক্ষত স্থান শুকাতে সাহায্য করে। • লৌহের শোষণ বৃদ্ধি করে।

অভাবের ফল – ভিটামিন–সি এর গুরুতর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। যে কোনো বয়সেই এই স্কার্ভি রোগ হতে পারে। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো–

- দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠে।
- দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে।
- দাঁত পড়ে যায়।
- এনিমিয়া দেখা যায়।
- হাত ও পা–এর গাঁটে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়।
- সহজে ক্ষত শুকাতে চায় না, ভাঙ্গা হাড় সহজে জোড়া লাগতে চায় না।
- চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে কালচে দাগ হয়।
- সহজেই সর্দি–কাশি হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

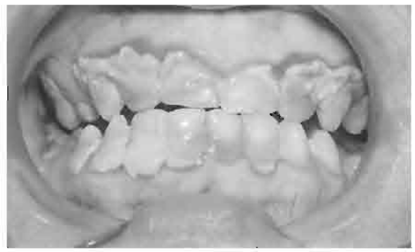
স্কার্ভিতে দাঁতের মাড়ি ফুলে ওঠা

স্কার্ভিতে চামড়ার পরিবর্তন

কাজ – আমাদের দেহে ভিটামিন–সি এর ঘাটতি হলে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা বোর্ডে লেখ।

পাঠ–১০ : খনিজ লবণ–ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরেই খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। দেহের উপাদানের প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ৪ ভাগ অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পর্দাথ রয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাঙ্গানেশিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, আয়োডিন, দস্তা, এলুমিনিয়ম, নিকেল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। কোনো খাদ্যবস্তু পোড়ালে যে সাদা ছাই অবশিষ্ঠ থাকে, তাকে খনিজ পদার্থ বা অজৈব লবণ বলে। পরিমাণের মাপকাঠিতে এদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **প্রধান খনিজ লবণ** – অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানেসিয়াম, ও গন্ধক প্রাণী দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করে। এদের প্রধান খনিজ লবণ বলে।

(২) লেশমৌল খনিজ লবণ – লৌহ, আয়োডিন, ক্লোরিন, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি খুব সামান্য পরিমাণ দেহের পুষ্টি কাজে অংশ নেয় বলে এসব মৌলকে লেশমৌল বলা হয়। কিন্তু এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ পদার্থের কাজ

দেহ গঠন উপাদান হিসেবে কাজ করে	অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে
• কঠিন কোষকলা গঠন করে। • নরম কোষকলা গঠন করে। • দেহ তরল পদার্থের উপাদান গঠন করে।	• মাংসপেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। • স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। • অক্সিজেন বহন করে। • এনজাইমের কাজে সহায়তা করে।

আমরা এখন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন, জিংক, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম নিয়ে আলোচনা করব।

ক্যালসিয়াম– খনিজ লবণের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম দাঁতে এবং হাড়ে এবং ১% থাকে রক্তে এবং দেহের জলীয় অংশে ও কোমল তন্তুতে।

উৎস–

ক) **প্রাণিজ উৎস** – দুধ ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। দুগ্ধজাত খাদ্য যেমন– দই, ছানা, পনির, মাওয়া, কাঁটাসহ ছোট মাছ ও হাড়ে ক্যালসিয়াম থাকে।

খ) **উদ্ভিজ উৎস** – সবুজ শাকসবজি, লবণ, কলমি শাক, ডাঁটা শাক, পুঁইশাক, লালশাক, ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। সবজির মধ্যে ঢেঁড়শ, ধুন্দুল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম ইত্যাদি সবজি, ছোলা, মাষকলাই, মুগ, ও সয়াবিনে ক্যালসিয়াম থাকে।

কার্যকারিতা –

- দাঁত ও হাড়ের গঠনে সহায়তা করা।
- রক্ত জমাট বাঁধার কাজে সাহায্য করে।
- কোনো কোনো এনজাইমকে সক্রিয় করে।

অভাবের ফল –

রিকেটস্

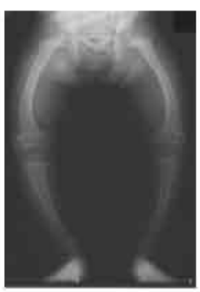

রিকেটস্ এ আক্রান্ত শিশুর পায়ের এক্স–রে এর চিত্র

ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওম্যালেসিয়া আক্রান্ত

- ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের পুষ্টি ব্যাহত হয়।
- দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়।
- শারীরিক দুর্বলতা দেখা যায়।
- শিশুদের বর্ধন ব্যাহত করে।
- ক্যালসিয়ামের দীর্ঘমেয়াদি ঘাটতির ফলে শিশুদের রিকেট রোগ হতে পারে।
- বয়স্ক ব্যক্তিদের ওস্টিওম্যালেসিয়া নামক রোগ দেখা দেয়।
- শরীরের কাটা স্থান থেকে রক্ত পড়া সহজে বন্ধ হয় না।

ফসফরাস – দেহের খনিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরেই ফসফরাসের স্থান। আমাদের দেহে জৈব ও অজৈব এই দুই ধরনের যৌগ হিসেবে ফসফরাস বিদ্যমান।

উৎস – প্রাণিজ উৎসের মধ্যে দুধ, ডিম, মাংস, যকৃৎ, মাছ এবং উদ্ভিজ উৎসের মধ্যে শাকসবজি, ডাল, ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ চাল, মটরশুঁটি, ফুলকপি, গাজর ইত্যাদিতে ফসফরাস পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা –

- দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজ সম্পর্কযুক্ত। দাঁত ও হাড় গঠনে ক্যালসিয়ামের সাথে ফসফরাস কাজ করে।
- খাদ্যদ্রব্য থেকে দেহে শক্তি মুক্ত হতে সাহায্য করে।
- দেহে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ফসফরাস অপরিহার্য।
- দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ বিপাকে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- জীবকোষ সৃষ্টি ও দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়।
- দেহে কোনো কোনো অ্যানাজাইমের কাজে সহায়তা করে।
- স্নায়ুকোষের সুস্থতা রক্ষায় এর ভূমিকা রয়েছে।

অভাবজনিত অবস্থা – সাধারণত ফসফরাসের অভাব খুব একটা দেখা যায় না।

কাজ – ক্যালসিয়ামের অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা বোর্ডে লেখ।

পাঠ–১১ : লৌহ ও আয়োডিন

লৌহ

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে ৩–৫ গ্রাম লৌহ থাকে। মানুষের দেহের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ লেশমৌল। মোট লৌহের দুই–তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৫% লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন অণুতে বর্তমান থাকে। প্রায় ৫% পেশিতে থাকে।

উৎস –

প্রাণিজ উৎস – যকৃৎ, বৃক্ক ও হৃৎপিন্ডে লৌহ থাকে। দুধে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ উৎস – সবুজ শাকসবজি, ডাল, শস্য, আপেল, গুড়, শুকনা ফলে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ থাকে।

কার্যকারিতা –

- রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য লৌহ প্রয়োজন।
- কিছু কিছু এনজাইমের কাজে সহায়তা করে থাকে।
- জীবিত প্রাণিকোষের শ্বসণের জন্য অপরিহার্য।

অভাবজনিত লক্ষণ – খাদ্যে দীর্ঘদিন লৌহের অভাব ঘটলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। এর ফলে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো–

- শিশুদের ক্ষেত্রে ক্ষুধাহীনতা থাকে।
- শিশুদের দেহের বর্ধন ব্যাহত হয়।
- শরীর দুর্বল লাগে ও চেহারা ফ্যাকাশে দেখায়।
- কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও হতে পারে।

কাজ – লৌহের অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন কর।

আয়োডিন

মানুষের দেহে আয়োডিনের পরিমাণ ১২–১৫ মিলিয়াম। শরীরের পুষ্টির জন্য আয়োডিন একটি অত্যাবশ্যকীয় লেশমৌল। দুই–তৃতীয়াংশ আয়োডিন থাকে থাইরয়েড গ্রন্থিতে।

উৎস – সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকার শাকসবজি ও পশুর মাংসে পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা –

আয়োডিন দেহে থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরক্সিন হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। আয়োডিন যুক্ত এই হরমোন মানবদেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন–

- শিশুর দেহের স্বাভাবিক বর্ধনের জন্য প্রয়োজন।
- দেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।
- মস্তিক ও স্নায়ুর বিকাশে সাহায্য করে।

অভাবজনিত সমস্যা – খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে যে সমস্যাগুলো হয় তা হলো–

(১) **গলগন্ড বা গয়টার** – আয়োডিনের অভাব হলে গলগন্ড হয়। এই রোগে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন তৈরি হতে পারে না। ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি হরমোন তৈরির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলে গ্রন্থিটি বড় হয়ে যায়। ফলে বাইরে থেকে গলা ফুলা দেখা যায়। এ ছাড়া এই রোগে বুদ্ধি ও চলনশক্তি হ্রাস, মানসিক অক্ষমতা, তোতলামি, মাংসপেশির সংকোচন, স্নায়বিক দুর্বলতা এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(২) **হাইপোথাইরয়েডিজম (থায়রয়েড গ্রন্থির কর্ম ক্ষমতা হ্রাস)** – দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী থাইরক্সিন হরমোন তৈরি না হলে এই অবস্থাকে হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। এর লক্ষণ হলো– আলসেমি, শুকনা চামড়া, ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। এর প্রভাবে ছোট শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়।

(৩) ক্রেটিনিজম (হাবাগোবা ও বামনত্ব) দেখা দিতে পারে।

আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড

একই বয়সের স্বাভাবিক উচ্চতার ব্যক্তির মাঝখানে আয়োডিনের অভাবে সৃষ্ট ক্রেটিনিজমে (হাবাগোবা ও বামনত্ব) আক্রান্ত ব্যক্তি

কাজ – আয়োডিনের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে লেখ।

পাঠ ১২ – পানি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ কয়েক সপ্তাহ খাবার না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেয়ে এক দিনের বেশি থাকতে পারে না। মানুষের দেহ ৫৫–৭৫% পানি দ্বারা গঠিত। শরীরের সকল টিস্যুতেই পানি থাকে। প্রতিদিন মল, মূত্র, ফুসফুস ও চামড়ার মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং মানুষের দেহ পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। তাই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়। কী পরিমাণ পানি পান করতে হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করা হচ্ছে, কী খাবার খাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় সেই পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। খাবার থেকে প্রায় ১ লিটার পানি পাওয়া যায় এবং বাকিটা প্রতিদিনের গ্রহণকৃত তরল ও পানীয় থেকে পেতে হবে। গড়ে একজন মানুষের প্রতিদিন ২.৫–৩ লিটার পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দিনে ৬–৮ গ্লাস পানির প্রয়োজন হয়। তবে পানির চাহিদা নিম্নলিখিত অবস্থায় বেড়ে যায়–

- খুব বেশি গরম আবহাওয়ার কারণে অনেক ঘাম হলে।
- জ্বর হলে।
- ডায়রিয়া হলে ও বমি হলে।
- অনেক বেশি পরিশ্রম করলে।
- শরীরবৃত্তীয় খেলাধুলা করলে বা ঘাম ঝরিয়ে ব্যায়াম করলে।
- খাবারে আঁশ-জাতীয় খাদ্য বেশি থাকলে।

- স্তন্যদাত্রী মা সন্তানকে দুধ পান করালে।
- যাঁরা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩–৪ ঘণ্টা উড়োজাহাজে ভ্রমণের জন্য প্রায় ১.৫ লিটার পানি বের হয়ে যায় অর্থাৎ পানির চাহিদা বাড়ে।
- বিভিন্ন ধরনের ঔষধ সেবনের কারণেও পানির চাহিদা বাড়ে।

পানির উৎস – পানির প্রধান উৎস হচ্ছে খাবার পানি, ডাবের পানি, দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পানীয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের রসাল ফল, যেমন– তরমুজ ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

পানির কাজ–

- শরীরের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কাজ বজায় রাখার জন্য পানি প্রায়োজন হয়।
- খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সহায়তা করে।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- কোষে পুষ্টি উপাদান পরিবহণে সাহায্য করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা – শরীরে পানির পরিমাণ খুব কমে গেলে সেই অবস্থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি শুষ্কতা বলে।

ডিহাইড্রেশনের কারণগুলো হলো–

- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, আর্দ্রতা, ব্যায়াম অথবা জ্বরের কারণে ঘাম বেশি হওয়া।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করা বা খাদ্যে তরল জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি থাকা।
- ডায়রিয়া হওয়া।
- অতিরিক্ত বমি হওয়া।

ডিহাইড্রেশনের লক্ষণগুলো হলো –

- মাথা ধরা
- দুর্বল লাগা
- ঠোঁট শুকিয়ে যায় বা ফেটে যায়
- মূত্রের রং গাঢ় হয়।

ডিহাইড্রেশন থেকে শরীরে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করা দরকার।

> **কাজ –** আমাদের দেহে প্রতিদিন কী পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়? কোন কোন অবস্থায় পানির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তা লেখ।

২০১৫

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে?

ক) এনজাইম খ) হরমোন

গ) হিমোগ্লোবিন ঘ) এন্টিবডি

২। খাদ্যের কোন উপাদানটি আমাদের দেহকে বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে?

ক) প্রোটিন খ) কার্বোহাইড্রেট

গ) স্নেহ ঘ) পানি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাসিমা খাতুন সব সময়ই শাকসবজি ছোট ছোট টুকরা করে কাটেন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে রান্না করেন। তা দেখে প্রতিবেশী আপা বলেন, "তোমার তৈরিকৃত খাদ্যে দরকারি একটি উপাদান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

৩। নাসিমা খাতুনের রান্নায় খাদ্যের কোন উপাদানটির অপচয় হচ্ছে?

ক) ভিটামিন এ খ) ভিটামিন সি

গ) ভিটামিন ই ঘ) ভিটামিন কে

৪। ওই পরিবারের সদস্যরা –

i. চোখের সমস্যায় ভুগতে পারে

ii. অসময়ে দাঁত হারাতে পারে।

iii সহজেই সর্দি–কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সানার বয়স পাঁচ বছর। তাকে তার সমবয়সীদের তুলনায় ছোট দেখায়। ইদানীং সে অল্পতেই রেগে যায়। দিন দিন তার চুলের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি সানার খাদ্যাভ্যাস জানতে চান। সব শুনে তিনি সানার গৃহীত খাবারে একটি বিশেষ উপাদানের ঘাটতি রয়েছে বলে মাকে জানান এবং পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য সানাকে সেই উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন।

ক. কোনটি ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না?

খ. অ্যামাইনো এসিড বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. সানার দেহে কোন উপাদানের অভাবে উল্লিখিত সমস্যাগুলো হচ্ছে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সানার শারীরিক অবস্থা উত্তরণে ডাক্তারের পরামর্শটি মূল্যায়ন কর।

২। দশম শ্রেণির ছাত্রী পূর্ণির পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর সে হেঁটে বাসায় ফেরে। তারপর অতি দ্রুত তার ঘামে ভেজা কাপড় পাল্টিয়ে সে আবার বাইরে শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়। এ সময়ে মা তাকে ডাবের পানি, লেবুর শরবত কিংবা ফলের সুপ–জাতীয় পানীয় খেতে দিলে পূর্ণি তা খেতে চায় না। দুপুর কিংবা রাতের খাবারের পরও সে পানি কম খায়। ফলে বেশ কিছুদিন যাবৎ তার শারীরিক সমস্যা হচ্ছে।

ক. সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য উপাদান কোনটি?

খ. খাদ্যই বেঁচে থাকার নিয়ামক–বুঝিয়ে লেখ।

গ. পূর্ণি কী ধরনের সমস্যায় ভুগছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পূর্ণির শারীরিক সমস্যার সমাধান তার নিজের পক্ষেই করা সম্ভব–বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা

পাঠ–১ : খাদ্যের পরিপাক

বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। অধিকাংশ খাদ্যবস্তুই দেহে সরাসরি কাজে লাগে না। কারণ খাদ্য হিসেবে আমরা যেগুলো গ্রহণ করি, সেগুলোর অধিকাংশই বৃহৎ অণুবিশিষ্ট এবং এদের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। খুব সামান্য পরিমাণে কয়েকটি খাদ্যবস্তু যেমন – গ্লুকোজ ও কয়েকটি খনিজ লবণ সরাসরি কাজে লাগে। অধিকাংশ খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হওয়ার পর তা শরীরের কাজে আসে। যেমন– ভাতের প্রধান পুষ্টি উপাদান স্টার্চ। ভাত খাওয়ার সাথে সাথেই এই স্টার্চ শরীরের কোনো কাজে আসবে না। কারণ স্টার্চ অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত। তাই খাওয়ার পর স্টার্চ ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হলে দেহ গ্লুকোজ শোষণ করে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করবে। তেমনি খাদ্যে অবস্থিত বড় বড় প্রোটিন অণুগুলো ভেঙে অ্যামাইনো এসিডে এবং খাদ্যের ফ্যাট ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হওয়ার পর এই সকল সরল উপাদান শোষিত হয়ে সরাসরি দেহের কাজে লাগবে।

বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ (পুষ্টি উপাদানগুলো বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে জটিল অবস্থায় থাকে) → খাদ্য পরিপাক → খাদ্য সরল অবস্থায় পরিণত হয় (পুষ্টি উপাদানগুলো সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয়)

খাদ্য পরিপাকের পরিণতি

যে কোনো খাদ্য বস্তুকে শরীরে কাজে লাগানোর জন্য খাদ্যের বড় বড় অণুগুলো ভেঙে ছোট ছোট সরল অণুতে পরিণত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। খাদ্যের এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে।

পরিপাক

খাদ্য উপাদানের বৃহৎ ও জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্র ও সরল অণুতে রূপান্তরিত হয়ে শরীরে শোষিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। বৃহৎ উপাদান থেকে ক্ষুদ্র ও সরল উপাদানে পরিণত হওয়ার কাজ বিভিন্ন ধরনের এসিড ও এনজাইমের সাহায্যে ধাপে ধাপে বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। খাদ্যের এই জটিল উপাদান থেকে সরল উপাদানে পরিণত হওয়া ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে পরিপাক ক্রিয়া বলে।

"যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুর বৃহত্তর জটিল অণুগুলো বিভাজিত হয়ে বা ভেঙে দেহের উপযোগী ও বিশোষণযোগ্য সরল ও ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক (Digestion) বলে"।

খাদ্যের বৃহৎ ও জটিল অণু —(এসিড ও এনজাইম / পানি)→ সরল ও শোষণযোগ্য অণু

পরিপাক ক্রিয়া

পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গ্লুকোজে, প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো এসিড এবং ফ্যাট ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়। এভাবে পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে সকল খাদ্যবস্তুই ভেঙে সহজ উপাদানে পরিণত হয় এবং শরীরের পুষ্টি সাধন করে। সকল খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

পরিপাকতন্ত্র

মানবদেহে পরিপাক ক্রিয়া শরীরের একটি মাত্র অংগে সংঘটিত হয় না। শরীরের বেশ কয়েকটি অংগ এই কাজের সাথে জড়িত। যেমন দাঁত দিয়ে চর্বনের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু ছোট ও নরম করা হয়। অন্ত্রনালির মাধ্যমে চর্বিত নরম খাদ্যবস্তুগুলো পাকস্থলিতে আসে এবং পরিপাক ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তুর সম্পূর্ণ পরিপাক হয় না, তাই অপরিপাককৃত খাদ্যবস্তুগুলো ক্ষুদ্রান্তে আসে। এখানেই প্রধান পরিপাক কাজ চলে। এরপর বৃহদন্ত্রে খাদ্যবস্তুগুলো প্রবেশ করে এবং পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরিপাকের ফলে উৎপন্ন সরল উপাদানগুলো শরীরের মধ্যে শোষিত হয় এবং যে বস্তুগুলো পরিপাক ও শোষিত হয় না অর্থাৎ অপাচ্য দ্রব্যগুলো দেহ নিষ্কাশন করে। খাদ্যকে দেহের গ্রহণ উপযোগী করার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশে এই পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। "দেহের যে অংশের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু গ্রহণ, খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ এবং অপাচ্য অংশের নিষ্কাশণ ঘটে, তাকে পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) বলে।" মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

(পৌষ্টিকনালি + পৌষ্টিকগ্রন্থি)
→ পরিপাকতন্ত্র ←

পৌষ্টিকনালির অন্তর্গত অঙ্গাগুলো হচ্ছে মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র। আর পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো হচ্ছে লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

পৌষ্টিকনালি – মুখবিবর হতে মলদ্বার পর্যন্ত খাদ্যবাহী নালিটিকেই পৌষ্টিকনালি বলে। নিম্নে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো –

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ	
ক) মুখবিবর (Buccal cavity)	ঘ) পাকস্থলি (Stomach)
খ) গলবিল (Pharynx)	ঙ) ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine)
গ) অন্ননালি (Oesophagus)	চ) বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

পৌষ্টিকগ্রন্থি

লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

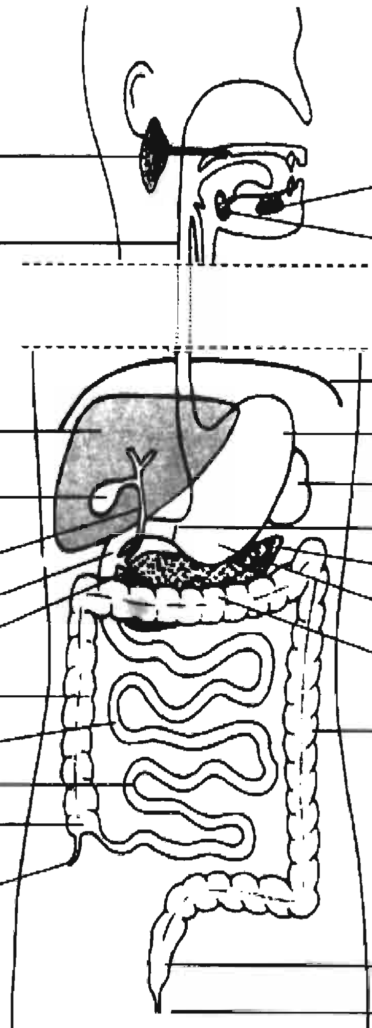

পরিপাকতন্ত্র

কাজ – আমাদের দেহে খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত অংগগুলো বোর্ডে চিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত কর।

পাঠ ২ – কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন পরিপাক

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। পরিপাকের জন্য অপরিহার্য এনজাইমসমূহ লালারস, পাচক রস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসে অবস্থিত। এ ছাড়া পিত্তরস পরিপাক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বিভিন্ন এনজাইমের উপস্থিতিতে বিভিন্নভাবে ও ভিন্ন গতিতে

পরিপাক হয়ে থাকে। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট পরিপাকের জন্য সবচেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। খাদ্য মুখগহ্বর হতে মলদ্বার পর্যন্ত আসার জন্য প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। নিম্নে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক (Digestion of Carbohydrates) - শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। আমাদের দৈনিক শক্তি চাহিদার ৬০%–৮০% কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্রহণ করি। কার্বোহাইড্রেট দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে। ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড়, মধু, ফল ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস। এ সকল খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের মাধ্যমে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং পরে শক্তি উৎপন্ন করে। মনোস্যাকারাইডের কোনো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। এরা সরাসরি রক্তে বিশ্লেষিত হতে পারে। ডাইস্যাকারাইড ভেঙ্গে দুটি মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয় এবং পলিস্যাকারাইড ভেঙে প্রথমে ডাইস্যাকারাইড এবং পরে মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়।

পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের পর শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয় ও শোষিত হয়।

ফ্যাটের পরিপাক (Digestion of Fat) – ফ্যাটকে ঘনীভূত শক্তির উৎস বলা হয়। কারণ খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে থাকে। ফ্যাটের প্রধান উৎস হচ্ছে তেল, ঘি, মাখন, চর্বিযুক্ত মাংস, তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, দুধের সর ইত্যাদি। ফ্যাট–জাতীয় খাদ্য ভেঙে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়। পাকস্থলিতে পিত্তলবর্ণের অভাব থাকায় এখানে ফ্যাটের সম্পূর্ণ পরিপাক হয় না।

প্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Protein) – খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে প্রোটিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রাণি ও উদ্ভিজ কোষে প্রোটিন আছে। প্রোটিন এর প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। প্রোটিন সর্বাপেক্ষা জটিল জৈব পদার্থ। বড় বড় প্রোটিন অণু পরিপাক হয়ে এর গাঠনিক একক অ্যামাইনো এসিডে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শরীরে কোনো কাজে লাগে না।

পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিন পরিপাকের পর শোষণযোগ্য উপাদান অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয় ও শোষিত হয়।

কাজ – কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট পরিপাকের পর কী কী উপাদান উৎপাদিত হয়?

পাঠ–৩ : কিশোর–কিশোরীর খাদ্য পরিকল্পনা

শৈশব থেকে পূর্ণ বয়সে পরিনত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কালকে কৈশোর কাল বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০–১৯ বছর বয়স এই সময়টা হলো কৈশোর কাল। এই বয়সে শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২–১৫ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০–১৩ বছর বয়সে বর্ধনের গতি সর্বোচ্চ হয়।

এই বয়সে বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তির চাহিদা বাড়ে, এ ছাড়া প্রোটিন, ভিটামিন ও ধাতব লবণের চাহিদাও বাড়ে। এই বয়সের কিশোর–কিশোরী খেলাধুলা করে তাই তাদের শরীরের বিভিন্ন অংগের সঞ্চালন ঘটে বলে শক্তির খরচ হয়। কিশোর–কিশোরীদের পেশির গঠন, দাঁত, হাড়, রক্ত গঠন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেশি হয়।

২০১৬

কিশোর–কিশোরীর পুষ্টির গুরুত্ব –

- কিশোর–কিশোরীদের শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয় এবং এই বর্ধনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত কিলো ক্যালরি বা শক্তিসমৃদ্ধ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ।
- এই বয়সে শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, পড়ালেখা, বহিরাঙ্গানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য জীবনের অন্য সময়ের চেয়ে বেশি শক্তির অর্থাৎ কিলো ক্যালরির প্রয়োজন হয়। এই বর্ধিত শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- কিশোর–কিশোরীদের ভিটামিন ও ধাতবলবণ সমৃদ্ধ খাদ্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন–ডি কিশোর–কিশোরীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- এই বয়সে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লৌহ ও ফলিক এসিড বেশি প্রয়োজন হয়। কারণ, মেয়েদের মাসিকের জন্য প্রতিমাসে যে রক্তের অপচয় ঘটে তার পরিপূরণের জন্য অর্থাৎ রক্ত গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়।
- কিশোর–কিশোরীদের দেহ ত্বকের ও চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন– এ, বি ও সি সমৃদ্ধ খাদ্য গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিশোর–কিশোরীর পুষ্টির চাহিদা –

- **শক্তির চাহিদা –** বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তি বা কিলো ক্যালরির চাহিদা বাড়ে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কিছুটা বেশি শক্তি বা কিলো ক্যালরির প্রয়োজন হয়।
- **প্রোটিন –** কিশোর–কিশোরীদের শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয় এবং এই বর্ধনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন–জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের শক্তি চাহিদার ১২%–১৫% প্রোটিন–জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ১০–১২ বছর বয়সের মেয়েদের প্রোটিনের চাহিদা ছেলেদের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়।
- **ধাতবলবণ –** কিশোর–কিশোরীদের হাড়ের বর্ধনের জন্য ক্যালসিয়ামের চাহিদা প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে বেশি হয়। হাড়ের যথাযথ বর্ধন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিন অবশ্যই ১৫০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম শরীরে জমা হতে হবে। এই বয়সে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে পরবর্তী জীবনে ওস্টিওপোরোসিস দেখা দেওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি বেড়ে যায়। রক্তের হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের জন্য কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মাসিকের কারণে লৌহের অপচয় ঘটে বলে কিশোরদের চেয়ে কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বেশি হয়। এই বয়সে জিংকের চাহিদাও বাড়ে। এর অভাবে এই বয়সে শারীরিক স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলোও পরিণতিতে বিলম্ব হতে পারে।
- **ভিটামিন–** শক্তির চাহিদা বেশি হওয়ায় থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন এবং নায়াসিন–এর চাহিদা বাড়ে। এই বয়সে দ্রুত টিসু সংশ্লেষিত হওয়ার কারণে ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি১২ ও বি৬–এর চাহিদাও বাড়ে। মাসিকের কারণে কিশোরীদের ভিটামিন বি১২ চাহিদা বেশি হয়। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য কিশোর–কিশোরীদের ভিটামিন ডি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এই বয়সে প্রজননতন্ত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক গঠনের জন্য ভিটামিন এ, ই ও সি এর প্রয়োজন হয়।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, কিশোর–কিশোরীদের স্বাভাবিক ওজন, উচ্চতা, সুস্থতা এবং পড়ালেখা ও খেলাধুলার ক্ষমতা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদানেরই পর্যাপ্ত ক্যালরি উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা থেকে কিলো ক্যালরিসহ প্রয়োজনীয় ছয়টি পুষ্টি উপাদান পেতে হলে খাদ্যের মৌলিক খাদ্য গোষ্ঠীর প্রতিটি গ্রুপ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রতিদিনই কিশোর–কিশোরীদের নির্ধারিত কিলো ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে।

কিশোর–কিশোরীদের খাদ্য তালিকা তৈরির সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন–

- কিশোর–কিশোরীদের প্রতিদিন কমপক্ষে তিন বেলা প্রধান খাবার ও দুইবার হালকা নাশতা দিতে হবে। এই বয়সে শিশুরা বেশ দীর্ঘ সময় স্কুলে থাকে, স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা খেলাধুলাও করে থাকে, ফলে প্রচুর শক্তির খরচ হয়। তাই স্কুলে থাকাকালীন একবার পুষ্টিকর নাশতা দিতে হবে এবং বাসায় আরও একবার নাশতা খাবে। তাহলে অপুষ্টি জনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।
- প্রতি বেলার প্রধান খাবারে অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতের বেলায় মৌলিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- কিশোর–কিশোরীদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কিলো ক্যালরির চাহিদা যাতে পুরণ হয় সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য ও শস্য–জাতীয় খাদ্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে।
- প্রতিদিনই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। দিনে অন্তত একবার প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ও রঙিন যেমন– হলুদ, সবুজ, লাল, বেগুনি, সাদা ইত্যাদি বর্ণের শাকসবজি ও তাজা টক–জাতীয় ফল অবশ্যই থাকতে হবে।
- সারা দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করতে হবে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য দিনে ৬–৮ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের সফট্ ড্রিংকস, জুস, মিষ্টি–জাতীয় খাবার ও তেলে ভাজা খাবার গ্রহণে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে এই খাবারগুলোতে বেশি ক্যালরি থাকে। যারা পরিশ্রমের কাজ কম করে বা একেবারেই করে না বা খেলাধুলা করে না তারা এই খাদ্যগুলো প্রতিদিন গ্রহণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। তা না হলে শরীরের ওজন বেশি বেড়ে যাবে অর্থাৎ ওজনাধিক্যে আক্রান্ত হবে এবং নানা ধরনের জটিল রোগের সূচনা হবে।
- এই বয়সে ফাস্টফুড এর প্রতি প্রায় বেশির ভাগ কিশোর–কিশোরীরই ঝোঁক থাকে। এই খাবারগুলো কোনো বিশেষ দিন বা উপলক্ষে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রতিদিনই যদি ফাস্টফুড গ্রহণ করে তাহলে খুব সহজেই তাদের শরীরের ওজন বেড়ে যাবে এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি দেখা দেবে।
- সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সঠিক খাদ্যাভাসের ব্যাপারে কিশোর–কিশোরীদের সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ায় এমন সব মজাদার ও পছন্দের খাবারের পরিবর্তে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে।

কিশোর–কিশোরীদের উপযোগী এক দিনের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো–

বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য	এক পরিবেশন পরিমাণ	কিশোর (পরিবেশন সংখ্যা)	কিশোরী (পরিবেশন সংখ্যা)
শস্য ও শস্য –জাতীয় খাদ্য	আধা কাপ ভাত, একটি রুটি, এক টুকরো পাউরুটি।	৮–৯	৬–৮
প্রোটিন–জাতীয় খাদ্য	একটি ডিম, মাঝারি এক টুকরা মাছ বা মাংস, এক কাপ মাঝারি ঘন রান্না ডাল, আধা কাপ রান্না করা ঘন ডাল, আধা কাপ রান্না মটরশুঁটি, ১/৩ কাপ বাদাম।	৩–৫	৩–৪
শাক–সবজি	এক কাপ কাঁচা সবজি সালাদ, আধা কাপ বিভিন্ন রান্না সবজি, আধা কাপ রান্না শাক, একটা আলু।	৪–৫	৩–৪
ফল	একটি মাঝারি কলা, পেয়ারা, আম, কমলা, আধা কাপ টুকরা ফল।	৩–৪	৩–৪
দুধ ও দুধ –জাতীয় খাদ্য	এক কাপ দুধ বা দই, আধা কাপ ছানা।	২–৪	২–৪
তেল ও ঘি	উদ্ভিজ্জ তেল, ঘি, চিনি, গুড় ও বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার।	কম ক্যালরি	কম ক্যালরি

চিনি, গুড় ও বিভিন্ন মিষ্টি–জাতীয় ও লবণ–জাতীয় খাবার এই বয়স থেকেই কম গ্রহণের অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। মনে রাখতে হবে বাইরের কেনা খাবারের চেয়ে ঘরে তৈরি খাবার এবং মৌসুমি শাকসবজি ও ফল বেশি পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তাই কিশোর–কিশোরীদের এই খাবারগুলো গ্রহণে সচেতন হতে হবে।

কাজ – তোমার জন্য একদিনের একটি খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি পৌষ্টিকগ্রন্থি?

ক) গলবিল খ) অগ্ন্যাশয়

গ) পাকস্থলি ঘ) বৃহদন্ত্র

২। কিশোর–কিশোরীর দাঁত ও হাড়ের গঠনের জন্য উপযোগী খাদ্য কোনটি?

ক) পনির খ) লেবু

গ) আলু ঘ) বাদাম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাসনিমের বয়স ১২ বছর। তার মা তাকে প্রায়ই টিফিনে ছানা, পনির, কাবাব, টিকিয়া ইত্যাদি খাবারগুলো খেতে দেন।

৩। এই খাবারগুলো থেকে তাসনিম কোন খাদ্য উপাদানটি পাবে?

ক) কার্বোহাইড্রেট   খ) ফ্যাট

গ) প্রোটিন   ঘ) ভিটামিন

৪। মা তাসনিমকে উক্ত খাবারগুলো খেতে দেওয়ার কারণ –

i. দেহের বৃদ্ধি সাধন করা।

ii. দেহের ক্ষয়পূরণ করা।

iii. কর্মশক্তি উৎপাদন করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii   খ) i ও iii

গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শম্পা ও লিটু ভাইবোন। তারা দুজনই স্কুলে পড়ে। স্কুল ছুটির পর লিটু প্রায় প্রতিদিনই বার্গার, স্যান্ডউইচ, ড্রিংকস ইত্যাদি খায়। মা লক্ষ করলেন লিটু দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে শম্পা বয়সের তুলনায় কম লম্বা হচ্ছে। এ নিয়ে চিন্তিত মা একজন পুষ্টিবিদের সাথে আলাপ করলে পুষ্টিবিদ শম্পার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিলেন এবং লিটুকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনে মাকে মনোযোগী হতে বললেন।

ক. কৈশোরকালের বয়স সীমা কত?

খ. খাদ্য পরিপাক হওয়া প্রয়োজন কেন?

গ. শম্পার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লিটুর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য মায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঠ–১ : নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সুস্বাস্থ্যই হচ্ছে সকল সফলতা ও সুখের চাবিকাঠি। আর সুস্বাস্থ্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের গুরুত্ব –

বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে নগরায়ণের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সেই সাথে ঘটেছে আমাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন। আমরা যন্ত্র নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক জীবনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন গঠনের পথকে নিজেরাই জটিল করছি। ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছি। জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক জীবনের পরিবর্তে এসেছে অনিয়ম ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন প্রণালি।

যখন তখন ফাস্টফুড গ্রহণ, পানির পরিবর্তে সফট্ ড্রিংকস্ পান করা, ধূমপান করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা, একেক দিন একেক নিয়মে জীবন পরিচালনা করা ও নির্ধারিত কোনো রুটিন মেনে না চলা, খুব বেশি টিভি দেখা বা কম্পিউটার গেমে নিজেকে অভ্যস্ত করা, সব সময় মানসিক চাপের মধ্যে থাকা, শারীরিক ব্যায়াম না করা বা পরিশ্রমের কাজ না করা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে না চলা ইত্যাদি বিষয় নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের অন্তরায়। যার প্রভাবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও ওজনাধিক্য এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগ যেমন – ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ আমাদের দেশে ক্রমে বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা ছোটবেলা থেকেই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত না হয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মে অভ্যস্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ ইত্যাদি রোগগুলো প্রকাশ পায়, কর্মক্ষমতা কমে যায়, বার্ধক্য দ্রুত হয়, এ ছাড়া এ সকল রোগের দীর্ঘমেয়াদি জটিলতায় আক্রান্ত হওয়াসহ জীবনের দীর্ঘতা বা আয়ু কমে যায়। তাই এক কথায় বলা যায় যে, সুস্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নাই।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপায়–

১) **স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা –** নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠায় স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাদ্য গ্রহণ, খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় মেনে চলা, পরিমিত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস পরিহার করা, সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত বিধিনিষেধ মেনে চলা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য গ্রহণে সচেতন থাকা, খাদ্য সম্পর্কিত কুসংস্কারগুলো পরিহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন সম্ভব। আর এর দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শিশুকাল থেকেই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২) **নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা** – নিয়মতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের জন্য নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা অত্যন্ত জরুরি। ছোটবেলা থেকেই যদি প্রত্যেকে নিজের প্রাত্যহিক কাজগুলো যেমন– নিয়মিত নিজের কাপড় কাচা, নিজের ঘর পরিষ্কার করা, আসবাব পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজগুলো নিজে করার অভ্যাস করা হয় এবং নিয়মিত খেলাধুলা করা হয় তাহলে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হয় ফলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর যারা নিজেদের কাজ করতে পারেন না বা খেলাধুলা করার সুযোগ নেই তাদের অবশ্যই নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম শরীরের ওজন স্বাভাবিক রেখে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩) **ঘুমের সময় ও জেগে উঠার সময় মেনে চলা** – প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য জরুরি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায় ও ঘুমের অনিয়ম করেন তাদের শরীরের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জটিলতা দেখা দেয়। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন ৬–৮ ঘণ্টা নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুমাতে হবে। অনেক রাত করে ঘুমানো পরিহার করতে হবে। প্রতিদিন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হবে এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠার নিয়মিত অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪) **মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা** – অনিয়ন্ত্রিত ও জটিল জীবনযাপন প্রণালির কারণে বর্তমানে মানসিক চাপ বেড়ে গেছে, যা সুস্বাস্থের অন্তরায় এবং উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত। মানসিক চাপ কমানোর জন্য নিয়ন্ত্রিত সহজ সরল জীবন প্রণালি প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। জীবন চলার পথে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যায় অস্থির না হয়ে বিচক্ষণতার সাথে তা মোকাবিলার উপায় বিবেচনা করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে কাজ সম্পাদন করা, অতিরিক্ত অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারলে মানসিক চাপ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৫) **যথাযথ সময় পরিকল্পনা করা এবং নিজেকে অভ্যস্ত করা** – নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের জন্য যথাযথ সময় পরিকল্পনা করা এবং নিজেকে তার সাথে অভ্যস্ত করা জরুরি। মনে রাখতে হবে, ছোটবেলা থেকেই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে পরবর্তী জীবনেও এর নেতিবাচক ফলাফল ভোগ করতে হবে। সুষ্ঠু সময় পরিকল্পনা ও এর অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন সহজ হয়।

৬) **ধূমপান বর্জন করা** – নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের জন্য সুস্থতা প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপায়ী ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের কার্যকারিতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এদের বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। এ ছাড়া ধূমপায়ী ব্যক্তি যখন ধূমপান করেন তখন তিনি শুধু নিজেরই ক্ষতি করেন না, তার আশপাশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরও ক্ষতি করেন। এক কথায় বলা যায় যে ধূমপায়ী ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই অবশ্যই ধূমপান বর্জন করতে হবে।

৭) **ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলা** – ছোটবেলা থেকেই পানাহারে, চলাফেরায়, মেলামেশার ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলায় অভ্যস্ত হওয়া যায় যেমন– পরিমিত আহার করা, অতি ভোজন পরিহার করা, মদপান থেকে বিরত থাকা, পারস্পরিক মেলামেশায় নিরাপদ ও সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি বিধি–নিষেধগুলো মেনে চলা যায় তাহলে খুব সহজেই নিয়মতান্ত্রিক সুস্থ জীবনযাপন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২০১৬

৮) **নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করা ও মেনে চলা** – সহজ করে জীবন পরিচালনার জন্য ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করা ও তা মেনে চলা। নিয়মতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠায় উপরের আটটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোটবেলা থেকে নিজের মধ্যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অনুধাবন করে চর্চা করতে পারলে খুব সহজেই নিয়মতান্ত্রিক সুস্থ জীবন লাভ করা যায়। মনে রাখতে হবে সুস্থ ও নিরোগ জীবনযাপনের জন্য এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন না করার পরিণতি – নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন না করলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। যেমন–

- ওজন বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।
- জীবনের দীর্ঘতা বা আয়ু কমে যায়।
- কর্মক্ষমতা কমে যায়।
- বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে উপরের সমস্যাগুলো সৃষ্টির প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমরা এখন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ সম্পর্কে জানব।

কাজ – তুমি কীভাবে তোমার জীবনকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করতে পারবে তা বর্ণনা কর।

পাঠ–২ : ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস একটি বিপাক জনিত রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে বিপাকজনিত ত্রুটি ঘটে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস কোনো সংক্রামক রোগ নয়। একবার ডায়াবেটিস হলে তা একেবারে সেরে যায় না, তবে চিকিৎসা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চললে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ছাড়া কোনোভাবেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। যে কেউ যে কোনো বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে তবে নিম্নলিখিত কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় –

- বংশগত কারণ– যাদের মা–বাবা ও খুব নিকটজনের ডায়াবেটিস আছে, তাদের মধ্যে এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন
- শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করা
- অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় – ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। তবে এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি নিয়ম মানতে হয়–

- খাদ্য ব্যবস্থা
- শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম
- ঔষধ
- রোগ সম্পর্কে শিক্ষা

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। তাহলে সহজেই ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

(ক) ডায়াবেটিসে খাদ্য ব্যবস্থাপনা – ডায়াবেটিস হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই গ্লুকোজ প্রধানত খাবার থেকে আসে। আর তাই ডায়াবেটিস হলে খাদ্য গ্রহণে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। ডায়াবেটিস হওয়ার আগে ও পরে পুষ্টি চাহিদার কোনো তারতম্য ঘটে না। কিন্তু খাদ্য গ্রহণে নিয়ম মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা ও স্বাস্থ্য ভালো রাখা।

খাদ্য গ্রহণের নিয়ম –

- **বেশি খাওয়া যাবে বা ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে** – যে খাবারগুলোতে প্রচুর আঁশ আছে সেই খাবারগুলো বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না, তাই সেইগুলো বেশি করে খাওয়া যাবে। সব রকমের শাকসবজি যেমন– চিচিংগা, ধন্দুল, পেঁপে, পটোল, শিম, লাউ, শসা, খিরা, করল্লা, উচ্ছে, কাঁকরোল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ইত্যাদি। ফলের মধ্যে জাম, জামরুল, আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি।
- **হিসাব করে খেতে হবে** – কিছু খাবার আছে খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ না বাড়লেও সেই খাবারগুলো পরিমাণে বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই সেই খাবারগুলো হিসাব করে খেতে হবে। যেমন– ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, খৈ, বিস্কুট, আলু, মিষ্টি আলু, মিষ্টি কুমড়া, দুধ, ছানা, পনির, মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম, মিষ্টি ফল যেমন– কলা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারী। এগুলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দ্রুত বাড়ায় না।
- **পরিহার করতে হবে** – কিছু কিছু খাবার আছে যা খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেই খাবারগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন– চিনি, গুড়, মিসরি, রস, সরবত, সফট্ ড্রিংকস, জুস, সব রকমের মিষ্টি, পায়েস, ক্ষীর, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি।
- শরীরের ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক ওজনে আনতে হবে। আবার শরীরের ওজন কম থাকলে তা বাড়িয়ে স্বাভাবিক ওজনে আনতে হবে। সব সময় শরীরের ওজন স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার খেতে হবে। নিজের ইচ্ছামতো কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া যাবে না। এক বেলায় বেশি খাওয়া বা অন্য বেলায় কম খাবার খাওয়া অথবা এক দিন কম এক দিন বেশি খাবার খাওয়া যাবে না।

এক কথায় বলা যায় যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে খাদ্য গ্রহণে সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(খ) শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম – ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ও নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

(গ) ওষুধ – সকল ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। তবে কোনো কোনো ডায়াবেটিস রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চলার পাশাপাশি খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। যে রোগীকে চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ অর্থাৎ খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন যা–ই দেওয়া হোক না কেন

তাকে তার জন্য নির্ধারিত ডোজ ও এর সাথে খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের সঠিক নিয়ম খুবই সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে। তা না হলে ঔষধ রোগ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জীবনের ঝুঁকির কারণও হতে পারে।

(ঘ) **রোগ সম্পর্কে শিক্ষা** – ডায়াবেটিস সারা জীবনের রোগ তাই এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে রোগীকে ও রোগীর নিকট আত্মীয়দেরও অবশ্যই রোগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। কারণ ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

শৃংখলা মেনে চলা – ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন অর্থাৎ জীবনযাপনে শৃঙ্খলা মেনে চলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাপনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে–

• নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধি–নিষেধ মেনে চলা • নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা • চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন গ্রহণ করা • পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা • পায়ের নিয়মিত বিশেষ যত্ন নেওয়া	• ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা বন্ধ না করা • নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা ও রিপোর্ট সংরক্ষণ করা • ধূমপান ও মদপান পরিহার করা • প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা • ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা • শরীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা

কাজ – ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পাঠ–৩ : হৃদরোগ

আমাদের দেশে দিন দিনই হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হৃদরোগের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে – অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, অতিরিক্ত সম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্যশক্তি গ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করা, বংশগত কারণ, বিপাকীয় ত্রুটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে–

• নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধি নিষেধগুলো মেনে চলতে হবে • নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা • নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা • নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা	• নির্দিষ্ট সময় ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠা। • ৬–৮ ঘণ্টা ঘুমানো • মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা • ধূমপান ও মদপান পরিহার করা • পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা • প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা • শারীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা

হৃদরোগে খাদ্য ব্যবস্থাপনা –

হৃদরোগীর খাদ্য এমন হতে হবে যাতে করে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শক্তির চেয়ে বেশি খাদ্য শক্তি গৃহীত না হয় ও খাদ্য সুষম হয়। খাদ্যের মাধ্যমে চিনি, লবণ ও ফ্যাটের গ্রহণ যেন কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে আঁশ–জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

- লাল চালের ভাত ও ভুষিসহ আটার রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না।
- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন– শাকসবজি ও ফল বিশেষ করে টক জাতীয় ফল যেমন– লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।
- বিভিন্ন রঙিন সবজি যেমন– সবুজ (শাক পাতা), কমলা (মিষ্টি কুমড়া / গাজর), বেগুনি (বিট), লাল (টমেটো), হালকা হলুদ–সাদা (মুলা, শসা) প্রতিদিন গ্রহণ করতে হবে। মৌসুমি তাজা শাকসবজি প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- ডাল, বাদাম পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।
- মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস, চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া ভালো।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।

যে খাবারগুলো বাদ দেওয়া উচিত–

- মাখন, ঘি, ডালডা, ক্রিম সস, নারকেল, বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- আইসক্রিম, মিষ্টি–জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।
- বেশি চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, হাঁস–মুরগির চামড়া ও এদের তৈরি খাদ্য।
- বেশি লবণযুক্ত বা লবণে সংরক্ষিত যে কোনো খাবার, যেমন– পনির, আচার–চাটনি, সস, সয়া–সস, চিপস্, চানাচুর, লবণযুক্ত বাদাম, নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- ফাস্টফুড যেমন– চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন– বিস্কুট, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি।
- সফট্ ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে।
- চাইনিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

কাজ – হৃদরোগীর জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করার সময় খাদ্য সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?– একটি চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ–৪ : উচ্চরক্তচাপ

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, বংশগত কারণ, ওজনাধিক্য, বিপাকীয় ত্রুটি ইত্যাদি কারণে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। ঔষধের পাশাপাশি যথাযথ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের ওজন

স্বাভাবিক রাখা এবং নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করাই উচ্চরক্তচাপ চিকিৎসার অর্থাৎ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায়।

উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হলে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ–

• নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধি নিষেধগুলো মেনে চলা • নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা • নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা • নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করা • মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা	• নির্দিষ্ট সময় ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠা। • ৬–৮ ঘণ্টা ঘুমানো • ধূমপান ও মদপান পরিহার করা • পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করা • প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা • শরীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় বা রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত হলে বা রক্তচাপ উঠানামা করলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।

উচ্চরক্তচাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন– শাকসবজি ও ফল বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন– লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- কচি ডাবের পানি উপকারী।
- ভাত ও রুটি এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না। সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও গমের ভুসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারী।
- মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাওয়া যাবে।
- ডাল, বাদাম খাওয়া যাবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টকদই খাওয়া।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।
- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য শক্তি গ্রহণ করা যাবে না।

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত–

- বেশি লবণযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে। যেমন– পনির, আচার–চাটনি, সস, চিপস্, চানাচুর ইত্যাদি।
- লবণে সংরক্ষিত যে কোনো খাবার, যেমন– নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- মাখন, ঘি, ডালডা, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- চর্বিযুক্ত মাংস ও এর তৈরি খাদ্য।
- ফাস্টফুড যেমন– চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।

- বেকারির খাবার যেমন– বিস্কুট, পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট্ ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে এবং সয়াসস, চাইনিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, আর নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিডনি নষ্ট হওয়া, স্ট্রোক হওয়া ও হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

কাজ – উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে প্রতিদিন কতো ঘণ্টা ঘুমাতে হয়?

ক) ৩–৪ ঘণ্টা   খ) ৪–৫ ঘণ্টা

গ) ৬–৮ ঘণ্টা   ঘ) ৯–১০ ঘণ্টা

২। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি কেন?

ক) এতে আশপাশে যারা থাকেন, কেউ কিছু মনে করে না।   খ) জীবনে চলার পথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না।

গ) নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয় না।   ঘ) উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস ঝর্ণার বয়স ৫০ বছর। চর্বিযুক্ত মাছ, মাংস, কুসুমসহ ডিম খাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাস। কয়েক দিন ধরে সে নানা রকম অসুবিধা বোধ করছে। তাই মিসেস ঝর্ণার মেয়ে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

৩। মিসেস ঝর্ণার কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ যুক্তিযুক্ত?

ক) সাদা আটার রুটি ও সাদা চালের ভাত   খ) পনির ও মাংসের কাবাব

গ) ননীতোলা দুধ ও টকদই   ঘ) কেক ও মিষ্টি দই

৪। মিসেস ঝর্ণার এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির কারণ–

i. স্নেহের আধিক্য

ii. প্রোটিনের আধিক্য

iii. কার্বোহাইড্রেটের আধিক্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মিসেস শীলার বয়স ৪৫ বছর। তার সংসারের রান্নার কাজ, কাপড় ধোয়ার কাজ, ঘরের কাজের জন্য দুজন গৃহকর্মী রয়েছে। তিনি প্রতিদিন দেরিতে ঘুম থেকে উঠেন। সকালে পরটা, মাংস, মিষ্টি, ডিম দিয়ে নাশতা করেন। তারপর খবরের কাগজ ও টি.ভি নিয়ে বসেন। দুপুরে গোসল করে খেয়ে দেয়ে ২ ঘণ্টা ঘুমান। দুই বেলাতেই মাছ, মাংস ছাড়া ভাত খান না। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি টি.ভি দেখে রাতের খাবার খেয়েই শুয়ে পড়েন। কিছুদিন পর তার দেহের ওজন অনেক বেড়ে যায় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ক. সুস্বাস্থ্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি কী?

খ. নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. মিসেস শীলার সঠিক খাদ্যাভ্যাস কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস শীলার জীবন প্রণালি সংশোধন না করলে তার শারীরিক জটিলতা থেকে উত্তোরণ সম্ভব নয়– কথাটির সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর।

২। মাসুমা বেগম মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। তার দেহের ওজনও বেশি। অসুস্থ বাবা–মার দেখাশোনা, দুইবেলা তাদের ইনসুলিন দেওয়া ও খাবারের ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ করতে গিয়ে তিনি চলাফেরার কোনো নিয়মশৃঙ্খলা মানেন না। তিনি মিষ্টি, পায়েস, সফট্ ড্রিংকস, জুস খেতে পছন্দ করেন। মাসুমার শরীর খারাপ হলে চিকিৎসক তাকে ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বলেন।

ক. বিপাকজনিত একটি রোগের নাম লেখ?

খ. আঁশযুক্ত খাবার গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. মিসেস মাসুমাকে তাঁর বাবার জন্য কোন ধরনের খাদ্য ব্যবস্থা করতে হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস মাসুমার সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নিয়মতান্ত্রিক জীবন প্রণালি–বিশ্লেষণ কর।

২০১৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়
খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন

পরিবারের সবার দৈনিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করা হয়। এই খাদ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হয়। প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্যাদি সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়– যাকে বলা হয় খাদ্য পরিবেশন। খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ–১ : মেনু তৈরি

খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ নয়। খাদ্য গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যেসব খাদ্য খাওয়া হয় তা যেন শরীরকে কর্মক্ষম রাখে, ক্ষয়পূরণ করে ও বৃদ্ধিসাধন অব্যাহত রাখে এবং শরীরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলে। এ জন্য প্রয়োজন খাদ্যের সব উপাদানসমৃদ্ধ সুষম খাদ্যের। সুষম ও পুষ্টিকর আহারই দেহের প্রতিটি অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি সরবরাহ করে দেহকে সুস্থ রাখতে পারে। এ জন্য বয়স (শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ) পরিশ্রমের ধরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হয়। এই পরিকল্পনার উপায় হলো 'মেনু তৈরি।'

প্রতিদিনের আহারে কী কী খাদ্য পরিবেশন করা হবে তার জন্য মেনু পরিকল্পনা করা উচিত। মেনু পরিকল্পনায় পরিবারের বাজেট বা আয় অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের রুচি, চাহিদা, বয়স, খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পরিবারের তিন বেলার আহার ছাড়া শিশুর পরিপূরক খাবার, রোগীর পথ্য, বিয়ে, জন্ম দিন, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি যে কোনো উপলক্ষেই খাদ্য প্রস্তুতের আগেই একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া ভালো। মেনু তৈরির মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে খাদ্যের তালিকা তৈরি করা হয়। মোটকথা মেনু পরিকল্পনা খাদ্যের একটি তালিকা বিশেষ। অর্থাৎ যে কোনো খাদ্য ব্যবস্থায় কী খাবার পরিবেশন করা হবে তা স্থির করে যে লিখিত খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয় তাকেই মেনু বলে। মেনু পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম, আকর্ষণীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা যায়।

মেনু তৈরির বিবেচ্য বিষয়

মেনু তৈরির মাধ্যমে যাতে পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থা সুষম হয় সে জন্য কতোগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। সেগুলো নিম্নরূপ–

❖ **বয়স** : একটা পরিবারে বিভিন্ন বয়সের লোক থাকে। বিভিন্ন বয়সের লোকদের খাদ্যের চাহিদার ভিন্নতার বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন। যেমন : শিশুর সঠিক বৃদ্ধির জন্য দুধ–জাতীয় খাবারের প্রাধান্য দিতে হয়। বৃদ্ধ ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য দরকার। পরিবারের গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়ের জন্য স্বাভাবিক মায়ের তুলনায় বেশি ক্যালরি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

❖ **শ্রম** : পরিশ্রমের ধরন ক্যালরির চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাই মেনু তৈরির সময় পরিবারের সদস্যদের পরিশ্রমের মাত্রা যাচাই করে পর্যাপ্ত ক্যালরিবহুল খাদ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে। যেমন: বিশেষ করে যারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে তাদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ বেশি থাকা ভালো। অপর দিকে হাল্কা পরিশ্রমী বা যারা মানসিক শ্রম করে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি যাদের শারীরিক পরিশ্রম কম তাদের জন্য কম কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ প্রয়োজন।

❖ **আয়–** মেনুতে পুষ্টিকর খাদ্য সংযোজনের বিষয়টি একটা বাজেটের উপর নির্ভর করে। আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ মাসব্যাপী পুষ্টিকর খাদ্য যোগান দিতে হয়। সুষম খাদ্যের উপাদান অল্প মূল্যের খাদ্য থেকে সংগ্রহ করে স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত। খাদ্যের মূল্য কমানোর জন্য সুষম খাদ্যের উপাদানসমূহ বাদ দেওয়া চলবে না। তাই দামি খাবারের পাশাপাশি তুলনামূলক সস্তা অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

❖ **আবহাওয়া ও মৌসুম–** আমাদের দেশে ঋতু ভেদে বিভিন্ন ফলমূল, তরিতরকারির সমাগম ঘটে। এগুলো পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং সহজলভ্য হয়ে থাকে। খাদ্য তালিকায় মৌসুমি খাদ্যদ্রব্য সংযোজন করলে স্বাদেও বৈচিত্র্য আসে এবং মূল্য সাশ্রয়কারী খাদ্য তালিকাও বানানো যায়।

❖ **লিঙ্গ–** ছেলে–মেয়েভেদে খাদ্যের চাহিদা ভিন্ন হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দেহের আয়তন, ওজন ও পেশির পরিমাণ কম। এ জন্য মেয়েদের ক্যালরি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

❖ **উপলক্ষ–** পরিবারের সদস্যসংখ্যা, আর্থিক সঙ্গতি, রুচি ইত্যাদি বিবেচনা করে দৈনিক খাদ্য তালিকা তৈরি করা যায়। তবে ছোট বা বড় যে কোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেনু একটি আকর্ষণের বিষয়। কেননা এতে সাধারণ খাবারের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, মিলাদ, ঈদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেনু তৈরিতে বতিক্রম থাকে।

❖ **বৈচিত্র্য সৃষ্টি–** মেনুতে নানা রং, নানা আকার, নানা প্রকৃতি এবং নানা পদ্ধতিতে রান্না করা খাবার দিয়ে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করা যায়। মেনুতে সব খাবারই যদি সাদা বা একই রংয়ের হয় তাহলে দেখতে আকর্ষণীয় হয় না। তেমনি সব খাবারই যদি নরম ও শুকনা হয় তাহলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না।

বিভিন্ন রঙের খাবার– যেমন- টমেটো, গাজর, কলা, মটরশুঁটি, দুধ, দই, ভাত, জর্দা ইত্যাদি।

বিভিন্ন আকারের খাবার– যেমন- সিঙ্গারা, স্যান্ডউইচ, পাউরুটি, কেক, নিমকি ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকৃতির খাবার– যেমন- সুপ, ক্ষীর, হালুয়া, কাস্টার্ড, পুডিং, পাপড়, চিপস ইত্যাদি।

❖ **এক পরিবেশন পরিমাপ–** মেনুতে তালিকাভুক্ত খাবারগুলো কতোজন লোক গ্রহণ করবে তার উপর খাবারের মোট পরিমাণ নির্ভর করে। মেনুতে যেসব খাদ্য রাখা হয় তার প্রতিটি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তত এক পরিবেশন পরিমাণ বরাদ্দ করতে হয়। যেমন- রান্না করা শাক এক পরিবেশন = ১/৩ কাপ।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ–

টাটকা দুধ	১ কাপ
দই	১/২ কাপ
আইসক্রিম	১/২ কাপ
রসগোল্লা	১ টা

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ–

কাঁটা ছাড়া মাছ	৩০ গ্রাম
হাড় ছাড়া মাংস	৩০ গ্রাম

ডিম	১ টা
ডাল	২৫ গ্রাম

শাক–সবজি, ফল এক পরিবেশন পরিমাণ–

রান্না করা শাক	১/৩ কাপ
রান্না করা সবজি	১/২ কাপ
সালাদ	১/২ কাপ
ফল মাঝারি আকার	১টি

শস্য জাতীয় খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ–

ভাত	১ কাপ
আটার রুটি	২টি
পাউরুটি	২ টুকরা
আলু	১৮০ গ্রাম

এ ছাড়া মেনু তৈরি করার সময় পরিবেশনের ধরন, সঠিক রেসিপির ব্যবহার, তৈজসপত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির সুবিধা, দক্ষ রন্ধনকারী, উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

নমুনা : একটি পরিবারের এক দিনের মেনু।

পরিবেশন সংখ্যা ০৫

সময়	স্বল্প মূল্যের খাবার	দামি খাবার
সকালের নাশতা	আটার রুটি, সবজি ভাজি, কলা, চা	পরোটা, ডিম ভাজা, আপেল, কফি
দুপুরের খাবার	সাধারণ চালের ভাত, ডাল, শাক, ছোট মাছ, লেবু, কাঁচা মরিচ	চিকন চালের ভাত, বড় মাছের তরকারি, সালাদ
বিকাল	মুড়ি মাখা, চা	ফলের রস/কফি, কেক
রাতের খাবার	ভাত, ডিমের তরকারি, ডাল, আলু ভর্তা	ভাত, মুরগির ঝোল, আলুর চপ, সালাদ

পাঠ–২ : রেসিপির প্রয়োজনীয়তা

সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মেনু অর্থাৎ খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয়। এই খাদ্য তালিকায় খাদ্যগুলো তখনই মুখরোচক, আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠে যখন তা সঠিক পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। রান্নার কাজটা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও প্রায়ই দেখা যায় কোনো না কোনো ত্রুটি থেকে যায়। একই খাবার একবার মানসম্মত ও সুস্বাদু হলেও পরবর্তী সময় আবার সে রকম মজাদার নাও হতে পারে। কিন্তু একই পদ্ধতিতে এবং পরিমাণমতো উপকরণ দিয়ে রান্না করলে প্রতিবারই রান্না করার বস্তুর মান একই রকম রাখা যায়। এ কারণেই তৈরি হয়েছে রেসিপি। রেসিপি এমন একটা নির্দেশক যা কীভাবে এবং কী কী উপকরণ কী পরিমাণ

২০১৫

ব্যবহার করে রান্না করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। সুতরাং রেসিপি বলতে বোঝায় রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের তালিকা, পরিমাণ, রন্ধন পদ্ধতির লিখিত পথ নির্দেশ বিশেষ।

রান্নাকরা প্রতিটি খাদ্যেরই নিজস্ব উপকরণ, পরিমাণ ও রন্ধন পদ্ধতি থাকে। যেমন– পুডিং, আলুর চপ, কাবাব ইত্যাদি।

রেসিপিতে রান্নার সময় সম্পর্কযুক্ত যে তথ্যগুলো দেওয়া হয় সেগুলো হলো–	
• খাবারের নাম	• ব্যবহৃত উপকরণের নাম
• উপকরণের পরিমাণ	• রান্নায় ব্যবহৃত মাংস কিংবা তরকারির কাটার ধরন
• রান্নার ধারাবাহিক ধাপসমূহ	• রান্নায় ব্যবহৃত তাপমাত্রা
• সময়	• পরিবেশন সংখ্যা
• পরিবেশনের ধরণ	

রেসিপি কী কাজে লাগে–

- রেসিপি থেকে খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো মেপে নেওয়া হয় ফলে কোনো জিনিসের অপচয় হয় না।
- আদর্শ রেসিপিতে পরিবেশন সংখ্যা উল্লেখ থাকে। ফলে কতোজন লোক খেতে পারবে তা সহজেই অনুমান করা যায় এবং পরিবেশনের কাজটি সহজ হয়।
- রেসিপি অনুসরণ করে যে কোনো নতুন রান্না আয়ত্তে আনা যায়। মেনুর সাথে রেসিপির নির্দেশনা থাকলে দক্ষ পাঁচক অতি সহজেই তা অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।
- পাচকদের নিকট রেসিপি থাকলে রান্না করা খাবারের মান ও পরিমাণ যাচাই করতে সুবিধা হয়।

রেসিপি ব্যবহার করার সময় লক্ষণীয় বিষয়–

- রেসিপি সঠিকভাবে বুঝে অনুসরণ করতে হবে।
- রেসিপিতে উল্লিখিত পরিমাণমতো উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- কোনো উপকরণ বাদ দেওয়া ঠিক নয়।
- রেসিপিতে লেখা কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে।
- যে অবস্থায় (গরম, ঠান্ডা, তরল, কঠিন) খাবার পরিবেশন করার কথা উল্লেখ থাকবে সেইভাবেই করতে হবে।
- রেসিপিতে নির্দেশিত রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- রেসিপি বুঝতে হলে খাদ্যের মাপ, ওজন, রান্নার সরঞ্জাম, রান্নার কৌশল ও পদ্ধতি, উপকরণ ও মসলা এবং বিনিময় বা বিকল্প খাদ্য সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

কাজ : খাদ্য প্রস্তুতকরণে রেসিপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৩ – খাদ্য প্রস্তুত

মেনু তৈরি করার পর খাদ্য প্রস্তুত করার প্রস্তুতি নিতে হয়। খাদ্য প্রস্তুতকরণের পূর্বে কতোগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়–

- কী খাদ্য প্রস্তুত করা হবে তা মেনু অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।
- যে যে খাদ্য প্রস্তুত করা হবে সেই খাদ্য তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুত করার আগে সঠিক রেসিপি জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া যায়।
- কাঁচা মাছ–মাংস, শাকসবজি বেছে, কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- সঠিক রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেমন : খাবার ঢেকে রান্না করা, বেশি তাপে খাদ্য রান্না না করা ইত্যাদি।
- খাদ্য প্রস্তুত করার সাথে সাথে পরিবেশনের প্রস্তুতি নিতে হয়।
- খাদ্য প্রস্তুতের পর পরই খাদ্য গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

এখন আমরা পুডিং ও সবজি নিরামিষ প্রস্তুত প্রণালি আলোচনা করব।

রেসিপির নমুনা–

নমুনা – ১ পুডিং

উপকরণ	পরিমাণ	প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণ (পরিবেশন সংখ্যা)
ডিম	৩ টি	৫০০ গ্রাম প্রায়
দুধ	৫০০ গ্রাম (ঘন)	৪ পরিবেশন
চিনি	৩ টেবিল চামচ	
ভেনিলা এসেন্স	৪ ফোঁটা	

প্রস্তুত প্রণালি :

- পুডিং তৈরি করার পাত্রে চিনি ক্যারামেল (উনুনের উপরে বেশি তাপে চিনি গলিয়ে বাদামি রং করা) করে নিতে হবে।
- অপর একটি পাত্রে ডিমগুলো ভালোভাবে ফেটাতে হবে। ফেটানো ডিমের সাথে দুধ চিনি মেশাতে হবে।
- পুডিং তৈরির পাত্রটি ঠান্ডা করে তাতে উক্ত মিশ্রণটি (ডিম–দুধ–চিনির) ঢালতে হবে।

২০১৯

- বড় সসপ্যানে ফুটানো পানি দিয়ে দুধ–ডিম মেশানো পাত্রটি মুখ বন্ধ করে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে পাত্রটির ১/৩ অংশ পানিতে ডুবে থাকে।
- চুলার আঁচ মাঝামাঝি করে ১ ঘণ্টা ফুটাতে হবে।
- পুডিং সম্পূর্ণরূপে জমে গেলে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।
- ঠাণ্ডা হলে ছুরি দিয়ে পুডিং–এর চারদিক ছাড়াতে হবে। প্লেটে তৈরি করা পুডিং–এর পাত্রটি উল্টে পুডিং ঢেলে নিতে হবে।

পরিবেশন সংখ্যা– প্রস্তুতকৃত পুডিংয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০০ গ্রাম। দুগ্ধজাত খাদ্য পুডিংয়ের এক পরিবেশন পরিমাণ = ১/২ কাপ বা ১২৫ গ্রাম। এর ফলে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিবেশ সংখ্যা ৪ অর্থাৎ ৪ জন খেতে পারবে।

রেসিপির নমুনা–২

খাদ্যের নাম– সবজি নিরামিষ

উপকরণ	পরিমাণ	প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণ (পরিবেশন সংখ্যা)
মিষ্টি কুমড়া	২০০ গ্রাম	১ কেজি
বেগুন	১০০ গ্রাম	১০ পরিবেশন
পটোল	২০০ গ্রাম	
পেঁপে	২০০ গ্রাম	
আলু	৩০০ গ্রাম	
আদা বাটা	১ চা চামচ	
রসুন কাটা	১/২ চা চামচ	
হলুদের গুঁড়া	১/২ চা চামচ	
মরিচের গুঁড়া	১/২ চা চামচ	
ধনের গুড়া	১ চা চামচ	
জিরার গুঁড়া	১/২ চা চামচ	
পেঁয়াজ কুচি	১/২ কাপ	
লবণ	২ চা চামচ	
চিনি	পরিমাণমতো	
কাঁচা মরিচ	১/৪ চা চামচ	
তেজপাতা	২টি	
তেল	১০০ গ্রাম	
পাঁচ ফোড়ন	পরিমাণ মতো	

প্রস্তুত প্রণালি :

- সবধরনের সবজিগুলো কাটার আগে ভালো করে ধুতে হবে।
- সবজিগুলো পছন্দমতো টুকরা করে কেটে নিতে হবে।
- গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি, বাটা ও গুড়া মসলাগুলো কষিয়ে নিতে হবে।
- বেগুন ও মিষ্টি কুমড়া ছাড়া বাকি সব সবজি লবণ দিয়ে নেড়ে নিতে হয় ৩–৪ মিনিট পর ১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- পানি ফুটলে বেগুন, মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ভালো করে ঢেকে মৃদু জ্বালে রাখতে হবে।
- ১০–১৫ মিনিট পর সবজি সিদ্ধ হলে কাঁচা মরিচ, চিনি ও টালা পাঁচফোড়নের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে।
- সবজির পানি শুকিয়ে তেল উপরে উঠলে চুলা থেকে নামাতে হবে।

পরিবেশনের সংখ্যা– এই রেসিপিতে রান্না করা সবজির পরিমাণ ১ কেজি। রান্না করা সবজির ১ পরিবেশন = ১/২ কাপ। এটা দশজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকে অন্তত ১ পরিবেশন পরিমাণ পাচ্ছে– যা একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা মেটায়।

পাঠ–৪ : খাদ্য পরিবেশন

খাদ্য যথাযথভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। খাদ্য পরিবেশন হচ্ছে একটা কৌশলগত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়।

যে পদ্ধতিতে মেনু অনুযায়ী প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যটি কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গের গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয় তাকে খাদ্য পরিবেশন বলে।

সুন্দর পরিবেশনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। বাড়িতে, বাইরে কিংবা বিভিন্ন উৎসবে খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা সুন্দর ও সুষ্ঠু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশনের সাথে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক আচার–আচরণ সম্পর্কযুক্ত। জাতিগত, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় বিবেচনা করা দরকার।

টেবিল সাজানো

সাধারণত খাবার যখন টেবিলে সাজানো হয় সেটাই পরিবেশন। খাবার আগে টেবিল গোছানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ার কাজটি সহজ ও আনন্দময় করা। খাবার টেবিলে খাদ্য গ্রহণের আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বাসনপত্র সুসজ্জিত থাকলে তা আহারে তৃপ্তি বাড়ায়।

টেবিল সাজানোর ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ–

- টেবিলে কাপড় বিছানো ও ম্যাট সাজানো।
- সজ্জামূলক সামগ্রী দিয়ে সাজানো যেমন– খাবার টেবিলের উপযোগী পুষ্পবিন্যাস করা, খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী টেবিল–চেয়ারের ব্যবস্থা করা।

- খাবারের পাত্র সাজাতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঘরোয়া কিংবা আনুষ্ঠানিকতার মাত্রা ও রীতি অনুযায়ী সাজাতে হয়।
- খাদ্য গ্রহণের টেবিল বা স্থানটি সুবিন্যস্ত এবং শান্ত ও মনোরম পরিবেশে হওয়া দরকার। এ জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত পরিবেশ।

আনুষ্ঠানিক পরিবেশন

কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হয় তাকেই আনুষ্ঠানিক ভোজ বলে। এ ধরনের ব্যাপক আয়োজন সাধারণত : রাষ্ট্রীয় ভোজ, সামাজিক আচার–আচরণ, বাৎসরিক প্রীতিভোজ, বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ ছাড়া হোটেল, রেস্তোরাঁর খাবার পরিবেশনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। আনুষ্ঠানিক ভোজের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

- আনুষ্ঠানিক ভোজে পদমর্যাদা অনুযায়ী চেয়ার, টেবিল সাজানো হয়ে থাকে।

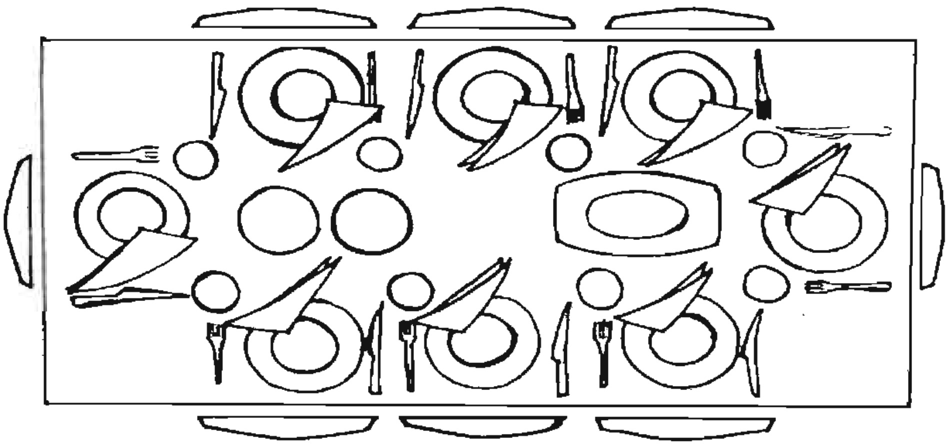

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন

- আনুষ্ঠানিক ভোজের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রত্যেক অতিথির জন্য এককভাবে প্রতিটি খাবারের পরিবেশনের জন্য একক মোট পরিমাণ (unit) সাজানো থাকে অথবা পরিবেশনকারী পর্যায়ক্রমে পরিবেশন করে থাকে।
- সাধারণত আনুষ্ঠানিক ভোজে প্রধান অতিথির টেবিলের বিপরীত দিকে নিমন্ত্রণকারী বা হোস্ট/হোস্টেস বসার রীতি।
- আনুষ্ঠানিক ভোজে একই সাথে সব খাদ্য টেবিলে সাজানো থাকে না। বরং পরিবেশনকারী প্রধান খাদ্য থেকে শুরু করে খাবার শেষে বিভিন্ন ডেজার্ট (ফলমূল/মিষ্টি/পানীয় ইত্যাদি) পরিবেশন পর্যন্ত সব খাদ্যই পর্যায়ক্রমে সরবরাহ করে থাকে।
- আনুষ্ঠানিক ভোজকে আকর্ষণীয় করার জন্য পরিবেশন টেবিলের কেন্দ্রীয় সজ্জায় আলো ও পুষ্পসজ্জা করা হয়।

- যদি পরিবেশনকারী ডান দিক থেকে পরিবেশন শুরু করে তবে সে তার ডান হাত দিয়েই প্লেট, গ্লাস অথবা আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র, খাবার এবং খাবার দিবে এবং ডান হাত দিয়ে খাওয়া শেষে সরিয়ে নেবে আবার বাম দিক থেকে পরিবেশন করতে হলে পরিবেশনকারীকে বাম দিকে দাঁড়িয়ে বাম হাত দিয়ে সবকিছু সরিয়ে নিতে হবে এবং দিতেও হবে।

পাঠ ৫ – বু–ফে পরিবেশন

অতিথির সংখ্যা বেশি হলে, জায়গা কম থাকলে এবং বিশেষ বা প্রধান অতিথি না থাকলে বু–ফের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে উৎসবগুলোও অনানুষ্ঠানিক হয়ে থাকে। যেমন– জন্মদিন, আকিকা, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি।

বু–ফে পরিবেশনের রীতি–

- বিভিন্ন জায়গায়, বাসার লনে বা লম্বা বারান্দায় অথবা খোলা বাগানে, হলরুমে ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি টেবিলে একই ধরনের খাবার সরবরাহ করা হয়।
- খাবার গ্রহণের প্লেট, গ্লাস, চামচ, কাপ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি একটি টেবিলে সুন্দরভাবে রাখা হয়।
- টেবিলের দুই পাশে একইভাবে অথবা টেবিলের চারপাশে একইভাবে খাবারগুলো সাজালে যে কোনো পাশ থেকে অতিথিরা প্রত্যেক প্রকার খাবার প্লেটে নিয়ে স্বাধীনভাবে পছন্দমতো জায়গায় বসে গল্প–গুজবের মধ্য দিয়ে আনন্দের সাথে খাবার উপভোগ করতে পারেন।

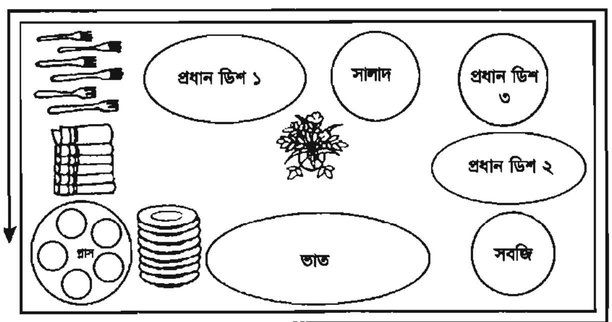

বু–ফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন

কাজ – খাদ্য পরিবেশনে কোন পদ্ধতিটিকে তুমি যুগোপযোগী মনে কর এবং কেন?

পাঠ–৬ : প্যাকেট পরিবেশন

বিভিন্ন খাবারকে মোড়কজাত করে পরিবেশন করাকে প্যাকেট পরিবেশন বলা হয়। সময়ের স্বল্পতা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার বাড়তি ঝামেলা এড়ানো ইত্যাদি কারণে আজকাল প্যাকেট পরিবেশনের কদর বেড়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন– মিলাদ,

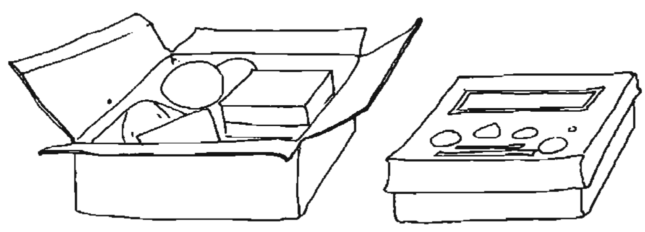
প্যাকেট পরিবেশনের নমুনা

সেমিনার, ইফতার পার্টি কিংবা স্কুল–কলেজের অনুষ্ঠানে প্যাকেট পরিবেশনের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

প্যাকেট পরিবেশনে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা সুষম, আকর্ষণীয়, রুচিকর এবং বহনে সুবিধা করার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন –

- মোড়কজাত খাবার শুকনা ও হালকা হলে পরিবেশন করতে সুবিধা হয়।
- মোড়কজাত খাবারের মেনু তৈরি করার সময় খাদ্যের চারটি মৌলিক বিভাগ থেকে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।
- উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিনের সমন্বয় করা হলে মোড়কজাত খাবারের পুষ্টিমূল্য বাড়ে।
- একঘেয়েমি দুর করার জন্য মৌসুমি ফল, মুড়কি, পিঠা প্রভৃতি দেওয়া যায়।
- খাবারের ঘনত্ব এমন হওয়া উচিত যাতে প্যাকেট ভিজে না যায়।
- স্কুলের বাচ্চাদের জন্য যখন প্যাকেটে লাঞ্চ পরিবেশন করা হয় তখন তা পুষ্টিকর ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত এবং ক্যালরি ও প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা ১/৩ – ১/৪ অংশ এই লাঞ্চ দ্বারা পূরণ করা উচিত।
- প্যাকেট পরিবেশনের উপযোগী মেনু যেমন –

– সিঙারা/সমুচা, লাড্ডু/সন্দেশ, পনির, আপেল/কলা।

– ডালপুরি, কাবাব, সন্দেশ, সালাদ।

– স্যান্ডউইচ, সালাদ (শসা, গাজর), যে কোনো শুকনা মিষ্টি।

– সবজি পাকোরা, মিষ্টি, কলা।

কাজ : প্যাকেট পরিবেশনের মেনু তৈরি কর এবং মূল্যায়ন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আদর্শ রেসিপিতে কোনটি উল্লেখ থাকে?

ক) খাবারের নাম খ) পরিবেশন সংখ্যা

গ) উপকরণ ঘ) রন্ধন পদ্ধতি

২। রেসিপি অনুসারে খাবার রান্না করলে–

i. খাবারে নতুনত্ব আনা যায়

ii. উপকরণ বাদ পড়ে যায়

iii খাবারে পরিবেশন সংখ্যা ঠিক থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের ছক অনুযায়ী ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উপকরণ	পরিমাণ	পরিবেশন সংখ্যা
ডিম	৬ টা	
দুধ	১ কেজি	
ভেনিলা এসেন্স	৮ ফোঁটা	
চিনি	৬ টেবিল চামচ	

৩। উপরোক্ত পুডিং কতো পরিবেশন হতে পারে।

ক) ৪ খ) ৬

গ) ৮ ঘ) ১০

৪। উপরোক্ত পুডিং দ্বারা ৫ জনকে আপ্যায়ন করা হলে–

i অর্থের অপচয় হতে পারে।

ii খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে।

iii পরিবেশনে সমস্যা হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মেয়ের জন্মদিনে রাবেয়া বেগম তার ছোট বাসায় অনেককে আমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজ হাতে রান্না করা থেকে শুরু করে টেবিলে খাবার সাজানো সব একাই করেন। খাবার পরিবেশনের পূর্বমুহূর্তে তিনি দেখলেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেম করা হয় নি। খাবার পরিবেশনের সময় একসাথে সবাইকে বসাতে না পেরে তিনি বিব্রতবোধ করলেন।

ক. রেসিপি কী?

খ. খাদ্য পরিবেশন বলতে কী বোঝায়?

গ. একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেম বাদ পড়ার কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. খাবার পরিবেশনের বৈচিত্র্যতাই পারত তার বিব্রতবোধ অবস্থা রোধ করতে– বিশ্লেষণ কর।

২। মালা মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী। দুই সন্তান স্কুলে পড়ে, স্বামী ও বৃদ্ধ মা–বাবা নিয়ে তার পরিবার। তার বাচ্চাদের মাংস–জাতীয় খাবার বেশি পছন্দ। তাদের কারণে প্রায় দিনই মাংস রান্না করা হয়। কিছুদিন হলো তার মায়ের বুকে ব্যথা করছে। ডাক্তার তার খাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে বললেন।

ক. মেনু কাকে বলে?

খ. খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. মালার মায়ের অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মালার পরিবারে সকলের সুস্থতার জন্য সঠিক মেনু পরিকল্পনা অতি গুরুত্বপূর্ণ–তোমার মতামত দাও।

ঘ – বিভাগ

বস্ত্র ও বয়ন তন্তু

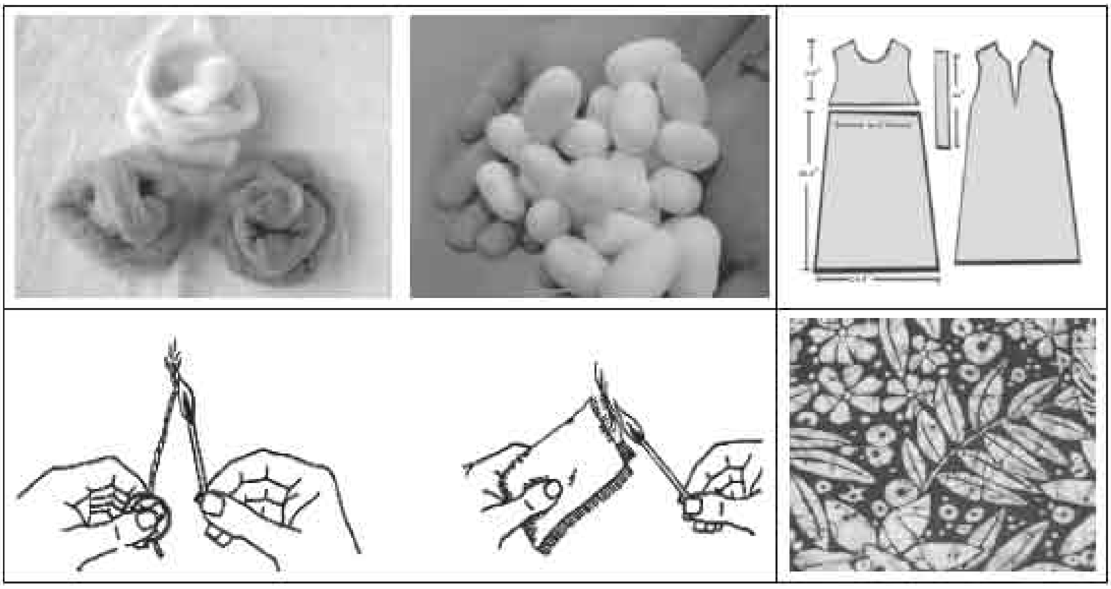

এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা –

- তন্তুর শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- তন্তু শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারব ;
- বর্ণচক্র বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- বর্ণচক্রের মাধ্যমে দেহের ত্বক এবং শারীরিক কাঠামো অনুসারে পোশাকের রং নির্বাচন করতে পারব ;
- পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রেখা, জমিন এবং নকশার ক্ষেত্রে শিল্পনীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বস্ত্রছাপার প্রকার এবং পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ড্রাফটিংয়ের নিয়ম জেনে পোশাক প্রস্তুত করতে উদ্বুদ্ধ হব ;
- ফতুয়া ও বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং করে সঠিক মাপে তা প্রস্তুত করে দেখাতে পারব ;
- বিভিন্ন নকশার বেবি ফ্রক তৈরি করে প্রদর্শন করতে পারব ;
- বস্ত্র ধৌতকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির বর্ণনা করতে পারব ;
- বিভিন্ন ধরনের পোশাক ধৌতকরণ ও সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে পারব।

চতুর্দশ অধ্যায়
বয়ন তন্তু

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। সৃষ্টির আদিতে মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য কোনো বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা ও শীত-তাপ থেকে আত্মরক্ষা ছাড়াও নানাবিধ প্রয়োজনে বস্ত্র পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে রুচির পরিবর্তন হওয়ায় বস্ত্র পরিচ্ছদেও নানা বৈচিত্র্যতা দেখা দিয়েছে। মানুষ তার প্রয়োজনে নানা রকম তন্তু আবিষ্কার করেছে এবং করছে। বস্ত্র তৈরি হয় মূলত সুতা থেকে, এই সুতা আবার তৈরি হয় আঁশ বা তন্তু হতে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় আঁশকে সুতায় পরিণত করা হয়। তবে এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সব রকম আঁশ বা তন্তু বস্ত্র বয়নের উপযোগী নয়। এই বয়ন তন্তুর উৎস প্রকৃতি হতে পারে আবার কৃত্রিমও হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র তৈরির উপকরণ ছিল সুতি, লিনেন, রেশম ও পশম তন্তু। পরবর্তীতে রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন, সরণ ইত্যাদি নামের অনেক কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি বয়ন তন্তুর বৈশিষ্ট্য সাধারণত ভিন্ন হয়। তাই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বয়নতন্তু ব্যবহার করতে হলে সেই তন্তুটির বৈশিষ্ট্য জানা ও শনাক্ত করা প্রয়োজন হয়।

পাঠ-১ : বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তু

সাধারণত বস্ত্র তৈরি হয় সুতা থেকে। তাই সুতাকে বস্ত্রের ক্ষুদ্রতম মৌলিক একক বলে মনে করা হতো। কিন্তু এ ধরনের সুতা আবার কতগুলো আঁশ বা তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। তন্তু বলতে যে কোনো প্রকার আঁশ বোঝালেও বস্ত্রশিল্পে তন্তু বলতে বয়ন তন্তুকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বস্ত্র তৈরির কাজে যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তাকেই বয়ন তন্তু বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বস্ত্রের মৌলিক ক্ষুদ্রতম এককই বয়ন তন্তু। ল্যাটিন শব্দ টেক্সো (Texo) থেকে টেক্সটাইল (Textile) শব্দের উৎপত্তি। টেক্সো কথাটির অর্থ হচ্ছে- বুনন করা। এ জন্য বস্ত্রের তন্তুকে বয়ন তন্তু বা টেক্সটাইল ফাইবার বলা হয়।

সাধারণত যেসব গুণ থাকলে কোনো আঁশ বা তন্তুকে বয়ন তন্তু হিসেবে গণ্য করা যায় সেসব বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে কিছু আছে মুখ্য বা প্রধান এবং কিছু রয়েছে গৌণ বা মাধ্যমিক গুণাবলি। প্রধান বা মুখ্য গুণাবলিগুলো হলো - দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত, তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি, নমনীয়তা, সমরূপতা, আসঞ্জনপ্রবণ ইত্যাদি। অন্যদিকে গৌণ বা মাধ্যমিক গুণাবলিগুলোর মধ্যে রয়েছে- রেসিলিয়েন্সি, উজ্জ্বলতা, স্থিতিস্থাপকতা, বিশোষণ, তাপ পরিবাহিতা, সংকোচন ইত্যাদি। নিচে বয়ন তন্তুর গুণাবলি উল্লেখ করা হলো-

মুখ্য গুণাবলি –

১। **দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত (Length to width ratio)** - বয়ন তন্তুর ব্যাসের চেয়ে দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে বড় হতে হবে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক তন্তুতেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত তন্তুর ব্যাস যত সূক্ষ্ম হবে, তন্তু তত নমনীয় ও মসৃণ হবে।

২। **তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি (Tenacity)** - বয়ন তন্তুর পর্যাপ্ত শক্তি থাকতে হবে। ন্যূনতম শক্তি না থাকলে তন্তুকে সুতা বা বস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে তন্তু কতোটুকু টান সহ্য করতে পারে তা দিয়েই তন্তুর শক্তি প্রকাশ করা হয়।

২০১৬

৩। **নমনীয়তা (Flexibility)** - বয়ন তন্তুর তৃতীয় মুখ্য গুণাবলি হচ্ছে নমনীয়তা। যেহেতু সুতা ও বস্ত্র ভাঁজ করতে হয়, তাই বস্ত্রে ব্যবহৃত তন্তুকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। নমনীয়তার জন্যই বয়নতন্তু দিয়ে সুতা পাকানো যায়।

৪। **আসঞ্জনপ্রবণ (Cohesiveness)** - এ বৈশিষ্ট্যের কারণে ছোট ছোট আঁশগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। যার ফলে তন্তু থেকে উৎপাদিত সুতা বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গৌণ গুণাবলি –

১। **রেসিলিয়েন্সি (Resiliency)** - তন্তুকে ভাঁজ করা, মোচড়ানো বা কুঁচকানোর পর আগের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাকে রেসিলিয়েন্সি বলে। বস্ত্রের কুঞ্চন প্রতিরোধের জন্য তন্তুর এ গুণটি থাকা উচিত। যেসব বস্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা ভালো তাদের রেসিলিয়েন্সিও ভালো হয়।

২। **উজ্জ্বলতা (Luster)** - একটি তন্তুর নিজস্ব চাকচিক্য, মসৃণ ও দীপ্তিময় ভাবই তার ঔজ্জ্বল্য। উজ্জ্বলতা বয়ন তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের কারণেই একে তন্তুর রানী হিসেবে গণ্য করা হয়। আজকাল বিভিন্ন ধরনের তন্তুতে সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকচিক্য সৃষ্টি করা যায়।

৩। **বিশোষণ (Absorbency)** - যেসব তন্তুর আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা ভালো, তাতে সহজেই রং ও ফিনিশ প্রয়োগ করা যায়। এরূপ তন্তুর বস্ত্র সহজে ধোয়া যায় এবং পরিধানের জন্য সুবিধাজনক হয়। যেসব বস্ত্রের বিশোষণ ক্ষমতা কম, তাদের তাড়াতাড়ি ধুয়ে শুকিয়ে নেয়া যায়।

৪। **স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)** - বয়ন তন্তুকে স্থিতিস্থাপক হতে হয় অর্থাৎ তন্তু টানলে প্রসারিত হবে এবং টান সরিয়ে নিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

৫। **সমরূপতা (Uniformity)** - সুতা তৈরিতে একই দৈর্ঘ্য–প্রস্থের নমনীয়, পাঁক বা মোচড় দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন তন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম তন্তুর মতো সমরূপ প্রাকৃতিক তন্তু পাওয়া সহজ নয়। তবে এই বৈশিষ্ট্যের ফলে তৈরি সুতার মান ভালো হয় এবং সুতা সমান ও মসৃণ হয়।

৬। **তাপ পরিবাহিতা (Heat conductivity)** - তাপ পরিবাহক হিসেবে ফ্ল্যাক্স তন্তুর স্থান সবার উপরে। তুলাও ভালো তাপ পরিবাহক হওয়ায় গরমকালে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। প্রোটিন তন্তু তাপ কুপরিবাহী। তাই সিল্ক ও উল শীতকালের পোশাকের জন্য উপযোগী।

কাজ – বয়ন তন্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণাবলি উল্লেখ করে দুটি চার্ট তৈরি কর।

পাঠ–২ : তন্তুর শ্রেণিবিভাগ

বহু বছর আগে থেকে বয়ন তন্তুর শ্রেণিবিভাগ বিভিন্নভাবে হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে শ্রেণিবিন্যাসের ধরনও বদল হয়েছে। প্রথম দিকের শ্রেণিবিভাগ ছিল বেশ সহজ সরল। যেমন– প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ, খনিজ ইত্যাদি। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের ফলে আগের শ্রেণিবিভাগ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। পরবর্তীতে একই গুণসম্পন্ন তন্তুদের এক দলে ফেলে শ্রেণিবিভাগ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে জনগণ একই শ্রেণিভুক্ত তন্তুগুলোর গুণাগুণ, যত্ন ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

উৎস অনুযায়ী বয়ন তন্তুকে প্রধানত : দুইভাগে ভাগ করা যায়–১। প্রাকৃতিক তন্তু এবং ২। কৃত্রিম তন্তু

১। **প্রাকৃতিক তন্তু (Natural fiber)**- প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যেও শ্রেণিভেদ রয়েছে। যেমন:–

(ক) **উদ্ভিজ্জ তন্তু (Vegetable fibers)**- উদ্ভিজ্জ তন্তু উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে পাওয়া যায়, যা সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। এরা সেলুলোজ ভিত্তিক হওয়ায় এদের সেলুলোজিক তন্তু বলে। এরা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে–

- **বীজ তন্তু (Seed hairs)**- বীজের চারপাশে যে আঁশগুলো অবস্থান করে তাদের বীজ তন্তু বলে। যেমন–তুলা, ক্যাপক ইত্যাদি।
- **উদ্ভিজ্জ বাকল বা বৃক্ষ কোষ তন্তু (Bast fibers)** - গাছের কান্ড থেকে এ তন্তু পাওয়া যায়। যেমন–পাট, ফ্ল্যাক্স, র‍্যামি, শণ ইত্যাদি।
- **পল্লব তন্তু (Leaf fibers)** - এদের ভাসকুলার ফাইবারও বলে। গাছের পাতা, মূল বা ডাটায় পাওয়া যায়। যেমন–পিনা, সিসাল ইত্যাদি।
- **বাদামের খোলস তন্তু (Nut husk fibers)** - যেমন– নারকেলের ছোবড়া থেকে প্রাপ্ত তন্তু।

(খ) **প্রাণিজ তন্তু (Animal fibers)** - প্রাণিজ তন্তু প্রাণী বা পোকামাকড় থেকে পাওয়া যায়। এদের মূল উপাদান প্রোটিন, তাই এদের প্রোটিন তন্তু বলেও গণ্য করা হয়। যেমন–

- **প্রাণিজ লোম তন্তু (Animal hair fibers)** - বিভিন্ন প্রজাতির ভেড়া ও ভেড়া–জাতীয় পশু যেমন– আলপাকা, মোহেয়ার, এঙ্গোরা ইত্যাদির লোমকে পশমতন্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- **প্রাণিজ নিঃসরণ তন্তু (Animal secretion fibers)** - রেশম বা গুটি পোকার লালা নিঃসৃত পদার্থ সিল্ক তন্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(গ) **খনিজ তন্তু (Mineral fibers)** - মাটির নিচে বিভিন্ন ধরনের কঠিন শিলার স্তরে স্তরে এক প্রকার আঁশ জমা হয়, যা এসবেসটস নামক বয়ন তন্তু হিসেবে স্বীকৃত। এরা আয়রন এবং এরূপ অন্যান্য ধাতু যেমন– সোডিয়াম, এলুমিনিয়ম বা ম্যাগনেশিয়ামের জটিল সিলিকেট হয়। এরূপ তন্তু এসিড, মরিচিকা ও আগুণ প্রতিরোধক্ষম।

(ঘ) **প্রাকৃতিক রাবার (Natural rubber)** - প্রাকৃতিক রাবারকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংকোচন করে বিভিন্ন প্রকার তন্তু ও সুতা তৈরি করা হয়।

প্রাকৃতিক তন্তুর শ্রেণিবিভাগ

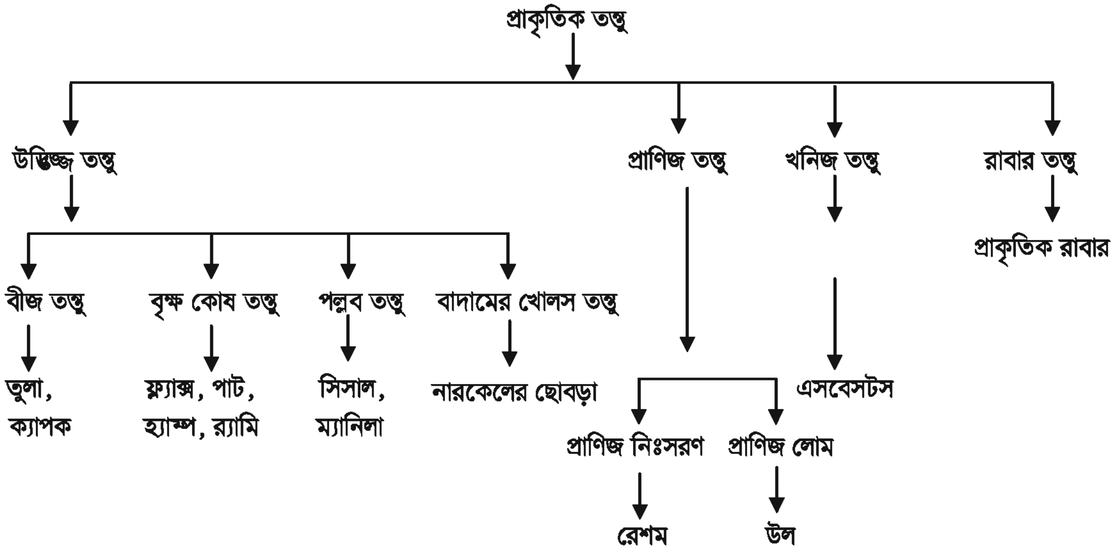

২। **কৃত্রিম তন্তু (Man made fiber)** - যে সব তন্তু প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়নি, মানুষ বিভিন্ন পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উদ্ভাবন ঘটিয়েছে, তাদের কৃত্রিম তন্তু বলে। কৃত্রিম তন্তুগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে কারখানায় তৈরি করা হয়। এসব তন্তুর কাঁচামাল প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক হতে পারে। এরূপ তন্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাই এদের খাটো বা লম্বা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। উৎস ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম তন্তুগুলোকে ছয়ভাগের ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) **সেলুলোজিক তন্তু** - ছোট তুলার আঁশ, বাঁশের বা কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক সেলুলোজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৃত্রিম সেলুলোজিক তন্তু উৎপাদন করা হয়। যেমন – কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, ভিসকোস রেয়ন ইত্যাদি।

খ) **পরিবর্তিত সেলুলোজিক তন্তু** - প্রাকৃতিক সেলুলোজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেলুলোজের গঠন পরিবর্তন করে এ ধরনের তন্তু উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সেলুলোজ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। যেমন– এসিটেট, ট্রাই– এসিটেট ইত্যাদি।

গ) **সাংশ্লেষিক তন্তু** – প্রাকৃতিকভাবে সেলুলোজভিত্তিক নয় এমন পদার্থ যেমন–কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যখন এমন পদার্থ সৃষ্টি করা যায়, যা তন্তুর গুণাবলি প্রকাশ করে– সেগুলোকে সাংশ্লেষিক তন্তু বলে। নানা প্রকার প্রাকৃতিক উপাদান যেমন– কয়লা, বায়ু, পানি, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে আলাদা করে নিয়ে আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একত্র করে এরূপ তন্তু উৎপাদন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে– নাইলন, পলিয়েস্টার, একরাইলিক, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদি তন্তু।

২০১৬

ঘ) **প্রোটিন তন্তু –** ধান, গম, প্রভৃতি শস্য এবং দুধের প্রোটিনকে রাসায়নিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে কৃত্রিম প্রোটিন তন্তুতে রূপান্তরিত করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে এরা সফলতা লাভ করে নি। যেমন– এজলন, ক্যাসিন ইত্যাদি।

ঙ) **খনিজ তন্তু –** বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এককভাবে বা সংমিশ্রণ অবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করে খনিজতন্তু তৈরি করা যায়। যেমন– সিলিকা, লাইমস্টোন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান একত্র করে গঠন করা হয় গ্লাস তন্তু ।

চ) **ধাতব তন্তু –** এলুমিনিয়ম, রূপা, সোনা প্রভৃতি ধাতুকে খনি থেকে বিভিন্ন অপদ্রব্যের সাথে উত্তোলন করার পর পরিশুদ্ধ করে নানা উপায়ে কৃত্রিম ধাতব তন্তু তৈরি করা হয়।

- **অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু –** এলজিনেট, টেফলন ইত্যাদিও মানুষ দ্বারা তৈরি তন্তু । সমুদ্র শৈবাল থেকে প্রাপ্ত এলজিনেট তন্তু পানিতে দ্রবীভূত হওয়ায় এরূপ তন্তুর গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম।

প্রাথমিক পর্যায়ে বয়ন তন্তুর জন্য প্রাকৃতিক উৎস ও যোগানের উপর নির্ভর করতে হলেও ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে মানুষ কৃত্রিম তন্তুর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। দেখা গেছে, ১৯০০ সাল থেকে কৃত্রিম তন্তুর উদ্ভাবন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৩০ সালের পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আরও ডজনখানেক কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারে সফল হন।

কাজ – প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর শ্রেণিবিভাগ পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৩–৪ : বিভিন্ন তন্তুর ব্যবহার

তুলা তন্তুর ব্যবহার – পোশাক পরিচ্ছদে তুলা তন্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা এর রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার ক্ষমতা। এই তন্তুর মূল্য তুলনামূলকভাবে কম, তাই এই তন্তুর তৈরি বস্ত্র–বিছানার চাদর, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, মশারি, লেপ, সোফার কাপড়, ন্যাপকিন, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি কম ব্যয়বহুল হয়। এ ছাড়া এর অর্থনৈতিক মূল্যও অনেক। কেননা এর যত্ন নেওয়া সহজ। পরিধেয় গুণাবলি ভালো হওয়ায় ভোক্তার কাছে এর চাহিদাও বেশি। সুতি বস্ত্র বেশ তাপ সহ্য করতে পারে, এজন্য ইস্ত্রি করার সময় বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় না। গরম পানি দিয়ে প্রয়োজনে সিদ্ধও করা যায়। সুতি বস্ত্র মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সব ঋতুতে ব্যবহার করা যায়। হালকা ওজনের বস্ত্রও প্রয়োজনে এ তন্তু দিয়ে তৈরি করা যায়। মূলত আরামের জন্যই সুতি বস্ত্র আজ তন্তুর রাজা হিসেবে সমাদৃত।

অনেকদিন যাবৎ সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকলে সুতি বস্ত্র হলুদ রং ধারণ করে এবং দুর্বল হয়ে যায়। স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় রাখলে তিলা পড়ে। এই তন্তু উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, ফুটন্ত পানিতে রাখলে এই তন্তুর কোনো ক্ষতি হয় না। ক্ষার দিয়ে সুতি বস্ত্র ধোয়া যায়। শক্তিশালী এসিডে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মৃদু এসিডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ব্লিচিং করা যায়, তবে ব্লিচিংয়ের ফলে কাপড়ের আয়ু হ্রাস পায়। তুলা তন্তুর রং ধারণ ক্ষমতা ভালো, পানিতে ভিজলে তুলা তন্তুর শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাই ধোয়ার সময় চাপ ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে।

ফ্ল্যাক্স তন্তুর ব্যবহার – ফ্ল্যাক্স খুব শক্তিশালী তন্তু । এটা দিয়ে সূক্ষ্ম সুতা ও মসৃণ লিনেন বস্ত্র তৈরি করা যায়, যা খুব মজবুত ও ঠান্ডা। এরূপ বস্ত্র পরিধানে আরাম বোধ হয়, এগুলো সহজেই ধোয়া যায়। আকর্ষণীয়, অভিজাত, সমতলভাবে অবস্থান করে এবং সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে– তাই টেবিল কভারের জন্যও সহজেই

নির্বাচন করা যায়। রাসায়নিক দ্রব্য ও ধোয়ার উপকরণের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। সূর্যালোকে নষ্ট হয় না। পরিধেয় ও গৃহস্থালী বস্ত্র হিসেবে এর জনপ্রিয়তা অনেক। তন্তুর গঠনগত কারণে সহজে ময়লা হয় না। পানি শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকায় এ তন্তুর তৈরি লিনেন বস্ত্র গরমের দিনের জন্য আরামদায়ক। সুতির বস্ত্রের তুলনায় লিনেন বস্ত্র বেশি টেকসই হয়।

কাজ – তুলা এবং ফ্ল্যাক্স তন্তুর ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

রেশম তন্তুর ব্যবহার – রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয়। এই তন্তু নরম, মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বিলাসবহুল ও ফ্যাশন বহুল বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। রেশমি বস্ত্র সুতি ও লিনেনের চেয়ে ওজনে হালকা। এর বহুমুখী ব্যবহার উপযোগিতার কারণে শার্ট, ব্লাউজ অর্থাৎ ছেলে ও মেয়েদের পোশাক, সজ্জামূলক উপকরণের উপযোগী বস্ত্র ইত্যাদি এ তন্তু থেকে তৈরি করা হয়। স্থিতিস্থাপকতার জন্য এরূপ বস্ত্র দিয়ে নানা ধরনের কুঁচি, প্লিট, ঝালর প্রভৃতি ডিজাইনযুক্ত পোশাক সহজেই তৈরি করা যায়। রেশমি বস্ত্র দামি ও যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেক দিন স্থায়ী হয়।

পশম তন্তুর ব্যবহার – পশম তাপ কুপরিবাহী। তাই পশমিবস্ত্র পরিধানে গরম অনুভব হয়। শীতবস্ত্র হিসেবে পশমের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– সোয়েটার, মোজা, মাফলার, কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি। এ ছাড়া পশম দিয়ে নানা ধরনের কম্বল, শাল, কার্পেট ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। ধোয়া ও ইস্ত্রি করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পশমি বস্ত্র বেশ দামি। যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায় এবং টেকসই হয়।

কাজ – রেশন ও পশম তন্তুর ব্যবহার উল্লেখ কর।

রেয়ন তন্তুর ব্যবহার – অন্যান্য বস্ত্রের তুলনায় রেয়ন সস্তা। বিভিন্ন মূল্যের রেয়ন বস্ত্র বাজারে পাওয়া যায় বলে এরূপ বস্ত্র সহজেই অনেকে কিনতে পারে। রেয়ন তন্তুর একটি গুণ হলো এর আকর্ষণীয় রূপ। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মাত্রার এরূপ উজ্জ্বল তন্তু বাজারে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বহুমুখী ব্যবহারের জন্য এই তন্তু বেশ জনপ্রিয়। এরূপ তন্তুর নির্মিত কার্পেট, পর্দা ইত্যাদি ঘরের নতুনত্ব আনয়ন করে। রেয়ন তন্তুর বস্ত্র মজবুত, উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রেয়ন হতে নানা রকম অভিজাত বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। এরূপ বস্ত্র সহজে ধোয়া ও যত্ন নেওয়া যায়। এই তন্তুর পানি শোষণ ক্ষমতা কম বলে দ্রুত শুকায়।

নাইলনের ব্যবহার – নাইলনের বস্ত্র মজবুত ও ওজনে হালকা হওয়ায় এর বহুমূখী ব্যবহার দেখা যায়। টেকসই ও স্থিতিস্থাপক বলে অন্তর্বাস, মশারি, বিছানার চাদর, আসবাবপত্রের ঢাকনা, ছাতার কাপড়, ফিতা, চুলের নেট, লেস, সুতা, মাছ ধরার জাল, চামড়া জাতীয় সামগ্রীর আস্তরণ, কার্পেট, গলফ খেলার ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে নাইলনের সুতা ও বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। নাইলনের বস্ত্র সহজেই ধোয়া ও শুকানো যায়, এজন্য বর্ষার দিনে বেশি ব্যবহার করা হয়। নাইলনের তন্তু অন্যান্য তন্তুর সমন্বয়ে নানা ধরনের গুণসম্পন্ন বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– নাইলন–সুতি, নাইলন–পশম, নাইলন– রেয়ন ইত্যাদি। ময়লার প্রতি আকর্ষণ কম বলে সহজে ময়লা ধরে না। বেশি ইস্ত্রি করারও দরকার হয় না।

কাজ– রেয়ন ও নাইলন তন্তুর ব্যবহার পোস্টারের মাধ্যমে উল্লেখ কর।

পাঠ – ৫–৬ : তন্তু শনাক্তকরণ

বাজারে নানা ধরনের প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও মিশ্র তন্তুর বস্ত্র দেখা যায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে একটি কাপড়ের তন্তুর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টকর। একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই তা স্থির করতে হয়। সাধারণত যেসব পরীক্ষার সাহায্যে তন্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় তাকেই তন্তু শনাক্তকরণ বলে। তন্তু চেনার জন্য যেসব পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয় সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–

ক) তন্তুর ভৌত পরীক্ষা (Physical test) - ভৌত পরীক্ষাগুলো ঘরে বসেই করা যায়। এগুলো অপ্রযুক্তিগত বা non technical হওয়ায় এসব পরীক্ষার উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তন্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় মাত্র, সঠিকভাবে তন্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায় না।

ভৌত পরীক্ষাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো–

১। **স্পর্শ করে পরীক্ষা –** অনেক দিনের অভিজ্ঞতার কারণে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বিভিন্ন প্রকার তন্তুর তৈরি কাপড় শনাক্ত করতে পারেন। যেমন– সুতির কাপড় হাত দিয়ে ঘষলে ঠান্ডা ও নরম অনুভূতি জাগে। লিনেন কাপড় সুতি কাপড়ের তুলনায় অনেক ঠান্ডা ও মসৃণ মনে হয়। তবে পশমি বস্ত্র গরম ও নমনীয় এবং রেশমি বস্ত্র গরম ও মসৃণ মনে হয়। দুই বা ততোধিক তন্তু দিয়ে মিশ্রিত তন্তুর কাপড় এ পদ্ধতিতে শনাক্ত করা কঠিন।

২। **চাক্ষুস পরীক্ষা –** ভৌত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা হলো চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ। তন্তুর দৈর্ঘ্য, উজ্জ্বলতা ইত্যাদি দেখে তন্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

৩। **ভাঁজ করে পরীক্ষা –** একটি বস্ত্র দুই ভাঁজ করে আঙ্গুলের সাহায্যে চেপে ধরতে হবে। বস্ত্রটি যদি ফ্ল্যাক্স তন্তুর হয় তাহলে ভাঁজের দাগ বেশ সুস্পষ্ট হবে এবং এ দাগ সহজে মিলে যাবে না। সুতির বস্ত্রেও ভাঁজের দাগ পড়বে কিন্তু এ দাগ লিনেনের মতো এত সুস্পষ্ট হবে না। রেশমি ও পশমি বস্ত্রে এ পরীক্ষায় কোনো ভাঁজ পড়বে না। কাজেই এ পরীক্ষার সাহায্যে সুতি– লিনেন ও রেশমি– পশমি বস্ত্রের পার্থক্য শনাক্ত করা যায়।

৪। **পাক খুলে পরীক্ষা –** বস্ত্র থেকে কয়েকটি সুতা বের করে তাদের পাক খুলে ফেলতে হবে। বস্ত্রটি পশম তন্তুর হলে পশমি সুতায় পশমের স্বাভাবিক ভাঁজ বা ঢেউ দেখা যাবে। এ ছাড়া একটি সুতাকে ছিঁড়ে তার ছেঁড়া অংশ পরীক্ষা করেও তন্তুর উৎস শনাক্ত করা যায়। যেখানে তন্তুটি ছিঁড়ে যাবে তার সম্মুখভাগ যদি দেখতে সূঁচের মতো সরু হয় তবে তা ফ্ল্যাক্স তন্তু বুঝতে হবে। অন্যদিকে যদি সম্মুখভাগ দেখতে একটি তুলির সম্মুখভাগের মতো মোটা হয় তবে তা তুলা তন্তু বলে বুঝতে হবে।

৫। **ভিজিয়ে পরীক্ষা –** এ পরীক্ষার সাহায্যে ফ্ল্যাক্স ও নাইলন তন্তু সহজেই চেনা যায়। কেননা লিনেন বস্ত্রের পানি শোষণ ক্ষমতা বেশ ভালো। আঙুলের সাহায্যে এক ফোঁটা পানি কোনো কাপড়ের উপর রাখার সাথে সাথে যদি পানি কাপড়ে প্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে কাপড়টি ফ্ল্যাক্স তন্তু দিয়ে প্রস্তুত। অন্যদিকে শোষণ ক্ষমতা না থাকার কারণে নাইলনতন্তুর বস্ত্রে পানি প্রবেশ করবে না।

৬। **গরম ইস্ত্রি দিয়ে পরীক্ষা –** এ পরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম তন্তুর বস্ত্র সহজেই শনাক্ত করা যায়। একটি

২০১৫

ইস্ত্রি খুব গরম করে কাপড়ের উপর চেপে ধরলে যদি কাপড়টি এসিটেট, নাইলন বা যেকোনো তন্তুর হয় তবে তা একেবারেই গলে যাবে। তুলা, লিনেন, রেশম, পশম বা রেয়নের হলে কাপড়ে সামান্য পোড়া দাগ পড়বে।

৭। লেবেল দেখে পরীক্ষা – কাপড়ের গায়ে সংযুক্ত লেবেলে তন্তু সম্পর্কিত নানা ধরনের কথা লেখা থাকে, যা দেখে একজন ক্রেতা কাপড়টি কোন ধরনের তন্তুর তৈরি সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

৮। কাপড় পুড়িয়ে পরীক্ষা – পোড়ানো পরীক্ষা একটি খুব ভালো প্রাথমিক পরীক্ষা। এ পরীক্ষার জন্য করণীয় কাজগুলো হচ্ছে– কাপড়ের টানা সুতা হতে দুই একটা সুতা নিয়ে পাক খুলে আগুনের শিখায় ধরে প্রজ্বলনের নমুনা ও ছাই পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তন্তু থেকে যে গন্ধ বের হয় তা লক্ষ করতে হবে। এরপর পড়েন সুতা নিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। বুনন প্রক্রিয়ায় কাপড়টি তৈরি না হলে সুতার পরিবর্তে এক টুকরা কাপড় পোড়ানো পরীক্ষায় ব্যবহার করতে হবে।

পোড়ানো পরীক্ষায় তন্তুর ব্যবহার

পোড়ানো পরীক্ষায় কাপড়ের ব্যবহার

পোড়ানো পরীক্ষায় ছাই বা অবশিষ্টাংশ

তন্তু পোড়ানো পরীক্ষার ফলাফলের চার্ট

তন্তু	পোড়ার ধরন	শিখার কাছে প্রতিক্রিয়া	শিখার বাইরে প্রতিক্রিয়া	গন্ধ	অবশিষ্টাংশ বা ছাই
সুতা এবং লিনেন	শিখাসহ প্রজ্বলিত হয়। সংকুচিত হয় না।	দ্রুত পোড়ে। হলুদ বর্ণ শিখা দেখা যায়।	শিখা থেকে সরিয়ে আনলেও পুড়তে থাকে।	কাগজ পোড়ার মতো গন্ধ বের হয়।	পালকের মতো হালকা, নরম, ধূসর ছাইয়ের অবশিষ্টাংশ থাকে।
উল, সিল্ক	ধোঁয়াযুক্ত চুলের মতো কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়।	ধীরে পোড়ে এবং পোড়ার সময় মৃদু শব্দ হয়।	সাধারণত নিজেই নিভে যায়।	চুল বা পালক পোড়া গন্ধ বের হয়।	শক্ত কালো সহজেই ভাঙা যায়, এমন গোল কালো গুটিকা সৃষ্টি হয়।
নাইলন তন্তু	আগুনের শিখায় গলে যায়, সংকুচিত হয়।	থেমে থেমে ধীরে ধীরে পোড়ে।	নিজে নিজেই নিভে যায়।	শাকের মতো গন্ধ হয়।	শক্ত, মসৃণ, ধূসর অথবা তামাটে গুটিকা পাওয়া যায়, যা ভাঙা যায় না

২০১৮

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বয়ন তন্তুর প্রধান বা মুখ্য গুণাবলি কোনটি?

ক) বিশোষণ খ) নমনীয়তা

গ) সংকোচন ঘ) উজ্জ্বলতা

২। তন্তুর ব্যাসের উপর কাপড়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি নির্ভরশীল?

ক) উজ্জ্বলতা খ) খসখসে

গ) স্থিতিস্থাপকতা ঘ) নমনীয়তা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনীদ বৃষ্টিতে ভিজে এসে তার স্কুল ড্রেস খুলে রাখল। দুই দিন পর তার মা ধোয়ার জন্য বের করে দেখলেন জামায় ছোট ছোট কালো দাগ পড়েছে। ফলে জামাটি পরার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

৩। আনীদের জামাটি কোন তন্তুর তৈরি?

ক) রেশম খ) সুতি

গ) পশম ঘ) নাইলন

৪। আনীদের জামাটি পরার উপযোগী করার উপায় হলো –

i. ব্লিচিংয়ের ব্যবহার

ii. ধোয়ার সময় ঘষে ঘষে ধোয়া

iii. গাঢ় এসিডে ধোয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাজমা বেগম পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করেন। কিছুদিন হলো তিনি গরমে হাঁপিয়ে উঠছেন এবং তাঁর শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বললেন, তোমার পরিধেয় বস্ত্রের কারণে এমনটি হচ্ছে এবং তাঁরা নাজমাকে আরামদায়ক কাপড় পরার পরামর্শ দিলেন।

ক. বীজ তন্তু কী?

খ. সাংশ্লেষিক তন্তু বলতে কী বোঝায়?

গ. নাজমা বেগম কোন ধরনের কাপড় ব্যবহার করছেন–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাজমা বেগমের এই অবস্থায় সহকর্মীদের পরামর্শটি কী যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

২০১৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেই পরিচ্ছদের প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত রুচিসম্মত পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান করা। যেহেতু পোশাক–পরিচ্ছদ দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, তাই এই শিল্প প্রস্তুত, নির্বাচন ও পরিধানে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে খুব কম ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটিসমূহ সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

পাঠ–১–৩ : পোশাকে শিল্প উপাদান

পোশাক তৈরি কারুশিল্পের অর্ন্তগত একটি শিল্প। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বহু বছর আগে থেকেই কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই উপাদানগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলেও ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল সব সময়ই এক– দেহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত বা অলংকৃত করা। পোশাকশিল্পে যেসব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে এই শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রং– আমাদের চারপাশের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব রং রয়েছে। এই রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। পোশাক পরিচ্ছদে সুষ্ঠুভাবে রং ব্যবহার করার জন্য বর্ণচক্রের রং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। রং মূলত তিন প্রকার:– ১। মৌলিক রং ২। গৌণ রং এবং ৩। প্রান্তিক রং।

১। **মৌলিক রং –** লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি মৌলিক রং। মৌলিক বা প্রাথমিক রংগুলো বিশুদ্ধ রং। কেননা এগুলো অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় না বরং এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য রং সৃষ্টি হয় ।

২। **গৌণ রং –** দুইটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়। এদেরকে মিশ্র বা মাধ্যমিক বর্ণও বলা হয়। যেমন–হলুদ + নীল = সবুজ, নীল + লাল = বেগুনি, লাল + হলুদ = কমলা।

৩। **প্রান্তিক রং –** মৌলিক রঙের সাথে কাছাকাছি যে কোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রান্তিক রং প্রস্তুত করা হয়। যেমন– হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ, নীল + সবুজ = নীলাভ সবুজ, নীল + বেগুনি = নীলাভ বেগুনি, লাল + বেগুনি = লালচে বেগুনি , লাল + কমলা = লালচে কমলা, কমলা + হলুদ = হলদে কমলা।

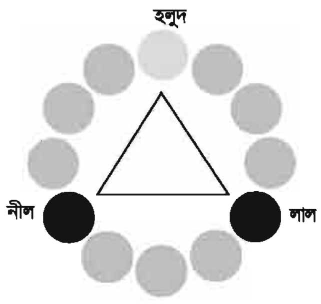

মৌলিক রং

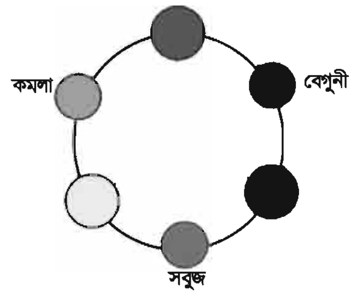

গৌণ রং

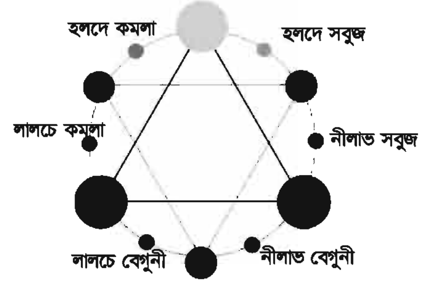

প্রান্তিক রং

কাজ – মৌলিক রং, গৌণ রং এবং প্রান্তিক রং উল্লেখ করে একটি বর্ণচক্র তৈরি কর।

প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রংগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমসত রংগুলো উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ বা গরমভাব জাগ্রত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শীতল বা স্নিগ্ধ রং মনে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায় এবং এরা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

কাজ – বিভিন্ন ধরনের রঙের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর ।

পোশাকে রঙের ভূমিকা–

পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সবই রঙের কারসাজি। যেহেতু রঙের ভূমিকা ব্যাপক তাই পোশাকের রঙের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পোশাকে রঙের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

১. **সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন** – রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে সকলকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পোশাকের ত্রুটিপূর্ণ রং নির্বাচন ব্যক্তির সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দিতে পারে। পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২. **দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান** – পরিধানকারীর দেহ ত্বকের উপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

- ফর্সা একজন মেয়েকে যে কোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখাবে। অন্যদিকে গায়ের রং শ্যামলা হলে গাঢ় রং বর্জন করে হালকা রং নির্বাচন করতে হবে, যাতে তার গায়ের রং উজ্জ্বল দেখায়।

- শ্যামলা মেয়েদের হালকা উজ্জ্বল রঙের পোশাকই বেশি মানানসই।

৩. **দেহাকৃতির পরিবর্তন –** রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তাই দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

- লম্বা ও মধ্যম দেহাকৃতির মেয়েরা বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে সব রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে।
- খাটো বা পাতলা দেহাকৃতির পক্ষে দুই রং বিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না। এ ধরনের মেয়েদের সাধারণত হালকা রঙের পোশাকই মানায়। হালকা রঙের শাড়ি, ব্লাউজ এরা নির্বাচন করতে পারে।
- মেয়েদের পাতলাভাব বাহ্যিক দৃষ্টিতে কমানোর জন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক নির্বাচন করা যেতে পারে। সরু কোমরের অধিকারীর শাড়ি ও ব্লাউজ বিপরীত রঙের হতে পারে, কিন্তু যাদের কোমর ভারী তারা একই রঙের জামা কাপড় পরতে পারে।
- মোটা মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাক পরলে আরও মোটা দেখাবে। তাই হালকা রঙের সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ এরা নির্বাচন করতে পারে।

৪. **প্রাধান্য সৃষ্টি –** পোশাকের রং নির্বাচনে প্রাধান্য দিতে হলে উজ্জ্বল বা গাঢ় রং নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন–

- ফ্রকের গাঢ় রঙের ডিজাইন ব্যবহার করে ফ্রকটিকে আকর্ষণীয় করা যায়।
- হালকা রঙের শাড়িতে গাঢ় রঙের ডিজাইন সৃষ্টি করেও প্রাধান্য আনা যায়।
- বিপরীত রং ব্যবহার করেও পোষাকের আকর্ষণ বাড়ানো যেতে পারে।

আবার কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ করতে না চায় তাহলে শীতল বা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে পারে, এতে করে শরীরের কোনো অংশই বেশি প্রাধান্য পায় না।

৫. **পোশাকে সমন্বয় রক্ষা –** রং পোশাকের ডিজাইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই দেহ ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পোশাকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যাতে সব রং মিলে একটি সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। একটি পোশাকে বিভিন্ন রং ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পোশাকে সমন্বয় রক্ষা করতে হলে –

- দুটি রঙের ব্যবহার এক না হয়ে একটি অপরটি হতে বেশি হওয়া উচিত।
- আবার যখন হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে হয় তখন পোশাকের ছোট ছোট অংশে গাঢ় রং ব্যবহার করা উচিত।
- এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য যে রং মানানসই হবে পোশাকে সে রং দিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।

কাজ – তোমার দেহাকৃতি বিবেচনা করে কোন রঙের পোশাক ব্যবহার যথাযথ তা ব্যাখ্যা কর।

পোশাকে রেখার প্রভাব – পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। কতোগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে উঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো লম্বা, কখনো খাটো, কখনো মোটা, আবার কখনো রোগা মনে হয়। পোশাকের নকশায় রেখার সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ত্রুটি গোপন করা যায়।

রেখা মুলত দুই প্রকার– (১) খাড়া রেখা ও (২) বক্র রেখা। এ ছাড়া রেখার গতিপথের ওপর নির্ভর করে রেখাকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ১। খাড়া রেখা ২। সমান্তরাল রেখা ৩। কোনাকুনি রেখা ৪। বক্র রেখা ৫। তীর্যক রেখা এবং ৬। ভগ্ন রেখা ।

প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমণ্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সুচিন্তিত নির্বাচন ও সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এখানে পোশাকের ওপর বিভিন্ন রেখার প্রভাব তুলে ধরা হলো।

পোশাকে খাড়া রেখা

১। **খাড়া রেখা –** খাড়া বা লম্বা রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এই রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটো ভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়।

সমান্তরাল রেখা

২। **সমান্তরাল রেখা –** এ ধরনের রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হয়। এ ধরনের মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে। এই রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।

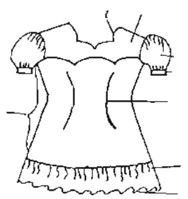

বক্র রেখা

৩। **বক্র রেখা –** বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্র রেখার গতি উর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ–উল্লাস বোঝায়। পক্ষান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্র রেখা আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কোমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। এরূপ রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।

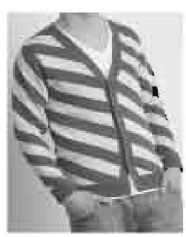

তীর্যক রেখা

৪। **তীর্যক বা কৌণিক রেখা –** তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো উর্ধ্বমুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে মোটা ও খাটো মনে হবে।

৫। **আঁকাবাঁকা বা জিগজ্যাগ রেখা** – এই রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এই রেখাগুলোর কোণের মাত্রা ও দিকের উপর নির্ভর করে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় খাটো ও মোটা মনে হয়।

জিগজ্যাগ রেখা

পোশাকে বিন্দুর প্রভাব – যে কোনো শিল্পের building block বা ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে stippling বলে। পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনায়ন করা যায়।

পোশাকে বিন্দুর প্রভাব

কাজ – পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাবের উপর একটি চার্ট তৈরি কর।

পোশাকে আকৃতির প্রভাব– দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিচ্ছদ ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে পরিচ্ছদ যত মূল্যবানই হোক না কেন তা বর্জনীয় হবে। আর ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেকে জানা।

- প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। দেহের বিভিন্ন পেশি ও অংশ বিশেষের গঠনভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লক্ষ রাখা দরকার, যাতে পরিচ্ছদ বেশি আঁটসাঁট না হয়। বেশি আঁটসাঁট পোশাক সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয় না বরং দেহের ত্রুটিগুলো এতে আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

- পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় খাটো, লম্বা, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি পরে। এতে তাদের উচ্চতা আরও কমে যায় এবং তাকে আরও মোটা লাগে। এদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী।

- পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু সুন্দর দিক থাকে। যেমন– সুন্দর কোমর, দৈহিক উচ্চতা, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু ত্রুটিও দেখা যায়। যেমন– স্ফীত হিপ, প্রশস্ত কাঁধ, খাটো গ্রীবা ইত্যাদি। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

- ব্লাউজ বা কামিজে ইয়ক, চিকন টাক, কুঁচি, বুকে তালি, পকেট, চওড়া কলার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেহের ত্রুটি ঢাকা যায়। বেশি স্ফীত বুক এবং প্রশস্ত কোমরের অধিকারীদের জন্য ঢিলেঢালা পোশাক উপযুক্ত। প্রশস্ত কোমরের ত্রুটি সুপরিকল্পিত মানানসই কোমর রেখার মাধ্যমেও ঢাকা যায়।

- যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোট গলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই।

- মানুষের মুখের আকৃতি নানা রকম হয়। যেমন–লম্বা, গোল, চারকোনা, ডিম্বাকৃতি। ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলই আদর্শ। এসব মুখাকৃতির মেয়েরা সব ধরনের গলার নকশাযুক্ত পোশাক বিনা দ্বিধায় নির্বাচন করতে পারে। যাদের মুখের আকৃতি চারকোনা বা গোলাকার তাদের 'ভি' আকৃতি এবং 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। লম্বা মুখ হলে ছোট গলার নকশা মানানসই হয়। এ ধরনের মেয়েরা উঁচু কলারের জামা পরলে তাদের গ্রীবার সরু ভাব ঢাকা পড়ে।

ডিম্বাকৃতি মুখে গলার নকশা

গোল বা চারকোনা মুখে গলার নকশা

- অনেকের পেছনের দিকে ঘাড়ের কাছে মাংস উঁচু হয়ে থাকে। তা ঢাকার জন্য কেউ কেউ উঁচু কলার যুক্ত ব্লাউজ বা জামা পরে। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক উপায় হচ্ছে ব্লাউজের গলার ছাঁটটিকে ওই মাংসপিণ্ডের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসা। এভাবে তৈরি ব্লাউজ পরলে ঘাড়ের কাছের ত্রুটি তত প্রকট হবে না।

- চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে। যেমন– লম্বা চেহারার মেয়ে যদি লম্বা কানের দুল কিংবা একটি লম্বা নেকলেস পরে, তাহলে তাকে আরও লম্বা মনে হবে।

কাজ – কোন ধরনের দেহাকৃতির জন্য কী ধরনের পোশাকের ডিজাইন হওয়া উচিত উল্লেখ কর।

পোশাকে জমিনের প্রভাব – কাপড়ের জমিন নানা ধরনের হয়। পশমি বস্ত্র নরম, রেশমি কাপড় দেখতে উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্ত্র চকচকে এবং সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। সুতি, রেশমি, পশমি ছাড়াও তসর, অ্যান্ডি, অর্গ্যান্ডি ইত্যাদি কাপড়েও অনেক জমিন দেখা যায়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতার জন্য প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন– নরম, মধ্যম, দৃঢ়, ওজনে ভারী, চকচকে, নিষ্প্রভ ইত্যাদি। জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা বা মোটাভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

১. জার্সি, শিফন ইত্যাদি নরম প্রকৃতির কাপড়। এসব কাপড়ের পোশাক শরীরের সাথে সেঁটে থাকে, ফলে শরীরের দোষ বা গুণ সহজে বোঝা যায়। নরম কাপড় পরিধানে আরাম অনুভূত হয়।

২. মধ্যম ধরনের দৃঢ় প্রকৃতির কাপড়, যেমন– ডেনিম কাপড় শরীরের সাথে বেশি সেঁটে থাকে না, ফলে শরীরের দোষ সহজে বোঝা যায় না।

৩. দৃঢ় প্রকৃতির যেমন– ট্যাফেটা–জাতীয় কাপড়ে পরিধানকারীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা দেখায়।

৪. ভারী যেমন– পশমি কাপড়ে আপাতদৃষ্টিতে দেহ বড় দেখায়।

৫. ফ্লানেল, ডেনিম প্রভৃতি নিষ্প্রভ জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে, তাই এরূপ কাপড়ে কোনো বস্তু ছোট দেখায়। বয়স্ক ও মোটা মানুষের জন্য এরূপ বস্ত্র উপযোগী।

৬. চকচকে কাপড়ে আলোর প্রতিফলন হয় বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন– সার্টিন, মারশেরাইজ করা সুতির বস্ত্র ইত্যাদি। যেসব কাপড়ে ধাতব তন্তুর কাজ থাকে সেগুলোর জমিনও চকচকে হয়। লম্বা, রোগা ও অল্প বয়সীদের জন্য এমন জমিন মানানসই।

সুগঠিত দেহাকৃতি অধিকারীরা সব ধরনের জমিনের পোশাকই পরতে পারে। ঋতু, দেহের আকৃতি ও বয়স ভেদে বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করতে হয়।

কাজ – পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার জন্য কী ধরনের জমিনের বস্ত্র প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন – উল্লেখ কর।

পাঠ–৪–৫ : পোশাকে শিল্পনীতি

পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদের শিল্পনীতি বলে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের ভারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছন্দ ও মিল এ নীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিজাইনের নীতিমালার জ্ঞান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হয়। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ওয়ারড্রোব পরিকল্পনা ইত্যাদি শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

পোশাকে ভারসাম্য– কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য। নিম্নে দুই ধরনের ভারসাম্য দেখানো হলো–

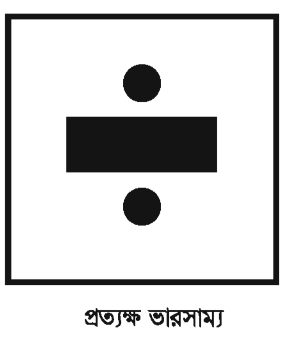

প্রত্যক্ষ ভারসাম্য

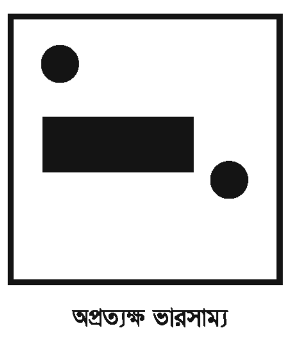

অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

১. **প্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Formal balance)** - লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক এ ক্ষেত্রে একই রকম দেখায়। এরূপ ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু বারবার এ ধরনের ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে একঘেয়ে লাগতে পারে। পোশাকের দুই দিকে একই উচ্চতায় একই ডিজাইনের দুইটি পকেট কিংবা একই ধরনের প্লিট দিয়ে পোশাকের প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

২. **অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Informal balance)** - এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমওজনের বস্তু থাকলেও কেন্দ্র থেকে সম দূরত্বে বা একই উচ্চতায় অবস্থান করে না।এ ধরনের বিন্যাস খুবই চিত্তাকর্ষক (interesting), তবে এক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তা প্রয়োজন। এরূপ বিন্যাসে–

- এক দিকে বড় জিনিস একটি ও অন্য দিকে ছোট জিনিস কয়েকটি রাখা যেতে পারে।
- অধিক আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্র থেকে কাছে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রাখা যেতে পারে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোশাকে অনুপাত – পোষাকের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই অনুপাত। অনেক ব্যক্তি আছে যারা অনুপাত বোধ নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে, তবে এ বিষয়ে সহজেই শিক্ষা লাভ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পোশাকের ক্ষেত্রে এটি একটি অংকের ব্যাপার। বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্রয়োজন– গজ ফিতা, স্কেল ইত্যাদি। দেখা গেছে বোতামের আকার ও রং বাছাই, দুটি বোতামের মধ্যবর্তী দূরত্ব, লেসের চওড়া বাছাই এবং এদের মাধ্যমে কয়েকটি সারি করতে হলে সারিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপাত মেনে চলা আবশ্যক।

কাজ – একটি পোশাকে কীভাবে ভারসাম্য আনা যায় তা বর্ণনা কর।

পোশাকে ছন্দ– রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পোশাকের ডিজাইনে ছন্দ রক্ষা করলে চোখ একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রঙের দিকে আকৃষ্ট হয়। পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়। যথা–

১) **পুনরাবৃত্তি (Repetition)** - রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে কিংবা সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম, লেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে ছন্দ আনা যায়। দেখা গেছে, তিন বা ততোধিকবার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়।

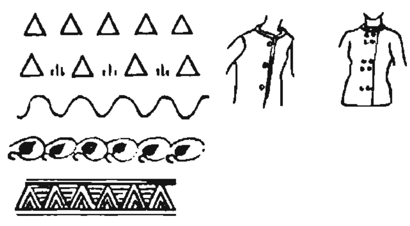

পুনরাবৃত্তি

২) **বিকিরণ (Radiation)** - একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। পোশাকের গলার রেখা, স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস্, পুঁতি, সিকুয়েন্স, সূচিকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধরনের ছন্দ আনা যায়।

বিকিরণের মাধ্যমে ছন্দ

২০১৬

৩) **ক্রমবিন্যাস (Gradation)** - রঙের সেড, রেখা বা আকৃতির ক্রম পরিবর্তন করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। রং বা রেখার এই পরিবর্তন প্রস্থ বরাবর না করে দৈর্ঘ্য বরাবর করলে চোখ বেশি আন্দোলিত হয়।

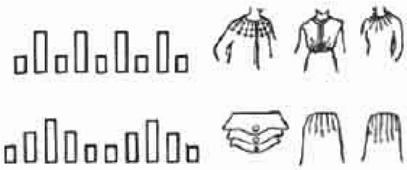

পোশাকে বিকিরণ ও ক্রমবিন্যাস

৪) **নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity)** - পোশাকে সরল, ঢেউ খেলানো, জিগজ্যাগ ইত্যাদি চলমান রেখা ব্যবহার করে ছন্দ আনা যায়। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভাঙার জন্য আড়াআড়ি বা কোনাকুনি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– কুচি দেওয়া লম্বালম্বি রেখার পোশাকে আড়াআড়ি রেখার পকেটের ব্যবহার।

রেখার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নতা

পোশাকে প্রাধান্য – পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। শরীরের কাঠামোর সাথে প্রাধান্যের বিন্দু সম্পর্কযুক্ত। কেননা দেখা গেছে যে দেহের যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় সে অংশেই সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়। প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।

পোশাকে প্রাধান্য

পোশাকে মিল – একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। মিল বজায় রাখার জন্য –

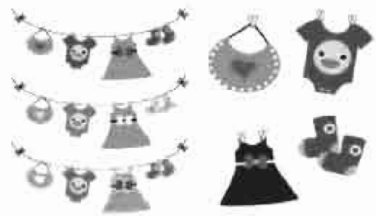

পোশাকে মিল

- একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করা যায়। যেমন– বর্গাকার বা স্কোয়ার গলার সাথে বর্গাকৃতি পকেট সংযোজন করা যেতে পারে।
- সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল থাকতে হবে।
- ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন নির্বাচন করতে হবে।
- পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের (Accessories) মিল থাকতে হবে।

তবে অতিরিক্ত মিল আবার অনেক সময় একঘেয়ে ভাব আনয়ন করে। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে।

কাজ – স্কুলের ক্লাশ পার্টিতে তোমার পোশাক নির্বাচনের সময় কীভাবে মিল রক্ষা করবে বর্ণনা দাও।

পোশাকে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে তেমনি তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। তাই পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান সবারই অল্পবিস্তর থাকা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?

ক) নমনীয়তা খ) সততা

গ) সাহস ঘ) বিশ্রাম

২। সার্টিন কাপড়ের জামা পরিধানে ভারী গঠনের মেয়েকে কেমন দেখাবে?

ক) লম্বা খ) মোটা

গ) রোগা ঘ) পাতলা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিসা তার সাদা রঙের কামিজের নীচের অংশে কালো রঙের সুতার কাজ করে। এতে তার জামাটি বেশ সুন্দর দেখায়।

৩। লিসা জামাটিতে শিল্পের কোন নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে?

ক) ভারসাম্য খ) প্রাধান্য

গ) অনুপাত ঘ) ছন্দ

৪। লিসার জামাটিতে—

i. দৃষ্টিশক্তি আন্দোলিত হয়।

ii. পোষাকটি বেশি আকর্ষণীয় হয়।

iii রঙের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গোলগাল চেহারার খাটো প্রকৃতির মেয়ে বন্যা একদিন পোশাক কিনতে মার্কেটে যায়। সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামা ও উঁচু কলার দেওয়া গলার বড় ছাপাযুক্ত জামা দুটি তার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু সব কিছু চিন্তা করে সে ওই দুটি জামা না কিনে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ অন্য একটি জামা তার নিজের জন্য কিনে আনে।

ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি কোনটি?

খ. পোশাকের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?

গ. বন্যার সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি না কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। সাবা ও সানা দুই বোন। উভয়েরই গায়ের রং ফর্সা হলেও দেহের গঠন ও আকৃতিতে দুইজন একেবারেই বিপরীত। একদিন বিয়ের অনুষ্ঠানে দুইজনেই নীল রঙের শাড়ি পরে যায়। অনুষ্ঠানের সবাই পাতলা গড়নের সাবার প্রশংসা করলেও সানার প্রতি কেউ অতিরিক্ত আগ্রহ দেখায়নি।

ক. রং মূলত কত প্রকার?

খ. পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাবার প্রশংসিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায় হয়েছে– বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ

বস্ত্রশিল্পে ছাপা ও রংকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারখানায় যখন বস্ত্র প্রস্তুত হয় তখন তাকে গ্রে ফেব্রিক বলে। সত্যিকার অর্থে এরূপ বস্ত্র সরাসরি বাজারে খুব একটা ছাড়া হয় না। বস্ত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপা ও রংকরণের পর বাজারজাত করা হয়। এতে করে বস্ত্রের আকর্ষণ ক্ষমতা ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। রুচি প্রকাশের জন্য বস্ত্রের উপর স্থান বিশেষে বিভিন্ন রং প্রতিফলিত করার প্রণালিকে বস্ত্র ছাপা বলে। এ পদ্ধতিতে কাপড়ের উপর রং বেরং এর নকশা তৈরি করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন, স্টেনসিল, রোলার ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বস্ত্রে ছাপার কাজ করা যেতে পারে। অন্যদিকে রংকরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাপড়টি রঙের দ্রবণে ডুবিয়ে সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগিয়ে দেওয়া হয়। রংকরণের প্রক্রিয়াটি বস্ত্র তৈরির পূর্বে অর্থাৎ তন্তু বা সুতার মধ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার অনেক সময় টাই-ডাই পদ্ধতিতে সুকৌশলে কাপড়টি বেঁধে রঙের দ্রবণে ডোবালেও সুন্দর একটি নকশা কাপড়ে ফুটিয়ে তোলা যায়।

ব্লক

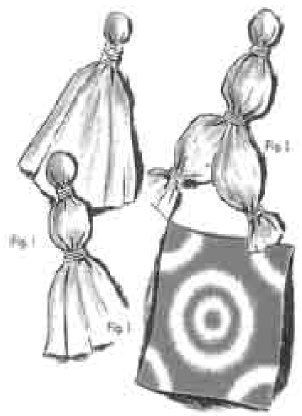

টাই-ডাই

বাটিক

পাঠ ১ – বস্ত্র ছাপা

বস্ত্রশিল্পে প্রিন্টিং বা ছাপা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার এটি অন্যতম পন্থা। বস্ত্র ছাপার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একজন প্রিন্টার তার প্রয়োজন, সামর্থ্য, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুসারে ছাপার নির্দিষ্ট পদ্ধতি বেছে নেন। বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটিতে সম্পূর্ণ বস্ত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে একই বর্ণে, একই গাঢ়ত্বে সমভাবে রঞ্জিত করে তোলা হয়। আর ছাপা পদ্ধতিতে বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বর্ণের সমারোহ ঘটিয়ে বস্ত্রটিকে নকশানুযায়ী ফুটিয়ে তোলা হয়।

আবার রং করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রং নিয়ে, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি বা অন্য কোনো দ্রবণ যোগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম ঘনত্বের দ্রবণে মোটামুটি অনেক সময় ধরে বস্ত্রকে নিমজ্জিত রাখা হয়। প্রথম দিকে তাপমাত্রা কম থাকলেও পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়, যাতে বস্ত্রের সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগে। কিন্তু ছাপার বেলায় বেশি ঘনত্বের রঙের পেস্ট ব্যবহার করা হয়। এই পেস্ট

বস্ত্রের উপরিভাগে শুধুমাত্র নকশাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। এরপর দ্রুত শুকিয়ে তাপ বা বাষ্প ব্যবহার করে সেই রংকে বস্ত্রের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাকি রং ধুয়ে বের করে ফেলা হয়।

বস্ত্রছাপা ও রংকরণের প্রণালি ভিন্ন হওয়ার কারণে ছাপার কাজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় রংকরণের ক্ষেত্রে সেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না। তবে বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়া শুরুর আগে বস্ত্রের মাড় দূর করে, ধুয়ে, ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

কাজ – বস্ত্র রংকরণ ও ছাপার পার্থক্য উল্লেখ কর।

প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত মূল উপকরণ হচ্ছে রং। আর রঙের সাহায্যে বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে ব্লক ছাপা, টাইডাই ছাপ ও বাটিক ছাপা উল্লেখযোগ্য।

পাঠ–২–৩ : ব্লক ছাপা

সত্যিকার অর্থে বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে কৌশল বা উপকরণ অবলম্বন করা হয়েছিল তা হচ্ছে ব্লক। অন্যান্য প্রিন্টিং পদ্ধতির পাশাপাশি ব্লক প্রিন্টিং–এর মাধ্যমে আমরা এখনো পরিধানের কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি প্রিন্ট করে থাকি এবং আমাদের কুটিরশিল্পে এর জনপ্রিয়তাও অনেক বেশি।

ব্লক তৈরি– ব্লক প্রিন্টে ব্যবহৃত কাঠের ব্লকগুলো ২–৪ ইঞ্চি বা ৫.০৮–১০.১৬ সে.মি. পুরু হওয়া উচিত। নতুবা এরা টেকসই হবে না। ব্লকের আকৃতি যদিও ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে, তবে লম্বায় ১২–১৬ ইঞ্চি বা ৩০.৪৮–৪০.৬৪ সে.মি. বেশি না হওয়াই ভালো। ব্লক তৈরির জন্য কাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবলা, গাব, লিনোলিয়াম (শিরীষ) ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। আলু, ঢেঁড়শ ইত্যাদিও ব্লক প্রিন্টে তাৎক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।

ব্লক তৈরি

ডিজাইনের যে অংশ কাপড়ের উপর ফুটিয়ে তুলতে হবে, সে অংশ ব্লকের উপরে উঁচু করে রেখে বাকি অংশ গভীরভাবে কেটে তুলে ফেলতে হবে। এর ফলে কালার ট্রেতে যখন ব্লক ডুবিয়ে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হবে, তখন কেবল ডিজাইন যুক্ত অংশেরই রং কাপড়ে ফুটে উঠবে। একই কাপড়ের উপর একাধিক রঙের ডিজাইন ছাপানো যায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক রঙের জন্য নির্দিষ্ট ব্লকের কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় ব্লকের কাজ শুরু করতে হবে।

তৈরিকৃত ব্লক

প্রিন্টিং টেবিল ও কালার ট্রে প্রস্তুত – ব্লক প্রিন্ট এর জন্য পাথর, সিমেন্ট, লোহা, স্টিল কিংবা ভালো কাঠের তৈরি মজবুত টেবিল হলে সুবিধা হয়। টেবিলের উপর কয়েক প্রস্থ কম্বল বিছিয়ে তার উপর কোরা কাপড় এমনভাবে পিন দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয় যাতে প্রিন্টিংয়ের সময় কাপড় টানটান করে ছড়িয়ে থাকে বা কোনো ভাঁজ সৃষ্টি না হয়। ছাপার রঙের জন্য একটি কালার ট্রে–এর নিচে রাবার ক্লথ দিয়ে আটকিয়ে তার উপর মাপমতো ৩–৪ সে.মি. পুরু ফোমের টুকরা বিছিয়ে দিতে হয়।এবার ফোমের উপর এক টুকরা পশমি কাপড় বা চট বিছিয়ে তার উপর রং প্রয়োগ করে ব্রাশের সাহায্যে রং ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাপা কাজের সময় ব্লকটি পশমি কাপড় বা চটে ২/৩ বার লাগিয়ে প্রকৃত কাপড়ে ছাপ দেওয়া হয়। কাজের শেষে ব্লক ধুয়ে রাখতে হয়।

কালার ট্রে

রং প্রস্তুত (প্রুশিয়ান) — ব্লক প্রিন্টিংয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুত রং বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যা ব্লকে ভালোভাবে লাগিয়ে কাপড়ের উপর ছাপ দিলেই ছাপা হয়ে যায়। তবে রঙের প্রস্তুত প্রণালি জানা থাকলে নিজের পছন্দমতো রং তৈরি করে কাপড়ে ছাপ দেওয়া যায়। এখানে প্রুশিয়ান পেস্ট তৈরি ও ছাপা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

কাপড়ে প্রিন্ট করা

পেস্টের উপকরণ ও শতকরা হিসাব	
প্রুশিয়ান রং	৬%
ফুটন্ত গরম পানি	২০%
ইউরিয়া সার	৩%
খাবার সোডা	৩%
কাপড় কাচার সোডা	৩%
গলানো গাম	৬২%
রেজিস্ট সল্ট	১%
গ্লিসারিন	২%

পেস্ট তৈরি — পেস্ট তৈরির ২৪ ঘণ্টা আগেই আধা লিটার পানিতে ১ তোলা ফাইন গাম মিশিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার পাত্রে হালকা গরম পানিতে রং গুলে ইউরিয়া সার, খাবার সোডা, কাপড় কাচার সোডা, রেজিস্ট সল্ট রঙের সাথে মিশিয়ে তৈরিকৃত গামের সাথে একত্র করে মেশাতে হবে (বর্ষাকালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই)।

প্রিন্টিং পদ্ধতি — পেস্ট তৈরি হয়ে গেলে ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে গ্লিসারিন মিশিয়ে কাপড় প্রিন্ট করতে হবে। এই পেস্ট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করাই উত্তম। কেননা ৪ ঘণ্টা পর এর গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। প্রিন্ট করা হয়ে গেলে ছায়ায় এবং কিছুদিন রোদে শুকাতে হবে। প্রুশিয়ান রঙে ব্লক প্রিন্ট করার পর স্টিম ও ধোলাই করতে হয়। স্টিমিং-এর জন্য একটি হাঁড়িতে পানি ফুটাতে হবে। এবার চট দিয়ে কাপড়টি ঢেকে হাঁড়ির উপর একটি চালনি বসিয়ে, তার উপর কাপড়টি রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে স্টিমিং করা যেতে পারে।

কাজ — শ্রেণিকক্ষে একটি টেবিল ক্লথে ব্লক ছাপা করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে প্রথম ব্যবহৃত কৌশল কোনটি?

ক) স্ক্রিন খ) স্টেনসিল

গ) ব্লক ঘ) রোলার

২। ব্লক ছাপায় কী কী উপকরণ দরকার?

ক) ব্রাশ, পেন্সিল
খ) রং, সুঁচ ও সুতা
গ) রং, প্রিন্টিং, টেবিল
ঘ) কালার ট্রে ও আর্ট পেপার

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমনা তার ঈদের জামাটিতে ব্লক ছাপা করবে বলে ১" পুরু বাবলা কাঠ বাছাই করল। এবং নিম্নের রঙের মিশ্রণ তৈরি করল। এরপর ইচ্ছামতো নকশা করার জন্য কাজ শুরু করল। কিন্তু ছাপার মান আশানুরূপ হলো না।

প্রুসিয়ান রং	:	৬%
ফুটন্ত গরম পানি	:	১০%
গলানো গাম	:	৬২%
খাবার সোড়া	:	৩%

৩। মিশ্রণটির ত্রুটি কোথায়?

ক) প্রুসিয়ান রঙের পরিমাণে
খ) ফুটন্ত গরম পানির পরিমাণে
গ) গলানো গামের পরিমাণে
ঘ) খাবার সোডার পরিমাণে

৪। ছাপার মান আশানুরূপ না হওয়ার কারণ কী?

i. রঙের মিশ্রণে ত্রুটি থাকা
ii. কাঠ নির্বাচনে ত্রুটি থাকা
iii. ব্লক তৈরিতে ত্রুটি থাকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তরু কতোগুলো কাপড়ে প্রুসিয়ান রঙের ব্লক প্রিন্ট করেই সাথে সাথে কাপড়গুলো বিক্রির জন্য তারা দোকানে নিয়ে আসে। কিন্তু কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ক. কারখানায় প্রস্তুতকৃত বস্ত্রকে কী বলে?
খ. বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে পার্থক্য কী?
গ. তরুর কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ব্যবসায় সাফল্যের জন্য তরুকে আরও সচেতন হতে হবে– স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সপ্তদশ অধ্যায়

ড্রাফটিং

কোনো পোশাক তৈরি করতে গেলে প্রথমে সমতল কাগজে পোশাকের একটি নমুনা আঁকা হয়। একে মূল নকশা বা মূল ড্রাফট বলে। এরপর মূল নকশাকে ভিত্তি করে দেহের মাপ অনুযায়ী সমতল কাগজে যে চূড়ান্ত নকশা আঁকা হয় তাকেই বলে প্যাটার্ন ড্রাফটিং। সফলভাবে প্যাটার্ন ড্রাফটিং তৈরিতে আরাম ও সেলাইয়ের জন্য মূল মাপের সাথে বাড়তি কিছু মাপ যোগ দিতে হয়।

ড্রাফটিং করার অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন – প্রয়োজনে পোশাকের ডিজাইন সহজেই পরিবর্তন করা যায়, একই সাইজের অনেক পোশাক একসাথে ছাঁটা যায়, কাপড়ের অপচয় রোধ করা যায়, পোশাক ছাঁটতে সময় কম লাগে, কাপড়ের বাড়তি ছাঁট বা টুকরা দিয়ে ছোটদের পোশাক ছাড়াও ঘরের প্রয়োজনীয় নানা রকম সামগ্রী– ন্যাপকিন, রুমাল, টি কোজি, টেবিল ম্যাট ইত্যাদি তৈরি করা যায় এবং মূল ড্রাফটিংয়ের উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় নকশার পোশাক সহজে তৈরি করা যায়।

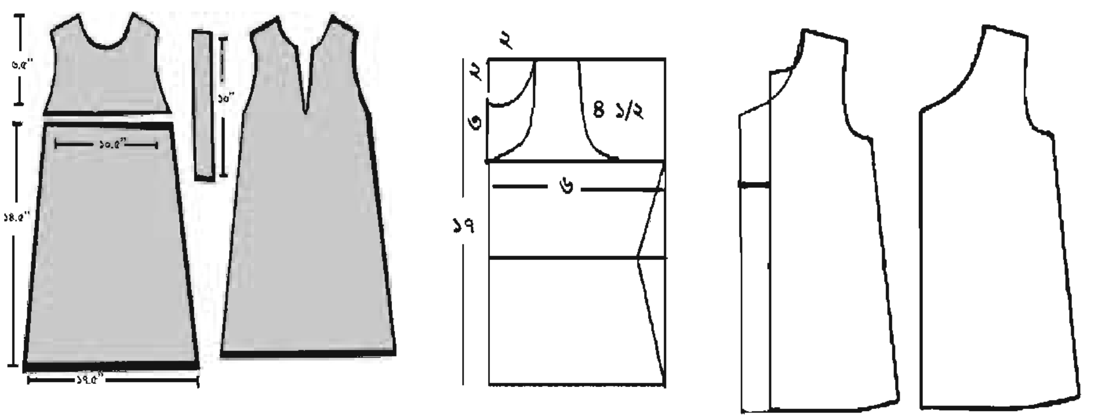

পাঠ ১–৩ শিশুদের পোশাক – ফতুয়ার ড্রাফটিং

ঘরোয়া বা বাইরের পোশাক রূপে ফতুয়া গ্রীষ্মকালের জন্য বেশ আরামদায়ক। একটি ৩ বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরির জন্য প্রথমেই মূল নকশার পরিকল্পনা করে কাগজে ড্রাফটিং করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ড্রাফটিংয়ের জন্য যেসব জিনিস সংগ্রহ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে– বাদামি কাগজ, পেনসিল, স্কেল, শেপকাট, রাবার, গজফিতা, পিন ইত্যাদি। ফতুয়া তৈরিতে ৩ বছরের শিশুর উপযোগী শরীরের বিভিন্ন অংশের মূল মাপগুলো এবং ড্রাফটিং তৈরির পদ্ধতি নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রয়োজনীয় মাপ

ঝুল– ১৭ ইঞ্চি বা ৪৩.১৮ সেন্টিমিটার

বুক– ২২ ইঞ্চি বা ৫৫.৮৮ সে.মি.

কাধ– ৯ ইঞ্চি বা ২২.৮৬ সেন্টিমিটার

হাতার লম্বা– ৩.৫ ইঞ্চি বা ৮.৮৯ সেন্টিমিটার

এবং কাফ বা মুহুরী– ৪ ইঞ্চি বা ১০.১৬ সেন্টিমিটার।

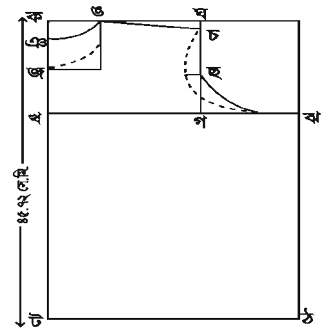

ফতুয়ার সামনের ও পেছনের অংশের ড্রাফটিং

ফতুয়ার পেছন ও সামনের অংশের ড্রাফটিং একই সাথে করা হয়। প্রথমে কাঁধের মাপের অর্ধেক বা পুটের মাপের সাথে ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ক ঘ (১১.৪৩+১.২৭=১২.৭ সে.মি.) রেখা টানতে হবে। অতঃপর বুকের ১/৪ অংশের মাপ (১৩.৯৭ সে.মি.) নিয়ে ক খ রেখা টানতে হবে। খ বিন্দু হতে বুকের ১/৪ অংশ + ৫.০৮ সে.মি. ঢিলা + ১.২৭ সে.মি. সেলাই = ২০.৩২ সে.মি. দূরে ঝ বিন্দু নির্ধারণ করে খ ঝ যোগ করতে হবে। খ ঝ রেখার ওপর ক খ গ ঘ আয়তক্ষেত্র তৈরি হবে।

গলার চওড়া নির্ধারণের জন্য ক বিন্দু থেকে বুকের ১/১২ অংশ = ৪.৫৭ সে.মি. দূরে ঙ বিন্দু শনাক্ত করতে হবে। পেছনের গলার গভীরতার জন্য ক বিন্দু হতে ২.৫৪ সে.মি. নিচে ঞ বিন্দু শনাক্ত করে ঙ ঞ গোল করে যোগ করতে হবে। এখন সামনের গলার শেইপ তৈরি করার জন্য ক বিন্দু হতে বুকের ১/৮ অংশ = ৬.৯৮ সে.মি. নিচে জ বিন্দু শনাক্ত করে ঙ থেকে জ গোল করে যোগ করতে হবে। গলার শেইপ পছন্দমতো আরও গভীর করা যেতে পারে। অতঃপর ঘ বিন্দু থেকে ১.২৭ সে.মি. নিচে চ বিন্দু শনাক্ত করে ঙ চ যোগ করতে হবে। বগলের শেপের জন্য গ চ রেখার মধ্যবিন্দু ছ শনাক্ত করে ছ ঝ বিন্দু বাঁকা ভাবে যোগ করলে পেছনের বগলের শেইপ তৈরি হবে। সামনের বগল পেছনের বগল হতে ১.২৭ সে.মি. বেশি গভীর হবে।

সম্পূর্ণ ঝুলের সাথে নিচে হেমের জন্য ১.২৭ সে.মি.এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ দিতে হবে। এখন ক খ রেখাকে ক বিন্দু হতে ৪৫.৭২ সে.মি. নিচ পর্যন্ত বাড়িয়ে ক ট রেখা আঁকতে হবে। অতঃপর ঝ খ ট ঠ আয়তক্ষেত্র অংকন করতে হবে।

হাতার ড্রাফটিং– ক–ঘ = হাতার লম্বা– ৮.৮৯ সে.মি.+

মুড়ি– ২.৫৪ সে.মি.+ সেলাই ১.২৭ সে.মি. = ১২.৭ সে.মি.

ক–খ = হাতার চওড়া = বুকের ১/৪ = ১৩.৯৭ সে.মি.

খ–ঙ = বুকের ১/১২+১.২৭ সে.মি.= ৫.৮৪ সে.মি.

ঝ–ঘ = মুড়ি ২.৫৪ সে.মি.

ঝ–ঞ = কাফ ১/২ + ১.২৭ সে.মি.= ১১.৪৩ সে.মি.

ক–চ = ১.২৭ সে.মি.

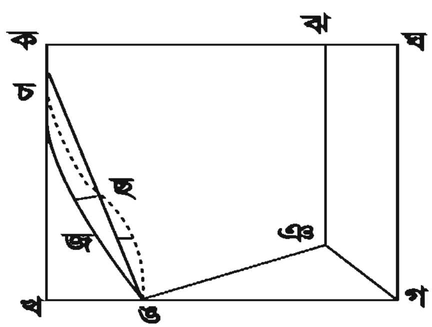

ফতুয়ার হাতার ড্রাফটিং

এবার চ ও ঙ বিন্দু কোনাকোনিভাবে যোগ করতে হবে। এই রেখার মধ্যবিন্দু ছ। ছ বিন্দুর ১.২৭ সে.মি.বাইরে একটি বিন্দু দিয়ে ঙ থেকে চ পর্যন্ত শেইপ করতে হবে। হাতার সামনের অংশের শেইপ করার জন্য এবার ছ ও ঙ–এর মধ্যবিন্দু জ নিয়ে, জ এর ০.৬৩৫ সে.মি. ভেতরে একটি বিন্দু শনাক্ত করে ঙ ছ চ এর সাথে চিত্রের মতো শেইপ করতে হবে।

কাজ – একটি ফতুয়ার সামনের অংশ, পেছনের অংশ ও হাতার ড্রাফটিং প্রস্তুত কর।

ফতুয়া প্রস্তুত – ড্রাফটিং অনুসারে ফতুয়া প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে পরিকল্পনা অনুসারে কাপড়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ছেঁটে সেলাই করতে হবে। একটি ৩ বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরির জন্য ১ গজ কাপড় এবং সেলাইয়ের জন্য সুতা, সুঁচ, বোতাম, কাঁচি, সেলাই মেশিন ইত্যাদি হাতের কাছে রাখতে হবে।

কাপড় ছাঁটা – কাপড়কে সঠিক পদ্ধতিতে ভাঁজ করে তার উপর ড্রাফটিংয়ের কাগজ রেখে পিন দিয়ে আটকিয়ে নিতে হবে। এরপর নকশা অনুযায়ী কাপড় ছাঁটতে হবে। ছাঁটার পর পেছনের অংশ আলাদা করে, সামনের অংশের কাঁধের শেইপ ও গলা ছেঁটে গলার মধ্যবিন্দু থেকে ৭.৬২ সে.মি. নিচ পর্যন্ত ছাঁটতে হবে।

পাশের কাপড়কে পুনরায় ভাঁজ করে হাতার ড্রাফটিং ফেলে একসাথে ছাঁটতে হবে। এবার হাতার ড্রাফটিংয়ের সামনের অংশের শেইপ করে, দুই হাতার সামনের অংশের কাপড় একসাথে করে, পুনরায় ড্রাফটিং ফেলে সামনের অংশের হাতার শেইপ ছাঁটতে হবে।

এবার টুকরা কাপড় দিয়ে গলার পাইপিং এবং বোতামের পট্টি তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিপরীত রঙের কাপড়ও ব্যবহার করা যায়।

পাইপিং তৈরির পদ্ধতি

সেলাই – প্রথমে সামনের ও পেছনের অংশ একত্র করে দুই দিকের কাঁধের সেলাই করতে হবে। এরপর বোতামের জন্য পট্টির ব্যবস্থা করে গলায় পাইপিং লাগাতে হবে। তারপর দুইপাশ সেলাই করে, ঝুল পরীক্ষা করে নিচের কাপড় ভাঁজ করে মুড়ে টাক সেলাই দিতে হবে।

তৈরিকৃত ফতুয়া

হাতা দুটো আলাদাভাবে সেলাই করে বডির সাথে সংযোজন করতে হবে। এবার ফিটিং পরীক্ষা করে নিচে হেম সেলাই দিয়ে, বুকের সামনে লুপ ও বোতাম লাগাতে হবে। সবশেষে অতিরিক্ত সুতা কেটে, ইস্ত্রি করে ফতুয়া সেলাই শেষ করতে হবে।

কাজ – ড্রাফটিং অনুসারে একটি ফতুয়া তৈরি কর।

পাঠ–৪–৫ : বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং

বেবি ফ্রক হচ্ছে শিশুর উপযোগী পোশাক। এই পোশাক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– এ লাইন শেইপ ফ্রক, ইয়োক ফ্রক, টিউনিক ইত্যাদি। এখানে ৩ বছরের শিশুর উপযোগী এ লাইন শেইপ বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং তৈরি করতে শরীরের যেসব অংশের মাপ নিতে হয়, সেসব অংশের মূল মাপ এবং ড্রাফটিংয়ের পদ্ধতি নিচে তুলে ধরা হলো–

প্রয়োজনীয় মাপ ঝুল– ৪৫.৭২ সেন্টিমিটার বুক – ৫৫.৮৮ সে.মি. এবং পুট– ১১.৪৩ সেন্টিমিটার।

ড্রাফটিংয়ের জন্য বাদামি কাগজ, পেনসিল, স্কেল, শেইপকাট, রাবার, গজ, পিন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এ ধরনের বেবি ফ্রকের পেছন ও সামনের অংশের ড্রাফটিং একই সাথে করা হয়।

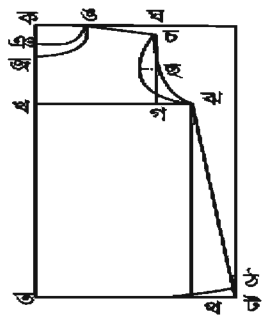

বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং

প্রথমে পুটের মাপের সাথে ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ক ঘ রেখা টানতে হবে। অতঃপর বুকের ১/৪ অংশের সাথে ২.৫৪ সে.মি. যোগ করে ক খ রেখা টানতে হবে। খ বিন্দু হতে বুকের ১/৪ অংশের সাথে ঢিলা এর জন্য ৬.৩৫ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ২১.৫৯ সে.মি. (১৩.৯৭ সে.মি. + ৬.৩৫ সে.মি. + ১.২৭ সে.মি.) দূরে ঝ বিন্দু নির্ধারণ করতে হবে। এবার খ ঝ যোগ করে খ ঝ রেখার উপর ক খ গ ঘ আয়তক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ ঝুলের সাথে নিচে হেমের জন্য ১.২৭ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ দিয়ে (৪৫.৭২+ ১.২৭+১.২৭) ক খ রেখাকে ক বিন্দু হতে ৪৮.২৬ সে.মি. নিচ পর্যন্ত বাড়িয়ে ক ত রেখা আঁকতে হবে। এবার ঝ খ ত থ আয়তক্ষেত্র অংকন করতে হবে। ঘেরের জন্য থ বিন্দু থেকে প্রায় ৪ সে.মি. দূরে ট বিন্দু দিয়ে ঝ ট যোগ করে শেইপকাট দিয়ে সুন্দরভাবে চিত্রের ন্যায় থঠ রেখা বরাবর শেইপ করতে হবে। গলার চওড়া নির্ধারণের জন্য ক বিন্দু থেকে বুকের ১/১২ অংশ = ৪.৬ সে.মি. দূরে ঙ বিন্দু শনাক্ত করতে হবে। পেছনের গলার গভীরতার জন্য ক বিন্দু হতে ১.২৭ সে.মি. নিচে ঞ বিন্দু শনাক্ত করে ঙ ঞ গোল করে যোগ করতে হবে। এখন সামনের গলার শেইপ তৈরি করার জন্য ক বিন্দু হতে বুকের ১/৮ অংশ নিচে জ বিন্দু শনাক্ত করে ঙ থেকে জ গোল করে যোগ করতে হবে। গলার শেইপ পছন্দমতো আরো গভীর করা যেতে পারে। এরপর ঘ বিন্দু থেকে ১.২৭ সে.মি. নিচে চ বিন্দু শনাক্ত করে ঙ চ যোগ করতে হবে। বগলের শেপের জন্য গ চ রেখার মধ্যবিন্দু ছ শনাক্ত করে ছ ঝ বিন্দু বাঁকা ভাবে যোগ করলে পেছনের বগলের শেইপ তৈরি হবে। সামনের বগল পেছনের বগল হতে ১.২৭ সে.মি. বেশি গভীর হবে।

কাজ – ৩ বছরের একটি শিশুর শরীরের মাপ নিয়ে একটি এ লাইন শেইপ বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং তৈরি কর।

কাপড় ছাঁটা ও সেলাই– উপরোক্ত ড্রাফটিং অনুসারে বেবি ফ্রক ছাঁটার জন্য ৯১.৪৪ সে.মি. চওড়া ও ৫০.৮ সে.মি. লম্বা কাপড়কে ভাঁজ করে তার উপর ড্রাফটিংয়ের কাগজ রেখে পিন দিয়ে আটকিয়ে নিতে হবে। এরপর নকশা অনুযায়ী কাপড় ছাঁটতে হবে। পাশের টুকরা কাপড় দিয়ে গলা ও বগলের পাইপিং এবং বোতাম পট্টি তৈরি করতে হবে। এ ধরনের বেবি ফ্রকের পিঠ সম্পূর্ণ খোলা বা অর্ধেক খোলা থাকতে পারে।

সেলাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সামনের ও পেছনের অংশ একত্র করে দুই দিকের কাঁধের সেলাই করতে হবে। এরপর গলা ও বগলের পাইপিং লাগিয়ে বোতাম পট্টি সেলাই করতে হবে। অনেক সময় দুই কাঁধেও বোতামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর দুইপাশ সেলাই করে, ঝুল পরীক্ষা করে নিচের কাপড় ভাঁজ করে মুড়ে টাক

২০১৫

সেলাই দিতে হবে। ফিটিং পরীক্ষা করে নিচে হেম সেলাই দিয়ে, প্রয়োজনীয় বোতাম লাগাতে হবে। সবশেষে অতিরিক্ত সুতা কেটে, ইস্ত্রি করে ফ্রকের সেলাই শেষ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রীষ্মকালের জন্য আরামদায়ক পোশাক কোনটি?

ক) শার্ট খ) ফতুয়া

গ) পাঞ্জাবি ঘ) সাফারি

২। ড্রাফটিং করলে সুবিধা হয় কেন?

ক) কাপড়টি সংকুচিত হয় না খ) দেহের ফিটিং ভালো হয়

গ) সেলাই মজবুত হয় ঘ) ডিজাইন ভালো করা যায়

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জুলেখা তার বন্ধুর মেয়ের জন্মদিনে বেবিফ্রক দিবে বলে মন স্থির করে। সে কাপড় কেটে সেলাই করে। সেলাইয়ের পর কাপড়টি ইস্ত্রি করতে গেলে দেখে সেলাই উল্টোপাল্টা হয়েছে।

৩। জুলেখা প্রথমেই কাপড়ে কোন অংশ সেলাই করলে কাপড়টি উল্টোপাল্টা হতো না?

ক) গলায় পাইপিং লাগালে খ) নিচের অংশ জোড়া দিলে

গ) নিচ সেলাই করলে ঘ) ফ্রকের সামনের ও পেছনের অংশের কাঁধ একত্রে সেলাই করলে

৪। জুলেখার তৈরি ফ্রকটি সঠিকভাবে তৈরি করার জন্য করণীয় ছিল–

i. ফ্রকের সামনের ও পেছনের অংশ একসাথে ছাঁটা

ii. সেলাইয়ের সঠিক ধাপ অনুসরণ করা

iii. কাপড় কেনার সময় কম কাপড় না কেনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। প্রশিক্ষণের পর রোজিনা প্রথম তার তিন বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরি করার জন্য কাপড় কিনে। সে শিশুটির কাঁধের মাপের $\frac{১}{৩}$ অংশ, বুকের মাপের $\frac{১}{২}$ অংশ মাপ নেয় এবং কাপড়টি কেটে ফেলে। পোশাকটি তৈরি করার পর শিশুটির গায়ে দিতে গেলে দেখে জামাটি তার গায়ে ঢুকছে না। সে জামাটি পরিবর্তন করতে চাইলে কোনোভাবেই তা করতে পারে না।

ক. কোন ধরনের কাগজে পোশাকের নমুনা আঁকা হয়?

খ. প্যাটার্ন ড্রাফটিং বলতে কী বোঝায়?

গ. রোজিনা শিশুর পোশাকটি উপযোগী করে কীভাবে তৈরি করতে পারত। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর পোশাকটি তৈরিতে রোজিনার কোনো ত্রুটি ছিল? বিশ্লেষণ কর।

অষ্টদশ অধ্যায়
পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্যতা

পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে। নিজের পছন্দমতো পোশাক শুধু ক্রয় করলেই চলে না। বরং পোশাকের কর্মউপযোগী ও টেকসই রাখতে হলে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাক ও পুরানো ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন পুরানো বা জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাককে উপযুক্ত সংস্কারের সাহায্যে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। অনেক সময় পোশাকে দাগ লেগে পোশাকটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এই ধরনের ক্ষতি কমানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোশাকের দাগ উঠিয়ে ফেলা উচিত।

পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

পাঠ–১ : বস্ত্র ধৌতকরণ

পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো বস্ত্র ধৌতকরণ। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো–

– কাপড়ের ময়লা দূর করে পরিষ্কার করা।

– পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা।

নিম্নে বস্ত্র পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হলো

পরিষ্কারক দ্রব্য	আনুষঙ্গিক দ্রব্য
সাবান : সাবান একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। বাড়ির বেশির ভাগ কাপড়ই সাবান দিয়ে কাচা হয়। বাজারে বিভিন্ন প্রকার সাবান পাওয়া যায়। সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকলে সেই সাবান বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য উপযোগী নয়। বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের কয়েকটা গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন– সাবান দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না; সাবান এমন শক্ত হবে যাতে আঙ্গুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না; সাবানের গা মসৃণ হবে; সাবান পানির প্রসারণ ক্ষমতা ও ভিজানোর ক্ষমতা বাড়ায়; সাবান কাপড়ের ময়লাকে বের করে ধরে রাখে; পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে উঠে।	**বোরাক্স:** বোরাক্স নামের এই পরিষ্কারক দ্রবণটি আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। বর্তমানে সোডিয়াম, কার্বণ, বরিক এসিড হতেও কিছু কিছু পরিমাণ বোরাক্স তৈরি করা হচ্ছে। বোরাক্স জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় তাই কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দ্রব্যটি অনেক সময় কাপড়ের দাগ তুলতেও ব্যবহার করা হয়।

কাপড় কাচা সোডা : কাপড় কাচার সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেট বলে। বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সোডা দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়। বেশি ময়লা এবং তৈলাক্ত সুতি ও লিনেন কাপড় সিদ্ধ করা, জীবাণু মুক্ত করা ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সোডা ব্যবহার করা হয়। তবে সবরকম কাপড়ে সোডা ব্যবহার করা ঠিক নয়। সোডার অতিরিক্ত ক্ষারের প্রভাবে রেশমি ও পশমি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।	**স্টার্চ :** চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরে আসে। স্টার্চ ব্যবহারের ফলে কাপড় সহজে ময়লা হয় না। **গঁদ (Gam arabic):** রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে এবং বস্ত্রের উজ্জ্বলতা আনতে ব্যবহৃত হয়।
গুঁড়া সাবান : বর্তমানে আমাদের দেশে গুঁড়া সাবানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পাত্রে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গুঁড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। বাজারে বিভিন্ন নামে গুঁড়া সাবান পাওয়া যায়। এইসব গুঁড়া সাবানে ক্ষার জাতীয় উপাদান থাকে বলে কাপড়ের ধরন বুঝে ব্যবহার করতে হয়।	**নীল :** কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়, একমাত্র নীল ব্যবহারের ফলে হলদে ভাব কেটে নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়। কাপড়ে ব্যবহারের জন্য আলট্রামেরিন (Ultramarine), প্রুশিয়ান (Prussian) এবং ইনডিগো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নীল তরল ও পাউডার দুইভাবেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।
তুষের জল : তুষের জলকেও পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তুষের জল দিয়ে সিনটজ এবং কিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয়। তুষকে ভুসিও বলা হয়। তুষকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে যখন পানি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে তখনই তুষের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।	**কাপড় মোলায়েমকারক :** সিনথেটিক কাপড়ের জামাকাপড় কিছুদিন ব্যবহার করার পর একটু দৃঢ় প্রকৃতির হয়ে যায়। কাপড় মোলায়েমকারক ব্যবহার করলে কাপড় নরম ও কোমল থাকে। তবে বেশি ব্যবহার করলে কাপড়ের পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
অ্যামোনিয়া : এটা এক প্রকার তীব্র গ্যাস। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য খর পানি এই অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা হয়। রঙিন বস্ত্রাদি এই প্রকার মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ অ্যামোনিয়ার ফলে রং চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কখনো কখনো কাপড়ের দাগ উঠানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়।	**জীবাণুনাশক:** কোনো সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক উপকরণ দিয়ে ধোয়া হয়। যেমন : ক্লোরিন, ব্লিচিং।
রিঠা : প্রাচীনকাল থেকেই এই রিঠা ফল রেশম, পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রিঠার খোসার মধ্যে স্যাপোনিন নামে একটা পদার্থ আছে এই স্যাপোনিনই কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা বাড়ায় ও রং ভালো থাকে।	**ভিনিগার :** বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে ওই পানিতে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।
সিনথেটিক ডিটারজেন্ট : ডিটারজেন্ট এক ধরনের ক্ষারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ। রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রাদি ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। রঙিন বস্ত্রাদির রং চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।	**লবণ :** নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।

কাজ - গৃহে ব্যবহৃত পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ–২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

'বস্ত্র ধৌতকরণ' পরিবারের পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতার একটা উল্লেখযোগ্য দিক। কেননা প্রতিদিনই ব্যবহার্য কাপড় পরিষ্কার করতে হয়। আবার কখনো কখনো সাপ্তাহিক কিংবা মৌসুম ভিত্তিক ধৌতকরণ প্রক্রিয়া চলে। কাপড় ধোয়া পরিশ্রমের কাজ। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন,

ময়লা কাপড় বাছাই করা–

পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়।

আবার বিভিন্ন ধরনের তন্তুর কাপড়ে (যেমন, সুতি, লিনেন, রেশম, নাইলন, টেট্টন ইত্যাদি) একই পরিষ্কারক দ্রব্য বা ধৌতকরণ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। বাছাইকরণের সময় যেসব কাপড়ের প্রকৃতি এবং ধোয়ার পদ্ধতি একই রকম সেগুলো সব এক সাথে রাখা উচিত। কাজেই বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে তন্তু, রং, আকার ও ময়লা অনুযায়ী বস্ত্র বাছাই করতে হবে। কাপড়ে বা পোশাকের গায়ে যদি কোনো নির্দেশনা থাকে তবে তা অনুসরণ করা উচিত।

মেরামত করা–

ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বোতাম, হুক, বকলেস ইত্যাদি ঢিলা কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো আলঙ্কারিক বোতাম, ক্লিপ থাকলে তা খুলে রাখতে হবে।

মেরামতের নমুনা

ক) **রিফু করা** : পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়। এজন্য বস্ত্রের সুতা অনুযায়ী সুচ ও সুতার প্রয়োজন। তা ছাড়া রিফু করার সুতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয়। রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে প্রথমে পেনসিলের দাগ দিয়ে নিতে হয়। দাগের উপর দিয়ে ছোট করে রান ফোঁড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সুতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি সুতার ভেতর দিয়ে সুচ দিয়ে প্রথমে টানা সুতার (Warp yarn) অংশ পরিপূরণ করতে হয়। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণটা টানা সুতায় ভরে তুলে একই পদ্ধতিতে ভরা সুতার (Filling yarn) অংশের একটা সুতার উপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ফ্রেম ব্যবহার করলে সুবিধা হয়।

রিফুর প্রথম পর্যায়

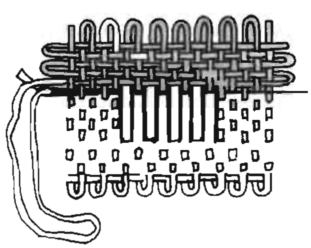
রিফুর দ্বিতীয় পর্যায়

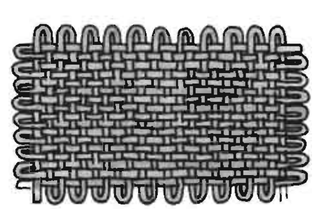
রিফুর তৃতীয় পর্যায়

খ) তালি দেওয়া : বস্ত্র ও পোশাকের কোনো অংশ ছিঁড়ে গেলে এক পরতা কাপড়ের উপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে আটকানোকেই তালি দেওয়া বলা হয়। পোশাক পরিচ্ছেদের কোনো অংশ ছিদ্র হলে, পুড়ে গেলে বা পোকায় কাটলে তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তালি দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

(i) **সাধারণ তালি :** তালি গোলাকার বা চারকোনাকার হতে পারে। যে কাপড়ে তালি দেওয়া হবে তার অনুরূপ রং ও জমিনের বড় একখন্ড কাপড় নিতে হবে। তালির কাপড় ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা বড় হবে। টুকরা কাপড়টি তালি দেওয়ার আগে ভালোভাবে ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। যে কাপড়টি দিয়ে তালি দিতে হবে সে কাপড়ের টুকরা ছেঁড়া জায়গায় বসিয়ে ধার মুড়ে চারদিকে হেম ফোঁড় দিয়ে কাপড়ের সাথে আটকাতে হবে। এবার কাপড়টাকে উল্টো করে ছেঁড়া জায়গাটা কোনাকুনি কেটে মুড়ে টুকরা কাপড়ের সাথে হেম ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে দুই পাশে ইস্ত্রি করে বসাতে হবে।

(ii) **নকশা তালি :** সাধারণ তালির জন্য কাপড়ের রঙের তালির কাপড় পাওয়া না গেলে অথবা তালি দিলে দেখতে খারাপ লাগবে মনে হলে অথবা ব্যবহৃত কাপড়টি এতই নতুন যে সৌন্দর্য নষ্ট করতে মন চাচ্ছে না, এখনো অনেক দিন ব্যবহার করতে হবে– এমন অবস্থায় নকশা তালির মাধ্যমে মেরামত করা যায়। এক্ষেত্রে ছেড়া কাপড়ের উপর অন্য রঙের কাপড় দিয়ে নকশা করে কেটে প্রথমে টাক দিয়ে আটকিয়ে পরে বোতাম ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে হবে। উল্টা দিকের ছেঁড়া কাপড় সাধারণ তালির মতো সেলাই করতে হবে। যাতে সুতা বের হতে না পারে। এই নকশা তালির মতো আরও নকশা করে সমস্ত কাপড়ে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আরও নকশা বসিয়ে নিলে তালি দেওয়ার ব্যাপারটি বোঝা যায় না। অনেকটা এপ্লিক নকশার মতো দেখায়। ছেলেদের প্যান্ট, শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে বড় স্টিকার ব্যবহার করা যায়।

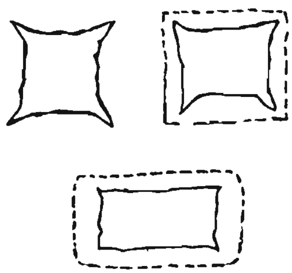

সাধারণ তালি

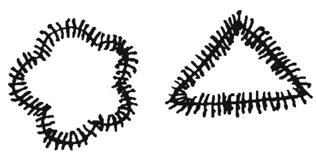

নকশা তালি

দাগ অপসারণ– নানা কারণে জামাকাপড়ে দাগ লাগে এবং ব্যবহারের অনুপযোগি হয়। দেখতেও খারাপ লাগে। তাই সম্পূর্ণ কাপড়টি ধোয়ার আগে দাগযুক্ত স্থানটির দাগের উৎস, তন্তুর প্রকৃতি জানতে হবে। কেননা রং অন্যান্য পরিস্কারক দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে দাগটি স্থায়ীভাবে বসে যেতে পারে।

বস্ত্র পরিষ্কারক উপকরণ নির্বাচন– বস্ত্র ধৌতকরণের আগেই বস্ত্রের তন্তুর প্রকৃতি, ময়লার ধরন, রং, আকার–আয়তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। বস্ত্র অনুযায়ী গরম বা ঈষদুষ্ণ পানি কিংবা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা হয়। আবার কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নীল, মাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন: সুতি ও লিনেন কাপড়ে সাধারণ সাবান ও ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু রেশমি ও পশমি বস্ত্র ডিটারজেন্ট পাউডার এবং ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ধুতে হয়। সাবান মাখানোর পর প্রায় আধঘণ্টার মতো রেখে দিলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয় এবং কাপড় ভালো পরিষ্কার হয়।

২০১৬

পানিতে ভেজানো– বেশি ময়লা কাপড় (মশারি, পর্দা, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি) সাবান পানিতে দেওয়ার আগে ঠান্ডা বা ঈষদুষ্ণ পানিতে আধঘণ্টা বা একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয়। এরপর সাবান পানি দিয়ে ধুলে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় এবং সাবানও কম খরচ হয়।

কাপড় কাচা– সাবান দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর জামাকাপড়ের বেশি ময়লা অংশগুলো ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। শার্টের কলার, হাতা, কাফ, প্যান্টের পেছনের অংশ, পাজামা–পেটিকোটের ঝুলের প্রান্ত প্রভৃতি স্থান বেশি ময়লা হয়। এ জন্য সম্পূর্ণ কাপড়টি কাচার আগে এই অংশগুলো একটু বেশি করে সাবান দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। প্রয়োজনে নরম ব্রাশ ব্যবহার করা যায়। এরপর সম্পূর্ণ কাপড় অল্প অল্প পানি দিয়ে থুপে থুপে ধুতে হয়। তবে রেশমি কাপড় না কেচে দুহাতে চাপ দিয়ে ধুতে হয়– রগড়ানো ঠিক নয়। এতে কাপড়ের কোমল আঁশের ক্ষতি হয়।

প্রক্ষালন– কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করার পর বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় বারবার ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়। ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকেই প্রক্ষালন বলা হয়।

এরপর কাপড় নিংড়ে পানি বের করতে হয়। রেশমি কাপড়ের পানি নিংড়ানোর সময় না মুচড়িয়ে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। ধোয়া পশমি কাপড় মোটা তোয়ালের মধ্যে জড়িয়ে চাপ দিয়ে পানি শোষণ করাতে হবে। রেশমি ও পশমি কাপড় শেষবার ধোয়ার সময় পানিতে সামান্য পরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

নীল ও মাড় প্রয়োগ– সাধারণত সুতি ও লিনেনের কাপড়ে মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কতোটা ঘন মাড় দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কাপড়ের প্রকৃতির উপর। মোটা কাপড়ে পাতলা মাড় দেওয়া হয়। সাদা কাপড়ে নীল প্রয়োগ করা হয়। যখন কাপড়ে নীল ও মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন মাড়ের মতো নীল গুলে নেওয়া হয়। ধোয়া কাপড় নীল মেশানো মাড়ে ডুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে রোদে শুকাতে হয়। এভাবে সুতি সাদা কাপড় এবং গাঢ় রঙের (নীল/কাল) কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

কাপড় শুকানো– কাপড় ধোয়ার পর ঠিকভাবে না শুকালে কাপড়ের ধবধবে এবং কড়কড়ে ভাবটা আসে না। মেটমেটে ভাব এবং স্যাঁতসেঁতে গন্ধ হতে পারে। সাদা কাপড় রোদে শুকালে আরও সাদা হয়ে উঠে। রঙিন কাপড়, রেশমি কাপড় ছায়ায় শুকানো ভালো। পশমি কাপড় বাতাসপূর্ণ খোলামেলা ছায়াযুক্ত কোনো সমতল জায়গায় বিছিয়ে শুকাতে হয়। কাপড় বা পোশাকের ভারী মজবুত অংশ উপরের দিকে রেখে শুকাতে দিতে হয়।

ইস্ত্রি করা– ধোয়ার পর প্রায় সব কাপড়েই কুঞ্চন সৃষ্টি হয়। কাপড় মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য ইস্ত্রি করা হয়। ইস্ত্রি করার আগে মাড় দেওয়া সুতি কাপড়গুলো সামান্য পানি ছিটিয়ে নরম করে নিতে হয়। কাপড়ের প্রকৃতি অনুসারে ইস্ত্রির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন : রেশম ও কৃত্রিম তন্তুর কাপড় সর্বনিম্ন তাপে, পশম ৩০০°F তাপে, সুতি ৪০০°–৪৫০°F তাপে, লিনেন ৪৭৫°–৫০০°F তাপে ইস্ত্রি করা হয়।

হাওয়া লাগানো– ইস্ত্রি করার পর বস্ত্রাদিতে আর্দ্রভাব থাকে। এই অবস্থায় বক্স বা আলমারিতে রাখা ঠিক নয়। সেজন্য কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রেখে আর্দ্রভাব দূর করতে হয়। কাপড় শুকালে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

পাঠ–৩: রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। কারণ ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে।

এই ধরনের বস্ত্র ধৌতকরণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

- ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়। রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং উঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধুলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা ধোয়া উচিত।
- সব সময় রেশমি বস্ত্রে মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য ডিজারজেন্ট হিসাবে রিঠা, ভালো সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের যে কোনো একটি পরিষ্কারক উপকরণ প্রয়োগ করে সামান্য মৃদু পানি সহযোগে অল্প সময় ধরে নেড়ে– চেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়।
- ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় গামলা বা বালতিতে পরিষ্কার পানিতে একাধিকবার নেড়ে–চেড়ে নিতে হয়। রঙিন কাপড়ের বেলায় শেষবার প্রক্ষালনের সময় ঠান্ডা পানিতে প্রতি গ্যালনে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উচিত। এতে রঙিন রেশমের উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। হাত দিয়ে চেপে পানি বের করতে হয়।
- অনেকবার ধোয়া হয়েছে এমন রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য এরারুটের দ্বারা তৈরি মাড় প্রয়োগ করা হয়। গাঁদও রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।
- রেশমি বস্ত্র সব সময় ছায়ায় শুকাতে হয়। সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে।
- রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়। সুতি কাপড়ের মতো রেশমি বস্ত্রে পানি ছিটানো বা স্প্রে করতে হয় না। এতে কাপড়ে পানির ফোঁটার দাগ বসে যায়। রেশমি কাপড় উল্টা পিঠে মৃদু তাপে ইস্ত্রি করলে উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। ইস্ত্রি শেষে কাপড়ের জলীয় বাষ্প শুকিয়ে গেলে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ–

পশমি কাপড় প্রাণিজ তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়। পানি, উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ পশম তন্তুকে দুর্বল করে। এ জন্য পশমি কাপড় ধোয়ার সময় ঈষদুষ্ণ পানি, কম ক্ষারযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হয়।

ধোয়ার পদ্ধতি–

- পশমি কাপড় চোপড় ধোয়ার আগে প্রয়োজন অনুসারে মেরামত, দাগ অপসারণের কাজটি করে নিতে হয়। সাদা ও রঙিন কাপড়গুলো ভাগ করতে হয় কারণ এগুলো আলাদা ধোয়া উচিত। তারপর কাপড়গুলো হালকাভাবে ব্রাশ করে আলগা ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হয়। হাতে বোনা পশমের জামাকাপড় বেশ নমনীয় প্রকৃতির হয়। ধোয়ার পর এগুলির আকৃতি প্রায়ই ঠিক থাকে না। এ জন্য ধোয়ার আগে এসব পোশাকের আকৃতি বা নকশা একটা কাগজের উপর এঁকে রাখতে হয়। ধোয়ার পর ওই নকশা আঁকা কাগজের উপর পোশাক রেখে হাত দিয়ে টেনে আকৃতি ঠিক করে নেওয়া যায়।

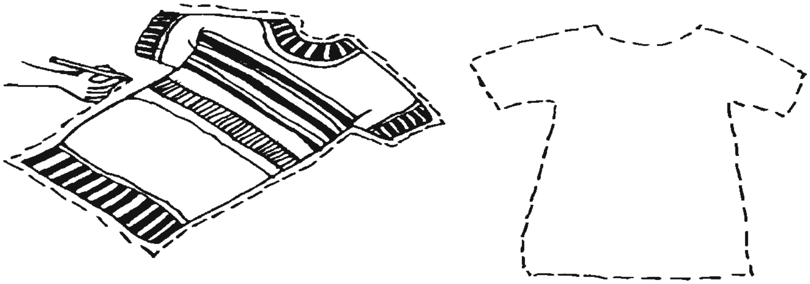

পশমি কাপড় ধোয়ার আগে নকশা অঙ্কন

- পশমি কাপড় ধোয়ার কাজে ঈষদুষ্ণ পানি ব্যবহার করতে হয়। কম ক্ষারযুক্ত গুঁড়া সাবান যেমন: জেট পাউডার ইত্যাদি পশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য উপযোগী। একটা বড় গামলায় ঈষদুষ্ণ পানিতে সাবান গুলে কাপড় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর দুই হাত দিয়ে ধরে এপিঠ–ওপিঠ করে সাবান লাগাতে হয়। পশমি কাপড় বেশিক্ষণ পানিতে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ জন্য বেশিক্ষণ সাবান মাখিয়ে রাখা ঠিক নয়।
- সাবান লাগাবার পর দুই হাত দিয়ে হালকাভাবে চাপ দিয়ে নেড়েচেড়ে এপিঠ–ওপিঠ করে কেচে পরিষ্কার করতে হয়। মাঝে মাঝে পানি দিয়ে নিতে হয়।
- কাপড়ের ময়লা ভালোভাবে দূর হওয়ার পর সাবান ও ময়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন পানি দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে ছাড়াতে হয়। তিন–চারবার ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া উচিত। একই সাথে একাধিক পাত্রে একই তাপমাত্রার পানি রাখলে কাপড় ধোয়ার কাজ সহজ ও দ্রুত হয়। পশমের সাদা জামাকাপড় শেষবার পানি দিয়ে ধোয়ার সময় পানির মধ্যে কয়েক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। রঙিন পশমি কাপড় ধোয়ার সময় পানিতে ভিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের রং ভালো থাকে। ধোয়ার পর একটি মোটা বড় পরিষ্কার তোয়ালের মধ্যে ভেজা কাপড়টিকে জড়িয়ে দুই হাতে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। কাপড় কখনই মুচড়িয়ে নিংড়াতে হয় না। এতে কাপড়ের ক্ষতি হয়।
- পশমি বস্ত্র মৃদু সূর্য কিরণ অথবা আলো বাতাসপূর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। মেশিনে তৈরি পশমি বস্ত্র সমতল স্থানে পাটি, মাদুর, কাঁথা প্রভৃতি মেলে তার ওপর ভেজা কাপড়গুলো বিছিয়ে শুকাতে হয়। মাঝে মাঝে কাপড়গুলো এপিঠ–ওপিঠ করে নেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়।
- পশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় উল্টা দিক দিয়ে মৃদু তাপে এবং হালকা চাপে ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রি করার সময় একটা পাতলা ভেজা কাপড় উপরে বিছিয়ে নিয়ে তার উপর ইস্ত্রি চালাতে হয়। এতে তন্তুর ক্ষতি হয় না এবং উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। কাপড় ইস্ত্রি করার পর কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে উত্তমরূপে জলীয় বাষ্প দূর করে নিতে হয়। তারপর যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

পাঠ–৪: শুষ্ক ধৌতকরণ

পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলা হয়। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধুলে সংকুচিত হয় কিংবা রং চটে যাবার আশঙ্কা থাকে। এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

২০১৬

ব্যবহৃত উপকরণ : শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। আর তাতে কিছুটা পানি থাকলেও তা তুলা বা কোনো প্রকার শোষক দিয়ে পানিশূন্য করা হয়। কেননা এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

উপকরণের যে সব বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন তা হলো–

- শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত তরলের কারণে যেন বস্ত্রে গন্ধ তৈরি না হয়।
- কিছু তরল আছে যা বেশি উদ্বায়ী–বাতাসে সহজে উড়ে যায় এবং এর ফলে ধোলাইয়ে বেশি খরচ হয়। আবার কিছু তরল পদার্থ আছে কম উদ্বায়ী–এতে কাপড় দেরিতে শুকায়। সে কারণে মাঝামাঝি উদ্বায়ী তরলই শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য উত্তম। তবে দুই বা ততোধিক তরলের মিশ্রিত দ্রাবকে শুষ্ক ধোলাই ভালো হয়।
- শুষ্ক ধৌতিতে ব্যবহৃত পরিষ্কারক দ্রব্যাদি বা তরল পদার্থের মধ্যে পেট্রলিয়াম ইথার, টারপেনটাইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজল, বেনজিন ও পেট্রল উল্লেখযোগ্য। এসব কয়টি পরিষ্কারক দ্রব্যের মধ্যে পেট্রলই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ পেট্রল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

ধোয়ার নিয়ম : শুষ্ক ধৌতকরণের বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নরূপ

- প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হয়।
- পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে পানিশূন্য করে নিতে হয়।
- পরপর চারটি পাত্রে এই পানিশূন্য তরল পদার্থ ঢেলে নিতে হয়।

প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন সাবান বা লিসাপল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে ডুবিয়ে রগড়িয়ে তুলতে হয়।

- তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথাসম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধুয়ে নিতে হয়। চতুর্থ পাত্রের তরলে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম।
- এভাবে ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। শুকানোর সময় কাপড়টির মূল আকার সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে পূর্বাকারে এনে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না।
- কাপড়টি এভাবে শুকানোর পর এর উপর ভেজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

  শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন–কাপড় ধোয়ার স্থানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার–

- কাপড় ধোয়ার স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে যেন আগুন না থাকে
- কাপড় ধোয়ার তরল যেন মেঝেতে না পড়ে। এভাবে রেশমি ও পশমি বস্ত্র শুষ্ক উপায়ে বাড়িতেও ধোয়া যায়।

নাইলন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি : এসব সিনথেটিক তন্তুর বস্ত্রাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে নষ্ট হয় না। বেশি ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ভিজিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার হয়। ভালো সাবানের গুঁড়া, বার ব্যবহার করা যায়। ধোয়ার সময় কখনো মোচড়াতে হয় না। আস্তে থুপে থুপে ধুতে হয়। পরিষ্কার পানি একাধিকবার ব্যবহার করে ময়লা ও সাবান দূর করতে হয়। তারপর ছায়াযুক্ত স্থানে দড়িতে টানিয়ে শুকাতে হয়। এই তন্তুর বস্ত্রগুলি ধৌতকরণের ফলে তেমন কুঞ্চন পড়ে না বলে ইস্ত্রি না করলেও চলে।

কাজ – বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

পাঠ–৫: সংরক্ষণ

সংরক্ষণ বলতে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়। এখানে ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পর যথাযথ স্থানে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রেখে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। আমরা নানা ধরনের কাপড়চোপড় ব্যবহার করি। এদের মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব–অনুষ্ঠানের পোশাক, মৌসুমি পোশাক অন্তর্গত। এ ছাড়া প্রায় সব বাড়িতে বিছানাপত্র এবং গৃহসজ্জার নানা টেবিল ক্লথ, কুশন কভার, ন্যাপকিন, ট্রে ক্লথ ইত্যাদি থাকে। এগুলোর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ একক হিসেবে স্টিল ও কাঠের আলমারি, বড় স্টিলের বক্স, সুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

কাপড় সংরক্ষণের লক্ষণীয় বিষয় :

- দামি কাপড়, সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়।
- বড় কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরক্ষণ করা হলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হয়।
- লেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে রেখে দেওয়া যায়। নিমপাতাও রাখা ভালো।
- মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়।

শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময়ে পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বছরের ২–৩ মাস পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। বছরের বাকি সময় এগুলো তোলাই থাকে। পশমি বস্ত্রের দাম তুলনামূলক বেশি। সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে পশমি কাপড় অনেক দিন পর্যন্ত টেকে।

সংরক্ষণের উপায়গুলো নিম্নরূপ–

- পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। মথ পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কাপড় সংরক্ষণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- এরপর ইস্ত্রি করে বাতাসে শুকিয়ে আর্দ্রতামুক্ত করে নিতে হয়। তারপর ভাগে ভাগে আলমারি বা বক্সের মধ্যে ভরে রাখতে হয়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। এ ছাড়া শুকনো নিমপাতা, তামাক পাতা কাপড়ে জড়িয়ে ভাঁজে ভাঁজে রাখা যায়।
- সংরক্ষণ করার আগে আলমারি বা বক্সে কীটনাশক স্প্রে করে নিলে ভালো হয়।
- সংরক্ষিত কাপড়গুলো মাঝে মাঝে বের করে হালকা রোদে মেলে বাতাসে লাগিয়ে স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে হয়।
- পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি আলমারির ভেতর হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।
- রেশমি বস্ত্র মূল্যবান হয়ে থাকে। এসব বস্ত্র ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে হয়।

সংরক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

- সংরক্ষণ করার আগেই নিয়মানুযায়ী ধৌতকরণ, শুকানো ও ইস্ত্রির কাজটি করে নিতে হবে।
- ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রের জলীয়বাষ্প উত্তমরূপে দূরীভূত করতে হবে। তা না হলে ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়ে বস্ত্রের তন্তু দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যবহারের সময় ফেঁসে যায়।

- রেশমি কাপড়ের চরম শত্রু কাপড় কাটার রুপালি পোকা। তাই অবশ্যই সংরক্ষিত স্থানটি আর্দ্রতামুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে হালকা রোদে বাতাস চালনা করে শুকিয়ে নিতে হবে।

কাজ – বিভিন্ন ধরনের তন্তুর বস্ত্র সংরক্ষণে সতর্কতামূলক বিষয় সম্পর্কে লেখ।

পাঠ–৬: পারিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ জন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয় যখন শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ দেহে সুস্থ মন থাকে। সুস্থ্য মনই শৈল্পিকভাবে পরিপাটি থাকতে তাগিদ সৃষ্টি করে।

পারিপাট্য বজায় রাখার জন্য করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

- পারিপাট্যের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন তথা ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন।
- সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন, চুল, চোখ, দাঁত, নখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে।
- দেহে সৌষ্ঠবের ভঙ্গিতে ঋজুতা ও সাবলীলতা এবং কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।
- অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। সব ধরনের ডিজাইন, সব টাইপের পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।
- পরিপাটি হওয়ার জন্য দামি পোশাকের প্রয়োজন নেই। অত্যাধুনিক পোশাক না পরেও প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হওয়া যায়।
- সাধারণ পোশাকের সাথে আনুষঙ্গিক প্রসাধনীর সুসমন্বয় ঘটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠা যায়।
- সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। যেমন– একজন বাঙালি মেয়েকে শাড়িতেই সুন্দর লাগে।
- পোশাকে শিল্পের সৃষ্টির উপকরণ ও নীতিগুলোর সমন্বয় ঘটাতে পারলে পরিধানকারী আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। পোশাকের বিভিন্ন অংশের সাথে রং, রেখা ও জমিনের মিল পরিপাট্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ যেমন– শাড়ির সাথে উপযুক্ত ব্লাউজ; সালোয়ার–কামিজের সাথে উপযুক্ত ওড়নার ব্যবহার মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।
- পোশাকের সাথে জুতা, হাতব্যাগ, গহনা এবং মেকআপ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করা সুপরিপাট্যের অন্যতম শর্ত। যেমন- শাড়ির সাথে কেডস মানানসই নয়। একইভাবে স্কুলের পোশাকের সাথে উঁচু হিল পরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্কুলের মেয়েদের লিপস্টিক, কাজল, গহনা ইত্যাদির ব্যবহার পারিপাট্যের পরিপন্থী। অর্থাৎ পরিপাট্যের জন্য পরিধেয় পোশাক–পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত যথা: হাত, পা, দাঁত, চোখ, নখ, কান, নাক, গলা, চুল, ত্বক ইত্যাদি। এই অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার

সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে উঠে। নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে কোনো সংকোচ থাকে না।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো হলো–

ক) অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের–পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা–

হাতের যত্ন : ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে হাত। মসৃণ ও সুডোল হাত সৌন্দর্য ও সুস্থতা প্রকাশ করে। হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যেসব বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো–

- কোনো কাজ করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- হাতের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করতে হবে।
- হাতে বিভিন্ন তরকারির কষের দাগ কিংবা রান্নার মসলার দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষলে হাত দাগমুক্ত হয়ে যায়।
- হাতের নখ কেটে ছোট করতে হবে। নখের মধ্যে ময়লা ঢুকলে তা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে সুস্থতায় বিঘ্ন ঘটায়।

পায়ের যত্ন : পায়ের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

- প্রতিদিন পা সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ময়লা তুলে পরিষ্কার করতে হবে এবং মসৃণতা রক্ষার জন্য তেল, লোশন, গ্লিসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- মাঝে মাঝে ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে লবণ গুলে পা ৩০–৩৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে পায়ের ময়লা এবং ক্লান্তি দূর হয়।

দাঁতের যত্ন : দাঁতের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো–

- প্রতিদিন মানসম্মত পেস্ট বা দাঁতের মাজন ব্যবহার করতে হবে।
- খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- দাঁত মাজার জন্য ছাই, কয়লা, পোড়ামাটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এগুলো ব্যবহারে দাঁতের ক্ষতি হয়।
- দুর্গন্ধমুক্ত উজ্জ্বল দাঁত সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

চোখের যত্ন : মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখই সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ্ম। উত্তেজনাপ্রবণ কালিমাবিহীন, স্বচ্ছ, চকচকে চোখ সুস্থতার পরিচয় বহন করে। চোখের নিরাপত্তা বিধানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে–

- প্রতিদিন ভোরে চোখ পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে।
- তীব্র বা উজ্জ্বল এবং কম বা নিষ্প্রভ এই দুই ধরনের আলোই চোখের জন্য ক্ষতিকর। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- নীল বা সবুজ আলো চোখে স্নিগ্ধ অনুভূতি আনে। ক্লান্তি দূর করে।
- চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়।
- চোখ চুলকালে বা লাল হলে কিংবা পানি ঝরলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চুলের যত্ন : পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও মসৃণ এবং সুবিন্যস্ত চুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যেসব নিয়মগুলো চুলের সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষা করে সেগুলো হলো–

- নিয়মিতভাবে চুল আঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। এ জন্য অল্প ক্ষারযুক্ত সাবান, প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন মসুরের ডালের পানি, মেথি বাটা ও ডিমের মিশ্রণ, লেবুর রস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- খুশকি দূর করার জন্য লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।
- চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তেলের সাথে লেবুর রস, চায়ের লিকার, টকদই ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- 'ভিটামিন এ' জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে চুল ভালো থাকে।

নাক, কান ও গলা : নাক, কান ও গলা এই নিকটবর্তী অঙ্গগুলোর সুস্থতা খুবই জরুরি। শ্রবণেন্দ্রীয় কান দিয়ে কথা ঠিকভাবে শুনেই আমরা নিজেরা কথার উত্তর দিই, চিন্তা করি। ঠান্ডা লাগলে নাক গলা বসে গেলে কিংবা নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি স্বাভাবিক জীবনেও বাধার সৃষ্টি হয়। স্পষ্ট ভাষায় মিষ্ট স্বরে কথা বললে সুন্দর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় ফুটে উঠে। গলার সুস্থতার জন্য লবণযুক্ত গরম পানি ভালো।

ত্বকের যত্ন : পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ত্বক উজ্জ্বল ও নীরোগ হয়। ত্বকের বর্ণ যেমনই হোক না কেন তা যদি কোমল, মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তা ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় দেয়। ত্বকের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন–

- নিয়মিত গোসলের অভ্যাস ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়।
- কখনোই বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- ক্ষারহীন ভালো সাবান দিয়ে প্রতিদিন গা রগড়িয়ে গোসল করা উচিত।
- গোসল কিংবা হাত মুখ ধোয়ার পর ত্বকের মসৃণতা বাড়ানোর জন্য ক্রিম/অলিভয়েল/গ্লিসারিন ব্যবহার করতে হয়।

খ) পোশাক–পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা–

শুধুমাত্র অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা দেহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন পোশাক– পরিচ্ছদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। পোশাকের–পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ পোশাক মানুষের দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সংরক্ষণ করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে বাধাপ্রাপ্ত করে। এই অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিপাট্যের অন্তরায়। এ জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

কাজ – পারিপাট্যতার উপায়গুলো কী বর্ণনা কর।

পাঠ–৭: পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পোশাক পরিধান মানুষর মৌলিক, মানবিক অধিকার। আর ব্যক্তিত্ব শব্দটির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হলো 'সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, সামর্থ্য এবং প্রবণতার সংহতি এবং ঐক্য।' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের জীবন্ত ঐক্য বিশেষ।

পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার। যেমন,

- পুরানো পোশাক বদলিয়ে নতুন পোশাক পরলে মন প্রফুল্লতায় ভরে উঠে। চেহারায়ও উজ্জ্বলতা দেখা যায়।
- পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিত্বে সাবলীল ভাব ফুটে উঠে।
- পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে মনে অস্বস্থি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ঠ হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়।
- পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। জাঁকজমকপূর্ণ নকশা বহুল, বড় ছাপা ও ভারী জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের আরও মোটা দেখায়। কম নকশাযুক্ত ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খাটো মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক বা ডুরে কাপড় ব্যবহারেও দেহের উপর প্রভাব পড়ে। যেমন– লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খাটো মেয়েদের দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপর দিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা মেয়েদের কিছুটা খাটো দেখায়।
- দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের ক্ষীণতা ও স্থূলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের মেয়েদের আপাতভাবে হালকা দেখায়। অন্যদিকে লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো খাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য উপযোগী। যাদের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রকমের রঙের পোশাকে মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের জন্য হালকা প্রতিফলনকারী কমলা, হলুদ, গোলাপি ইত্যাদি রঙের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়।
- উজ্জ্বল রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে এই রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিত্বেও তার প্রভাব পড়ে। আবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাধাসিধে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।
- সামাজিক রীতি–নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করা হলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। উগ্র, অমার্জিত পোশাক সুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী।
- পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ঐক্য স্থাপনের জন্য সাজসজ্জার আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর যেমন: জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, কেশ বিন্যাস ইত্যাদির সমন্বয় ঘটাতে হয়।
- পোশাকের মাধ্যমে সামগ্রিক সাজসজ্জায় পারিপাট্য সৃষ্টি করার একটা অন্যতম শর্ত হলো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা। এলোমেলো চুল, ময়লা যুক্ত বড় বড় নখ পোশাকের মাধ্যমে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে।

অন্তর্মুখী, বহির্মুখী এবং উভয়মুখী ব্যক্তিত্বের লোক রয়েছে। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা রুচিতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোকনা কেন সুরুচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুচিপূর্ণ উদ্ভট, বেখাপ্পা পোশাক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়।

কাজ – পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কীভাবে ঘটে বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ–৮: অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

গৃহে নানা ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং অব্যবহৃত জিনিসের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে জীর্ণ ও পুরানো বস্ত্র অন্যতম। এসব অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন–

পুরানো বস্ত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদির রং চটে গেলে, সামান্য ছিঁড়ে গেলে ফেলে রাখা হয়। পুরানো কাপড়ের সাহায্যে গ্রামের মেয়েরা সুন্দর করে নকশি কাঁথা বানায়। পুরানো কাপড়ের কাঁথায় নানা ধরনের লতাপাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ভাবে তৈরি হয় নকশি কাঁথা। বর্তমানে এসব কাঁথা শুধু শীতের আচ্ছাদন নয় বরং বিছানার চাদর, সোফার কাভার, দেয়াল সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

পুরানো শাড়ি দিয়ে পা মোছার পাপোস তৈরি করা যায়, ধাপগুলো নিম্নরূপ–

- প্রথমে শাড়ির একমাথায় গিঁট দিয়ে নিতে হবে।
- এবার শাড়িটিকে লম্বালম্বিভাবে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।
- তারপর শাড়িটাকে কোথাও ঝুলিয়ে নিয়ে লম্বালাম্বি করে শক্তভাবে বেনি করে নিতে হবে।
- এখন বেনীটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা সুচ সুতা দিয়ে আটকিয়ে ফেলতে হবে।
- এই পাপোস গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হবে।

টুকরা কাপড়ের ব্যবহার :

বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করার পর বিভিন্ন টুকরা কাপড় অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বের হয়। বড় টুকরাগুলোকে একত্র করে একই মাপ ও একই আকৃতিতে কেটে সবগুলো কাপড় পরপর মেশিনে জোড়া লাগিয়ে চারপাশে কাপড়ের পাড় বা অন্য কাপড়ের বর্ডার দিয়ে বেড কভার, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

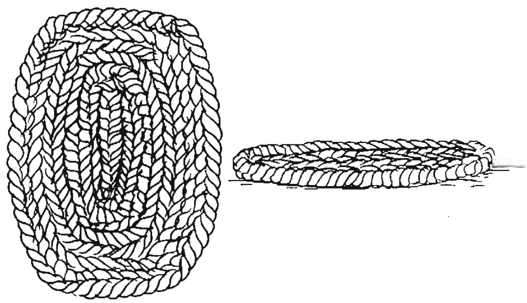

পুরোনো কাপড় দিয়ে তৈরি পাপোস

কাজ – গৃহে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ব্যবহার করে পাপোস তৈরি করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি?

ক) ডিটারজেন্ট খ) রিঠা

গ) গঁদ ঘ) সাবান

২। বারবার পানি দিয়ে ধুয়ে কাপড় থেকে সাবান ও ময়লা বের করাকে কী বলা হয়?

ক) কলপ দেওয়া খ) হাওয়া লাগানো

গ) প্রক্ষালন করা ঘ) শুষ্ক ধৌতকরণ

২০১৯

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস রেবা শীতের মৌসুমের পর গরম কাপড়গুলো উঠিয়ে রাখেন। পরেরবার শীতের মৌসুমের আগে কাপড়গুলো ব্যবহার করতে গিয়ে দেখেন অনেকগুলো কাপড় পোকার দ্বারা নষ্ট হয়েছে।

৩। মিসেস রেবাকে কাপড়টি সংরক্ষণের আগে প্রথমেই কী করতে হতো?

ক) কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে নেপথলিন দেওয়া খ) নিমপাতা, তামাকপাতা কাপড়ে দেওয়া

গ) সঠিক নিয়মে কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রাখা ঘ) সংরক্ষণের আগে আলমারিতে কীটনাশক স্প্রে করা।

৪। কাপড়টি নষ্ট হওয়ার কারণ–

i. কাপড়গুলোর উপর কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করা হয়নি।

ii. মাঝে মাঝে হালকা রোদ ও বাতাসে কাপড় শুকানো হয়নি।

iii. কালো জিরা, চাপাতা, নিমপাতা ব্যবহার করা হয়নি।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রুপা পরিবারের বড় মেয়ে। ঘরের বিভিন্ন কাজের সাথে পরিবারের সদস্যদের পোশাকও তাকে পরিষ্কার করতে হয়। কয়েক দিন আগে কমলা রঙের রেশমি কাপড়টি ধোয়ার পর তিনি দেখতে পান তার কাপড়টির রং উঠে গেছে এবং সাদা ব্লাউজে সে রং লেগে গেছে। কাপড়টিও সংকুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি।

ক. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক করতে কী ব্যবহার করা হয়?

খ. কাপড়ে রিফু করা হয় কেন?

গ. নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রঙিন রেশমি বস্ত্রটি যথাযথ নিয়মে ধোয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল– এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

২। তানহা একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সাদা রঙের সালোয়ার–কামিজ পরে সাজসজ্জা করে উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর তাকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার মন খারাপ দেখে চাচি তাকে বললেন, ‘পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক ও সাজসজ্জা ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে।’

ক. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কী?

খ. পোশাক–পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন কেন?

গ. তানহাকে বিমর্ষ দেখানোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তানহার জন্য চাচির মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০১৬

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম গার্হস্থ্য

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারীশিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য